কোটাল কাহিনী

বিশ্বনাথ লাহিড়ী

কোটাল কাহিনী

উত্তর প্রদেশ পুলিশের প্রথম
ভারতীয় আই-জির স্মৃতিচিত্র

KOTAL KAHINI BY B. N. LAHIRI
Dey's Publishing c/o Dey Book Store
13 Bankim Chatterjee Street, Calcutta 700 073
Rs. 10

কোটাল কাহিনী

বিশ্বনাথ লাহিড়ী
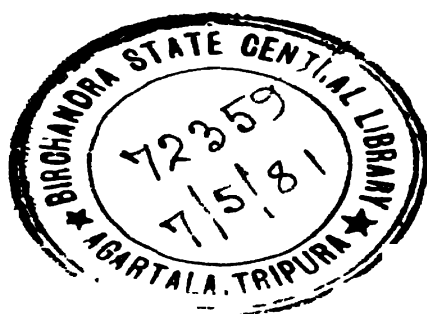
দে'জ পাবলিশিং ॥ কলিকাতা ৭০০ ০০৯

নিবেদন

পুলিশের কাজে অনেক রকম অভিজ্ঞতা সমানে হতে থাকে। সে যে শুধু চুরি ডাকাতি খুন খারাপি বা দাঙ্গা-হাঙ্গামার হয় তা নয়। জনসাধারণের পক্ষে সে-সম্বন্ধে কৌতূহল হওয়া স্বাভাবিক। আমি তাই এই ক্ষুদ্র পুস্তকে আমার দীর্ঘকালের সংগৃহীত ফসল ভাণ্ডারজাত করলাম। অবশ্য তাতে অল্পবিস্তর বাছাই করতে হয়েছে যাতে পাঠক পাঠিকার ধৈর্য্যচ্যুতি না ঘটে।

আমার অভিজ্ঞতাগুলির ব্যাখ্যা যতদূর সম্ভব আমি নিজেকে আড়ালে রেখে বিষয়মুখী করবার চেষ্টা করেছি। কোথাও মিথ্যা রং চড়াবার প্রয়াস করিনি।

আর এক কথা। আমি যেকালে চাকরীতে প্রবেশ করি সেকালে ভারত পরাধীন। তার পর থেকে যুগ পরিবর্তন ঘটেছে। অনেক ব্যাপারে সেকালের রীতি-নীতি অন্য ধরণের ছিল, যা আজ ইতিহাসের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। ভবিষ্যতের জন্য সেগুলি অক্ষুন্ন রাখা দরকার। এই বইখানার অন্যান্য অজুহাতের মধ্যে সেও এক অজুহাত।

আমাদের দেশ থেকে ব্রিটিশ শাসন যে আজ লোপ পেয়ে গেছে সে এক মস্ত বড ঘটনা। তবে এটুকু স্বীকার করা চাই যে ইংরাজদের মধ্যে যে পরিমাণে দোষ ছিল সেই পরিমাণে গুণও ছিল। শাসনপ্রণালি যে কি বস্তু সেটা তাদেরই ভালভাবে জানা ছিল।

পাঠক পাঠিকা যদি আমার এই সামান্য প্রচেষ্টা থেকে কিছুমাত্র আনন্দ পান এবং হারিয়ে যাওয়া এক যুগ সম্বন্ধে কিছুটা অবহিত হন তাহলে আমার পরিশ্রম সার্থক মনে করবো।

এই বই সম্বন্ধে আমি লব্ধপ্রতিষ্ঠ সাহিত্যিক শংকর-এর কাছে কিছু মূল্যবান পরামর্শ পেয়েছি। তাকে আমার কৃতজ্ঞতা জানাই।

৩, পোন্নাপ্পা রোড
এলাহাবাদ ১

বিশ্বনাথ লাহিড়ী

কোটাল কাহিনী

হাতে খড়ি

আমার এই কাহিনীর আরম্ভ ১৯২২ সালে। ব্রিটিশ শাসন তখন আমাদের দেশে পুরোমাত্রায় কায়েম ছিল ও সে সময় অধিকাংশ উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মচারীর আমদানি হত বিলেত থেকে। অবশ্য এটা ঠিক যে কাগজে কলমে ইণ্ডিয়ান সিভিল সার্ভিসে ঢোকার ব্যাপারে ভারতীয়দের জন্য কোন রকমেরই বিধিনিষেধ ছিল না যদি তারা ইংলণ্ডে গিয়ে আই. সি. এস. পরীক্ষায় বসতে পারত। কিন্তু তা আর ক'টা লোকের পক্ষেই বা সম্ভব ছিল? সে যুগে জাহাজে বিলেত পৌঁছতেই মাস খানেকের ওপর লেগে যেত। ভারতীয়দের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের ভাই সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরই প্রথম এই চাকরিতে ১৮৬৩ সালে যোগ দেন। তার পর ১৮৬৭ সালে এ চাকরিতে ঢোকেন রমেশচন্দ্র দত্ত, বিহারীলাল গুপ্ত ও সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। ভারতবর্ষের মা.টিতে আই. সি. এস. পরীক্ষা সর্বপ্রথম হয় ১৯২২ সালে।

সেকালে যতগুলি ক্লাস ওয়ান সার্ভিস ছিল তাদের মধ্যে মান-মর্যাদায় আই. সি. এসের ঠিক পরেই ইণ্ডিয়ান ফাইন্যান্স সার্ভিসকে ধরা হত। তাকে আজকাল ইণ্ডিয়ান অডিট্ ও একাউন্টস্ সার্ভিস বলা হয়। এই পরীক্ষা ভারতবর্ষে প্রথম অনুষ্ঠিত হয় ১৮৭২ সালে। এই পরীক্ষায় প্রতিবছর এক আধ জনকেই নেওয়ার ব্যবস্থা ছিল। সেই কারণে কেবলমাত্র অসাধারণ মেধাবী প্রার্থীদের পক্ষেই চাকরিতে ঢোকা সম্ভব হয়। এই রকম একজন প্রতিভাধর যিনি এই শতকের গোড়ায় ফাইন্যান্স সার্ভিসে যোগ দেন তাঁর নাম সি. ভি. রমণ। আবার যেভাবে তিনি এই সার্ভিস ছেড়ে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যতম

অধ্যাপক হিসেবে নিযুক্ত হন তার অপূর্ব বৃত্তান্ত তাঁর মুখে যা শোনা তা হইল :
একদিন সকালে তিনি তাঁর অভ্যাসমত ট্রামে করে বৌবাজার স্ট্রীট হয়ে তাঁর অফিসে যাচ্ছিলেন। পথে হঠাৎ তিনি এক বিরাট সাইনবোর্ড দেখতে পান যাতে বড় বড় অক্ষরে লেখা ছিল : ডক্টর মহেন্দ্রলাল সরকার্স ইন্‌স্টিট্যুইট ফর দি ডেভলপমেণ্ট অব সায়েন্স। সেটা দেখা মাত্র তিনি ট্রাম থেকে নেমে পড়েন ও সোজা গিয়ে ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকারের সঙ্গে দেখা করেন। চন্দ্রশেখর ভেঙ্কট রমণ তার পর থেকে ডাক্তার সরকারের অনুমতি অনুসারে প্রতিদিন অফিস-ফেরতা ওই ইন্‌স্টিট্যুইটে কয়েক ঘণ্টা ধরে নিজের গবেষণার কাজ করতে থাকেন। কিছুদিনের মধ্যেই রমণের কয়েকটি গবেষণাপত্র স্থানীয় বৈজ্ঞানিক পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। সেগুলি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের তদানীন্তন উপাচার্য স্যার আশুতোষের নজরে পড়ে। স্যার আশুতোষ রমণ সাহেবকে ডেকে বলেন, তোমার আর অফিসে বসে কলম পিষে কাজ নেই। তুমি সরাসরি আমার এ বিশ্ববিদ্যালয়ে চলে এস। আমি তোমার জন্য এক বিশেষ চেয়ারের ব্যবস্থা করব। এই ঘটনা থেকে বেশ বোঝা যায় মানুষের ভবিষ্যৎ তাকে কোথা থেকে কোথায় টেনে নিয়ে যায়। যদি সেদিন স্যার সি. ভি. রমণ আশুবাবুর নজরে না পড়তেন তাহলে কি পরবর্তীকালে নোবেল প্রাইজের অধিকারী হতে পারতেন ?

এ প্রসঙ্গে বলা যায় যে, যদিও সেকালে ইণ্ডিয়ান সিভিল সার্ভিস বা ইণ্ডিয়ান ফাইন্যান্স সার্ভিসে প্রতিবছর একটি দুটি ভারতীয় তাদের কপাল জোরে ঢুকতে পারত কিন্তু ইণ্ডিয়ান ইম্পিরিয়ল পুলিশ নামে যে সার্ভিসটি ছিল তাতে সরাসরি ভাবে ভারতীয়দের পক্ষে ঢোকা এতটুকুও সম্ভব ছিল না। এই চাকরি শুধু ইংরাজদের জন্যই সংরক্ষিত ছিল। শুধু তাই নয়—এমন কি ডেপুটি সুপারের পদেও ভারতীয়দের সরাসরিভাবে মাত্র ১৯০৬ সাল থেকে নেওয়া হয়। এর প্রধান কারণ ছিল ১৮৫৭ সালের সিপাহী বিদ্রোহের পর থেকে আমাদের বিদেশী প্রভুদের প্রাণে এমনই ভয় ঢোকে যে তাঁরা সহজে সেনাবাহিনী বা পুলিশবাহিনী হাতছাড়া করতে প্রস্তুত ছিলেন না। ভারতীয় প্রার্থীদের ইণ্ডিয়ান পুলিশ সার্ভিসে নিয়োগের জন্য যে এক প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার ব্যবস্থা এ দেশে করা হয় সেটা অনেক পরে। অর্থাৎ ১৯২১ সালে।

১৮৫৭ সালের সিপাহী বিদ্রোহের অনুরূপ আর এক বিদ্রোহের আতঙ্ক আমাদের বিদেশী প্রভুদের যে তাড়া করে ফিরত তার প্রমাণ আমারই এক ইংরাজ সহকর্মীর কাছ থেকে আমি এক সময় পাই। তিনি আমার কাছে

স্বীকার করেন যে, রাত্রে তিনি তাঁর বালিশের তলায় আত্মরক্ষার উদ্দেশ্যে একটি রিভলবার রাখতে অভ্যস্ত—পাছে কেউ তাঁর জীবননাশের চেষ্টা করে এই ভয়ে।

যখন এই চাকরি প্রথম গঠিত হয় তখন যে সব ইংরাজ যুবক এতে যোগ দিত তারা সম্পূর্ণ নিরক্ষর না হলেও বিশেষ শিক্ষিত ছিল না। তাদের এ দেশে আসার মুখ্য প্রলোভন ছিল বাঘ ভাল্লুক শিকার। কখন কখন ব্রিটিশ সেনাবাহিনীর লোকেরা এই সার্ভিসে বদলি হয়ে আসত। তাই কোথাও কোথাও জেলার সর্বোচ্চ পুলিশ পদাধিকারীকে আজও লোকে কাপ্তান্ সাহেব বলে জানে।

এরও কিছুকাল পরে ইংলণ্ডে এক প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার মাধ্যমে এ চাকরিতে ঢোকার নিয়ম প্রচলিত হয়। স্থির হয় যে, প্রার্থীদের বয়স অন্ততঃ ১৯ বছর ও শিক্ষার দিক থেকে অন্ততঃ স্কুল ফাইন্যাল পাশ হওয়া চাই। ফলে কিছুটা উন্নতশ্রেণীর লোকেদের আমদানী হতে থাকে। কিন্তু তাদের কার্যভারের দিক থেকে দেখতে গেলে ঠিক যে ধরণের লোক দরকার ছিল তা পাওয়া গেল না। এই কারণে ১৯৩৯ সালে আবার ভর্তির শর্তগুলি বিবেচিত হয়। স্থির হয় যে, ব্রিটিশ প্রার্থীদের সে দেশের পরীক্ষায় বসতে হলে সেখানকার কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক হওয়া চাই।

একটা কথা স্বীকার করা দরকার যে, প্রাক্ স্বাধীনতা যুগের ব্রিটিশ অফিসারদের সার্ভিসের প্রতিদান কম নয়। তাঁদের মধ্যে অনেকেই তাঁদের কাজের জন্য খ্যাতি লাভ করেছিলেন। তাছাড়া যেসব পুলিশ-সম্বন্ধীয় নিয়ম-কানুন আমাদের দেশে আজও প্রচলিত সে সমস্তই তাঁদের সৃষ্টি।

এবার আমি আমার নিজের কথা বলি। আমাদের দেশে ইণ্ডিয়ান ইম্পিরিয়াল পুলিশ সার্ভিসে সরাসরিভাবে ঢোকার ব্যাপারে যে এক প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা সর্বপ্রথম ১৯২১ সালের ডিসেম্বর মাসে হয় আমি তাতেই বসি। এই পরীক্ষার খবর এক ইংরাজ মহিলা আমায় দেন। তাঁর স্বামী মিঃ পি. বিগেন তখন উত্তরপ্রদেশ সি-আই-ডির এক উচ্চপদস্থ কর্মচারী। মিঃ ও মিসেস বিগেন এককালে এলাহাবাদের হল্যাণ্ড হল্ ছাত্রাবাসের অধ্যক্ষ রেভরেণ্ড মর্টনের বাড়িতে থাকতেন। রেভরেণ্ড মর্টনের মারফৎ তাঁদের সঙ্গে আমার পরিচয় হয়। আমি তখন হল্যাণ্ড হল্-এই থাকি।

মিসেস বিগেনের সঙ্গে আমার পরিচয়ের আর এক কারণ ছিল। তিনি ছিলেন বিদুষী ও আমাদের হোস্টেলের কয়েকটি বাছা বাছা ছাত্রের সঙ্গে কখন কখন ইংরাজী সাহিত্য নিয়ে আলোচনা করতেন।

মিঃ বিগেন উত্তরপ্রদেশের ডি-আই-জি সি-আই-ডি মিঃ স্কট্ ওকোনরের কাছে আমাকে একটি পরিচয় পত্র লিখে দেন। মিঃ স্কট্ ওকোনরই আমার নামাঙ্কন করেন।

তখনকার দিনে উপরোক্ত পরীক্ষায় বসতে হলে প্রার্থীদের কোন এক উচ্চ-পদস্থ সরকারী কর্মচারী দ্বারা নামাঙ্কন অত্যাবশ্যক ছিল। দ্বিতীয়তঃ তাদের এক বোর্ডের সামনে হাজির হতে হ'ত। বোর্ড যাদের অনুমোদন করত তারাই পরীক্ষায় বসবার অনুমতি পেত। সংসারে অনেক ঘটনাই যোগাযোগের ওপর নির্ভর করে। আমার পুলিশে ঢোকাও বলতে হবে সেই রূপ যোগাযোগের ফল।

আমার সঙ্গে সে বছর বাংলা থেকে সুকুমার গুপ্ত, মাদ্রাজ থেকে সম্ভিবি, বম্বে থেকে কামতে, পাঞ্জাব থেকে সাধুরাম চৌধুরী ও মধ্যপ্রদেশ থেকে বম্বাওয়ালে এই চাকরির জন্য নিবাচিত হন। আমি হই উত্তরপ্রদেশ থেকে।

আমার নিযুক্তির আদেশ সেক্রেটারি অফ স্টেটের কাছ থেকে আসে। সেটা পেয়ে আমি ৯ আগস্ট ১৯২২ সালে মুরাদাবাদে গিয়ে পুলিশ ট্রেনিং স্কুলের অধ্যক্ষ মিঃ ডডের (পরে স্যার রবার্ট) সঙ্গে দেখা করি। সকাল তখন ৯টা।

মিঃ ডড আমার এক পরিচয়পত্র পুলিশ মেসের সিনিয়র এ-এস-পি জজ রীভসের নামে দেন। মেসে গিয়ে আমি দেখি তখন রীভস্ মেসের সামনে তাঁর এক মান্ধাতা আমলের টি মডেল ফোর্ড গাড়ীর তলায় চিৎ হয়ে শুয়ে কি যেন ঠোকাঠুকি করছেন। তাঁর দুটি লম্বা ঠ্যাং ভিন্ন শরীরের অন্য কোন অংশ দেখা যাচ্ছে না। সুতরাং তাঁর ওই অপরূপ যোগাসন ত্যাগ করে বেরিয়ে আসার শুভক্ষণ পর্যন্ত আমি অনন্যোপায় হয়ে সেখানে চুপটি করে দাঁড়িয়ে রইলাম। মিনিট কয়েক বাদে তিনি সর্বাঙ্গে কালি ঝুলি মেখে বেরিয়ে এলে আমি তাঁর হাতে ডড সাহেবের লেখা সেই পরিচয় পত্রটি দিলাম। সেটা পড়ে তিনি আমার দিকে কিছুক্ষণ নির্বাক হয়ে চেয়ে রইলেন। কারণ তিনি আমার চোখে তখন যেমন অভিনব জীব বলে ঠেকছিলেন আমিও তাঁর চোখে তেমনি ঠেকছিলাম। এইভাবে আমাদের ক্ষণিক শুভদৃষ্টির পর তিনি আমায় মেসের ভিতর নিয়ে গেলেন।

মেসের ভিতর গিয়ে আমি দেখি যে, কয়েকজন ব্রিটিশ শিক্ষানবিশ খাবার ঘরের টেবিলে বসে তাদের প্রাতঃরাশ সারছে। রীভস্ আমাদের পরস্পরের পরিচয় করিয়ে সেখান থেকে সরে পড়লেন। আমার ভাবী সঙ্গীদের পক্ষ

থেকে আমার সঙ্গে আলাপ করার কোন ইচ্ছেই দেখতে পেলাম না। তারা শুধু একবারটি আমার দিকে চেয়ে এবং একটু ম্লান হাসির সঙ্গে মাথা নেড়ে তাদের আহারের দিকে মনঃসংযোগ করল। বেশ বুঝতে পারলাম তাদের মধ্যে থেকে কেউই আমার সঙ্গে মুখ ফুটে কথা কইবার জন্য মোটেই উৎসুক নয়। তবু তারা সকলে যেন আড়চোখে আমায় ভাল করে দেখছে। আমার এই অবস্থা থেকে আমাকে উদ্ধার করল আমাদের মেসের মুসলমান খিদ্‌মদ্‌গার মসীৎ। সে যখন ওই খাবারের টেবিলের একপাশে আমার জন্য জায়গা করে কিছু খাদ্যসামগ্রী এনে দিলে আমি যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচি।

আমার প্রাতঃরাশ যেন তেন প্রকারে সেরে আমি তৎকালীন মেস প্রেসিডেন্ট জর্জ পার্কিনের ঘরে গেলাম। তিনি আমার কাছে মেস জীবনের অনেক দুরূহ বিষয়ে আলোকপাত করলেন। তিনি আমায় ভাল করে বুঝিয়ে দিলেন, যদিও ব্রেকফাস্ট বা লাঞ্চ একটা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে নিজের সুবিধা মত মেসে গিয়ে খেয়ে এলেই হল, ডিনারের ব্যাপারে কিন্তু তা করলে চলবে না। তার যে একটা নির্দিষ্ট সময় আছে তা কাঁটায় কাঁটায় পালন করা চাই। সে বিষয়ে যাতে কোন ব্যতিক্রম না ঘটে সেজন্য এক বিউগল ধ্বনির ব্যবস্থা আছে। মোট কথা, মেস ডিনার এক প্যারেড বিশেষ। সেই কারণে সময় বা অন্যান্য নিয়মকানুনের সামান্য ব্যতিক্রমেরও সুযোগ নেই।

আমি আরো জানলাম ডিনারের জন্য এক বিশেষ রকমের পোষাক নির্ধারিত আছে। তার কাটছাঁট দেখে আমিও অবাক। আবার তার সঙ্গে যে ধরনের বুট জোড়া পরতে হয় সেরকম আমি ইতিপূর্বে কখন চোখেও দেখিনি। শুনলাম তাকে ওয়েলিংটন্স্‌ বলা হয়। কারণ ইংলণ্ডের খ্যাতনামা যোদ্ধা ডিউক অফ ওয়েলিংটন ওই ধরনের বুট পরতেন। পার্কিন আমার জন্য মেসের গুদামঘর থেকে একজোড়া সেকেণ্ড হ্যাণ্ড্‌ ওয়েলিংটন্স্‌ ও অনেক কিছু খুঁটিনাটি সামগ্রী যোগাড় করে দিলেন যেগুলি মেস কিটের সঙ্গে পরবার নিয়ম। দর্জি ২৪ ঘণ্টার মধ্যে বাকী পোষাক তৈরী করে দিয়ে গেলো।

অন্যান্য কাজের মধ্যে মিঃ পার্কিন আমার জন্য একজন বেয়ারা যোগাড় করে দেন। সেজন্য আমি তাঁর কাছে চিরকাল উপকৃত থাকবো। লোকটা জাতে মুসলমান ও তার নাম ছিল সুখখন্। তাকে আমায় মাসে ২৫ টাকা করে দিতে হ'ত। সে তার কাজে অসামান্য পটু ছিল। সব কিছু মুখ বুজে করত। আমায় কোন কথা তাকে দ্বিতীয়বার বলতে হ'ত না। তার কাজ ছিল আমার জুতো জামা গুছিয়ে রাখা ও পরিয়ে দেওয়া। তাছাড়া আমি খাবার ঘরে গেলে

আমার দেখাশোনা করা। আমি কিন্তু অন্যের দ্বারা আমার ওই জামা কাপড় পরিয়ে দেওয়ার কাজটা মোটেই পছন্দ করতাম না। তাই আমার ড্রেসিংরুমে পা টিপে টিপে ঢোকবার চেষ্টা করতাম। কিন্তু সে এতই সতর্ক থাকত যে আমার পক্ষে তাকে এড়ানো সম্ভব ছিল না। সে আমার পরিধানের এটা সেটা পরিয়ে দেবার জন্যে সমানে চেষ্টা করে যেতো।

এই রকম কর্মপটু বেয়ারা যে শুধু আমারই ভাগ্যে জুটেছিল তা নয়। সে যুগে বেয়ারা বা খানসামা সকলেই নিজেদের কাজে খুব পাকা ছিল। সাধারণতঃ সেই কাজ তারা বংশানুক্রমে করত। তারা জাতে মুসলমান ও বিশেষ প্রভুভক্ত হ'ত। সেই কারণে তাদের প্রভুরাও তাদের খুব যত্ন করত। ওই জাতীয় লোকেদের মধ্যে আজও অনেকে আছে যারা তাদের সেকালের মনিবদের কাছ থেকে মাসোহারা পায়।

এ সূত্রে আমার জানা এক ঘটনার কথা বলি। এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের খ্যাতনামা প্রফেসর ডন্ নিজের দেশে ফিরে যাবার মুখে তাঁর মুসলমান বেয়ারাকে কিছু থোক টাকা দিয়ে যান। সেই টাকা দিয়ে সে কিছু জমিজমা কেনে। তারপর দেশ বিভাজনের সঙ্গে সঙ্গে সে প্রাণভয়ে পাকিস্তানে পালায়। সুতরাং তার জমিজমা ইভ্যাকুই প্রপার্টি বলে ঘোষিত হয়। সে যখন আবার এদেশে ফিরে আসে তখন প্রফেসর ডন্‌কে তার দুঃখকাহিনী লিখে পাঠায়। তিনি সেই চিঠি পেয়ে এদেশে আসেন ও তাঁর পুরাতন বন্ধু ডক্টর রাধাকৃষ্ণনের সাহায্য-প্রার্থী হন। ডক্টর রাধাকৃষ্ণন্ তখন উপ-রাষ্ট্রপতি।

আমার পরিচিত আর এক সাহেব দেশে ফিরবার আগে তাঁর বেয়ারার জন্য কয়েক হাজার টাকা দিয়ে এক ট্রাস্টের ব্যবস্থা করেন যাতে মাসে মাসে সে তার থেকে সাহায্য পায়।

এটা হল সে যুগের সাহেবদের মানবিকতার দিক। তাদের একটা অন্ত-দিক ছিল যা আমাদের বিশেষ দৃষ্টিকটু লাগত। কথায় কথায় তারা এ দেশের গরীব লোকেদের ওপর পদাঘাত বা অন্য অত্যাচার করত। পুলিশ মেসে থাকতে আমি একদিন আমার এক ইংরাজ সহকর্মীর সঙ্গে তারই গাড়িতে মেসে ফিরছি। পথে এদেশীয় এক বেচারা বৃদ্ধ গাড়ির সামনে গিয়ে পড়ে। গাড়ি দেখে সে পাকা রাস্তা ছেড়ে ফুটপাথে সরেও যায়। দোষের মধ্যে সে আমার সহযাত্রী সাহেবটিকে সেলাম ঠুকতে ভুলে যায়। তাতেই সাহেব বেজায় খাপ্পা হয়ে অজস্র গালি দিতে থাকেন। লোকটা ত সাহেবের ব্যবহারে ভ্যাবা-চাকা খেয়ে যায়। বলা বাহুল্য এ ঘটনায় আমার মনেও খুব আঘাত লাগে।

মেসের সম্বন্ধে যা বলছিলাম। মেসে যে ক'দিন ডিনার ড্রেস পরে খাবার নিয়ম ছিল তাকে ডিনার নাইট্ ও বাকি ক'টা দিনকে সাপার নাইট্ বলা হ'ত। সাপার নাইটে ড্রেস বা সময় সম্বন্ধে কোন কড়াকড়ি থাকত না। ডিনার নাইটে আবার পাইপ ব্যাণ্ডের সাহায্যে জাতীয় সঙ্গীত (গড সেভ দ্য কিং) বাজানো হ'ত ও সেই সঙ্গে কিংস টোস্ট পান করা হত। সেও এক ড্রিল বিশেষ। খাওয়া শেষ হলে মেস প্রেসিডেণ্ট দাঁড়িয়ে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে গুরু গম্ভীর স্বরে বলতেন—মিঃ ভাইস্ দ্য কিং। তখন যিনি মেসের ভাইস্ প্রেসিডেণ্ট তিনিও ওই রকম উঠে দাঁড়িয়ে বলতেন—লেডীজ এণ্ড জেণ্টলমেন দ্য কিং এম্পরর। সেই বলার সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য সকলে উঠে দাঁড়িয়ে তাদের মদের গ্লাস উঁচু করে তুলে ধরত ও ব্যাণ্ড বেজে উঠত। তার পর 'গড সেভ দ্য কিং' এর প্রথম পংক্তি বাজানো শেষ হলে সকলে নিজের নিজের গ্লাস থেকে এক চুমুক খেয়ে সমস্বরে বলে উঠত, গড্ ব্লেস্ হিম্।

ব্যাপারটা সবশুদ্ধ মিনিট দুয়েকের, কিন্তু তাতে বেশ একটা বৈশিষ্ট্য ছিল। সাধারণতঃ লোকে ওই সময় পোর্ট বা শেরি পান করত। কিন্তু ব্যক্তি বিশেষে শুধু জলের মাধ্যমেও ওই কাজটা করা চলত। বলা বাহুল্য আমি শেষের দলেই ছিলাম। একদিন যখন আমি আমার গ্লাসে জল ঢালছি তখন সেটা স্বয়ং মিঃ 'কে'র নজরে পড়ে। মিঃ কে তখন উত্তর প্রদেশের আই জি পুলিশ। তিনি রাগের ভান করে আমায় বলে ওঠেন—ওহে কর কি? কর কি? মহারাজাধিরাজের যে ঠাণ্ডা লেগে যাবে—কথাটা বেশ মজার ছিল বলে আমার আজও মনে আছে।

প্রায় সব মিলিটারি বা পুলিশ মেসে ওই টোস্টের পদ্ধতি আজও চলে আসছে। তফাৎ এইটুকু যে কিং এম্পররের বদলে—দ্য প্রেসিডেণ্ট বলা হয়। আমার চোখে ব্যাপারটা আগাগোড়া অস্বাভাবিক বলে ঠেকে। কারণ, আমাদের দেশে কারুর স্বাস্থ্যের উদ্দেশে কোন পদার্থ পান করার প্রথা কোন কালেই ছিল না। ভেবে পাই না কেন যে আমাদের দেশ থেকে এই মিথ্যা অভিনয় তুলে দেওয়া হয় না।

আমি যেকালে ট্রেনিং স্কুলের মেসে ছিলাম সেকালে আমার সঙ্গে অন্য কোন ভারতীয় ছিল না। তাই আমার কখন কখন ডিনার টেবিলে ঘরভরা বিদেশীদের মধ্যে বসে মনে হত আমি এ কোথায় এসে পৌচেছি। শুধু যে খাবার ঘরে বসে এই কথাটা মনে জাগত তা নয়। মেসের আশে পাশের সমস্ত ভূমিটাই যেন ইংলণ্ডের এক খণ্ড বলে মনে হত। তাছাড়া মনে হত

যেন এক অস্পষ্ট ব্যবধান সাহেবদের ও এদেশীয় লোকেদের মধ্যে দাঁড়িয়ে। তবে এটা বলবো যে মেসের কর্মচারীরা যেন মুখ বুজে ও মন্ত্রচালিতের মত নিজের নিজের কাজ করে চলত।

আমি মেসে থাকতে ওই যে অনুশাসনের এক আচ্ছাদন দেখতে পাই সেটা কিন্তু বছর পঁচিশেক বাদে অনেকটা লোপ পেয়ে গেছে বলে মনে হল। এই যেমন ডিনারে আহ্বানসূচক বিউগ্‌ল ধ্বনির প্রথা সেই আগেকার মতই এখনও চলছে। কিন্তু সকলের যেন সেদিকে তেমন লক্ষ্য নেই। যার যেমন ইচ্ছা সেইভাবে ডিনারে আসছে। ছোট খাট বিষয়ে পারিপাট্যও যেন আগেকার-মত নেই। মেসের আভিজাত্যও যে আগেকার তুলনায় অনেকটা হ্রাস পেয়ে গেছে তারও দৃষ্টান্ত একদিন আমার চোখে পড়ে। আমি দেখি যে আমাদের রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর বাড়ির এক চাকর তার সঙ্গে মেসে ঢুকে দিব্বি আহারে ব্যস্ত। ঘটনাটা দেখে আমিও অবাক্। মনে মনে ভাবলাম সাহেবদের যুগে এটা কি সম্ভব হত?

ইতিমধ্যে আমাদের মেসের খাওয়ার পদ্ধতিও অনেকটা বদলে গেছিল। আগেকার দিনে কাঁটা চামচের সাহায্য ভিন্ন খাওয়ার নিয়মই ছিল না। সেই জন্য আমার সহকর্মীরা আমায় পরিহাস করে প্রায়ই জিজ্ঞাসা করত তুমি কি তোমাদের বাড়িতে মাটিতে বসে বা হাত দিয়ে খাও? বলতে লজ্জা করে, মেসে কিছুদিন বাস করার পর আমি যখন ছুটিতে বাড়ি যাই তখন ওই হাত দিয়ে খেতে কেমন যেন বাধ বাধ ঠেকত।

আমার সাথীরা যে শুধু আমাদের হাত দিয়ে খাওয়া সম্বন্ধে উপহাস করত তা নয়। অনেকে বলতো তোমরা নাকি অন্যের বাড়ি নিমন্ত্রণ খাবার পর একটা লম্বা ঢেকুর তুলে ঠারে ঠোরে তাকে তোমাদের কৃতজ্ঞতা জানাও? তাছাড়া তোমাদের দেশের মেয়েরা নাকি নাক কান ফুটো করে নোলক নাকছাপি জাতীয় অলঙ্কার পরতে অভ্যস্ত? ওদের কাছে এই সব বিদ্রূপসূচক কথা শুনে আমার গা জ্বলে যেত। কিন্তু একা ওদের সঙ্গে পেরে উঠবো কি করে?

আমি ওই মেসে থাকতে দেখি যে ছুরি কাঁটা ও চামচের অনেক রকম আকৃতি আছে। সেগুলো ব্যবহার করার নিয়ম কানুনও সঠিক জানা চাই। সুপ খেতে হলে এক বিশেষ ধরনের চামচ ব্যবহার করতে হয় আবার পুডিং খেতে হলে আর এক রকমের। তেমনি মাছ খেতে হলে ফিস্ নাইফ ব্যবহার করা চাই ও মাংস খেতে হলে আর এক রকমের। এই যে ছুরি কাঁটার সমস্যা

সেটা সমাধান করা আমার মত আনাড়ির পক্ষে বেশ কঠিন হ'ত যদি না আমি আড়চোখে অন্তের দিকে চেয়ে নিজেকে এ বিষয়ে মোটামুটি কায়দা দুরস্ত করে নিতে পারতাম।

টেবল ম্যানার্স বলে যে আর এক পদার্থ ছিল সেটাও আয়ত্ত করতে হলে ভারতীয়দের বিলক্ষণ বেগ পেতে হত। তাদের জানা আবশ্যক ছিল ভাত খেতে হলে ফর্কের বদলে চামচ ব্যবহার করা গ্রাম্য রীতি। আবার কড়াই সুটি খেতে হলে কাঁটা ও ছুরি দুই ব্যবহার করা দরকার। আমাদের দেশে চা বেশী গরম হলে সেটা পিরিচে ঢেলে খায়। সাহেবদের মধ্যে সেটা মোটেই চল নয়।

ভারতীয় হবার দরুণ আমি দেখতাম অনেক বিষয়ে আমি যেন আমার সাথীদের সমান-সমান গণ্য নয়। এ সূত্রে দ্রষ্টব্য যদিও তারা প্রত্যেকে তাদের পালা হিসেবে এক আধ বার মেস্ প্রেসিডেণ্ট হবার সুযোগ পেত, আমি কিন্তু সে সম্মান থেকে সমানে বঞ্চিত ছিলাম। সেটা আমার মনে খুব ঘা দিত। ভারতীয় অফিসারদের সেকালে অনেক বিষয়েই একঘরে করে রাখার নিয়ম ছিল। সাধারণতঃ কোন ভাল পোষ্টিং তাদের কপালে জুটতো না। তারা যতই সিনিয়র হোক্ না কেন তাদের সমানে ছোট ছোট জেলায় ফেলে রাখা হত।

একবার ত ভারতীয় অফিসারদের (হোক না তারা ক্লাস ওয়ান সারভিসের) হেয় করার উদ্দেশ্যে তাদের নামের পূর্বে মিষ্টার বা পরে স্কায়র না লিখে তাদের জাত হিসেবে লালা বাবু ঠাকুর চৌধুরি মুন্সি মির্জা বা মৌলভি লেখার চেষ্টা দেখা দেয়। সেই সময় আমিও আমার এক ওপরওয়ালার কাছ থেকে আমায় বাবু বলে লেখা দু' একখানা চিঠি পাই যাতে আমার আত্মসম্মানে আঘাত লাগে।

ওই যে সাহেবদের ও এদেশীয় লোকেদের বাসস্থানের মধ্যেকার এক অস্পষ্ট ব্যবধানের কথা আমি লিখলাম সেটা কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই চোখে পড়ত।

আমাদের মেসের অনতিদূরে এক বাসস্থান ছিল যেখানে এদেশীয় শিক্ষানবিশ ডেপুটি সুপারদের থাকার ব্যবস্থা ছিল। কিন্তু এই দুই দলের অফিসারদের পরস্পরের মধ্যে সহজভাবে মেলামেশার কোন চলন ছিল না। মনে হ'ত তারা যেন দুই ভিন্ন জগতের লোক। সাহেবরা মনে করত ওই জাতীয় দিশী লোকেদের সঙ্গে অবাধ মেলামেশা করলে তাদের যেন জাত যাবে। তাদের ভাবটা ছিল সেকালের দাক্ষিণাত্য ব্রাহ্মণদের মত যারা হরিজনদের ছায়া পর্যন্ত মাড়াতে কুণ্ঠিত হত।

আর এক ক্ষেত্র যেখানে এই ব্যবধানটা চোখে পড়ত সেটা ছিল মফঃস্বলের

সাহেবদের ষ্টেশন ক্লাব। তার একটি করে প্রত্যেক ডিস্ট্রিক্ট হেড কোয়ার্টার থাকত। সাহেবরা সন্ধ্যার সময় সেখানে গিয়ে গালগল্প ও খেলাধূলা করত। এই সব ক্লাবের এক বিশেষত্ব ছিল। সেখানে বসে জেলার অধিকারীরা তাদের সরকারী ও বেসরকারী সব রকম কাজেরই চর্চা করত। তারা পরস্পরের সাহায্যের জন্য সর্বদা উৎসুক থাকত। সাহেবদের একমাত্র লক্ষ্য ছিল যাতে এ দেশটা কোনকালে তাদের হাতছাড়া না হয়। সেইজন্য তারা জোট হয়ে কাজ করতে অভ্যস্ত ছিল।

উপরোক্ত ব্যবধান বজায় রাখার চেষ্টা সেকালে ট্রেন যাত্রীদের ক্ষেত্রেও দেখা যেত। এক সময় সাহেব ট্রেন যাত্রীদের মধ্যে যারা গরীব হ'ত তাদের জন্য এক তৃতীয় শ্রেণীর কামরা সংরক্ষিত থাকত। তাছাড়া শোনা গেছে যে যদিও প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর কামরায় ওই রকম প্রভেদ সূচক কোন তক্তা মারা থাকত না তবু সাহেবরা তাদের একাধিপত্য বজায় রাখার চেষ্টা কখন কখন গায়ের জোরেও করতে পেছপাও হ'ত না।

সাহেবদের তুলনায় এদেশীয় লোকেদের বিরুদ্ধে এক কালে যে এক চোখোমি করার নিয়ম ছিল তার এক জলন্ত দৃষ্টান্ত আমার জানা আছে। ঘটনাটা গোরখপুরের। যেদিন দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর আরমিস্‌টিস্ ডে উপলক্ষে সেখানে এক সমারোহ অনুষ্ঠিত হয়। সেই সূত্রে আমন্ত্রিতদের বসার জন্য দুখানা শামিয়ানা খাটানো হয়। একখানা বেশ জাঁকজমকের ও অন্যখানা সাধারণ ধরণের। এক নম্বরের শামিয়ানা সাহেবদের ও শুধু বিশিষ্ট ভারতীয়দের জন্য ও দুই নম্বরেরটি এদেশীয় সাধারণ লোকেদের জন্য রক্ষিত ছিল। যে সব কর্মচারীদের ওপর আমন্ত্রিত ব্যক্তিদের বসাবার ভার ছিল তাদের বলা ছিল তারা যেন লোক বুঝে তাদের কাজ নির্বাহ করে।

আমন্ত্রিত ব্যক্তিদের মধ্যে রাজা এমকুহি একজন ছিলেন। তিনি বংশানুক্রমে রাজা হওয়া ছাড়া তৎকালীন সরকারের কাছ থেকে অনেক উপাধি পেয়েছিলেন। সুতরাং তাঁর বিশিষ্ট ব্যক্তিদের মধ্যেই গণ্য হবার কথা। কিন্তু ভুলক্রমে তাঁকে দুই নম্বর শামিয়ানায় বসানো হয়। ভুলটা যখন গোরক্ষপুরের কমিশনার সাহেব মিঃ হর্বর্টের চোখে পড়ে তখন তিনি তাড়াতাড়ি রাজা সাহেবের কাছে গিয়ে ক্ষমা চান ও তাঁকে সঙ্গে করে এক নম্বর শামিয়ানায় নিয়ে যেতে চান। রাজা কিন্তু তখন দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। তিনি জোর গলায় বললেন, "না মিঃ হর্বর্ট। আমি ভারতবাসী—আমার স্থান এইখানেই।" অগত্যা মিঃ হর্বর্ট মুখ চুন করে ফিরে গেলেন।

এবার আমি আর এক দলের সাহেবদের কথা বলি যারা এককালে আমাদের দেশে খুবই প্রভুত্ব করে গেছে। তারা ছিল সাহেব জমিদার। প্রায় প্রত্যেক জেলাতেই ওই জাতীয় দু-দশ জন লোক থাকত যারা রাজার হালে দিন কাটাত। তাদের জমিদারি তারা কোম্পানির আমলে জলের দরে হস্তগত করে। তারপর নিজেদের বিদ্যাবুদ্ধি ও প্রতিভার ফলে তারা এমন এক বিরাট সম্পত্তির মালিক হয়ে ওঠে যা আজ ভাবাও যায় না। আমি এক সময় সুলতানপুরে থাকতে ওই রকম এক সাহেবের সংস্রবে আসি। তার নাম কিনিয়ন। সে সুলতানপুর থেকে প্রায় মাইল কুড়ি দূরে মুসাফিরখানা নামের এক গ্রামে বাস করত। সে তার সম্পত্তি তার বাপ ঠাকুর্দার কাছ থেকে বংশানুক্রমে পায়। তার সঙ্গে যখন আমার দেখা হয় তখন তার বয়স ৬০-এর ওপর হবে। সে নিজে দেখতে যেমন লম্বা চওড়া ছিল তার বাড়িখানাও ছিল সেই পরিমাণে বিরাট। কোম্পানির আমলে তৈরী সেরকম বাড়ি আজকাল আর দেখা যায় না। তার ছাউনি খড়ের হওয়ায় বাড়ির ভেতরটা গরমের দিনে চমৎকার ঠাণ্ডা থাকত। কিনিয়ন যে বাড়িটিতে বাস করত তার সঙ্গে প্রায় শ' খানেক বিঘে জমি ছিল। সেখানে চাষআবাদ করে সে প্রচুর শস্য উৎপাদন করত। অন্য কারবারের মধ্যে তার এক ধান ছাঁটার কল এক আটা পেসার কল ও এক তেলের কল ছিল। তাছাডা সে একটা মুর্গিখানা, একটা ডেয়ারি ও একটা পিগারির মালিকও ছিল। তাদের মাধ্যমে সে বেশ দু' পয়সা রোজকার করত। শুধু তাই নয়। তার এক যাত্রীবাহী বাসও ছিল। সেই বাস সুলতানপুর ও মুসাফিরখানার মধ্যে যাতায়াত করত।

কিনিয়ন একবার আমায় তার বাড়িতে ডিনার খেতে ডাকেন। আমি সেখানে গিয়ে সেখানকার ব্যবস্থা দেখে ত অবাক্। ভদ্রলোক ওই বিরাট বাড়িতে একা থাকা সত্ত্বেও তাঁর অনুচরবর্গের সংখ্যা ছিল অন্ততঃ ২০।২১ জন।

ওই যে ঘরোয়া চাকর বাকরের ব্যাপার যা ধীরে ধীরে প্রায় উঠেই যাচ্ছে এককালে এদেশে অন্য ধরণের ছিল। শোনা যায় তখন এক-একজন সাহেবের কাছে প্রায় শ' খানেক লোক তার বাড়ির কাজ করত। অবশ্য তখনকার দিনে বেতন হিসেবে তারা এক-আধ টাকাই পেত।

আজ বেশীদিনের কথা নয়। আমি যেকালে চাকরিতে ঢুকি সেকালে সাধারণতঃ এক জেলা অধিকারের কাছে গোটা বারো লোক তার বাড়ির কাজ করত। যথা এক খানসামা, এক খিদ্‌মত্‌গার, এক বেয়ারা, এক মশালচি, এক ভিস্তি, এক মেথর, এক সহিস, এক ঘেসেড়া ও গোটা চারেক মালি। খানসামার

কাজ ছিল সাহেবের খানা তৈরী করা, খিদমত্‌গারের কাজ ছিল খানা পরিবেশন করা, বেয়ারার কাজ ছিল সাহেবের কাপড় চোপড় দেখা ও বাড়ির ওপরকার কাজ করা, মসালচির কাজ ছিল উনুন ধরানো, ভিস্তির কাজ ছিল জল তোলা, মেথরের কাজ ছিল ঘর ঝাট দেওয়া, সহিসের কাজ ছিল সাহেবের ঘোড়ার দেখাশোনা করা ও ঘেসেড়ার কাজ ছিল ঘোড়ার জন্য ঘাস সংগ্রহ করা। অনেকের আবার একাধিক ঘোড়া থাকার জন্য একাধিক সহিস ও ঘেসেড়া থাকত। মালীর কাজ ছিল বাগানের দেখাশোনা করা ও ফুল ফল শাক সবজি উৎপন্ন করা।

আমি এক সাহেব ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেটের কথা জানি যার কাছে গোটা চারেক ঘোড়া থাকত। তিনি কখন কখন তাদের সাহায্যে একদিনে শ' খানেক মাইল পর্যন্ত কাবার করতেন। সেজন্য প্রত্যেক বিশ মাইল অন্তর তাঁর একটা করে ঘোড়া আগে থেকে দাঁড়িয়ে থাকত।

ওই ঘোড়ায় চাপা অভ্যাসটা সেকালে প্রায় সকল জেলা অধিকারিকের পক্ষে এক আবশ্যকীয় কাজ ছিল। তাতে তাদের কাজের অনেক সুবিধে হত। আজকালকার দিনে সেটা মোটরে বসে হয় না। তাই আমি যখন ১৯২৫ সালে আমার প্রথম গাড়িখানা কিনি ও তাতে করে গর্বভরে আমার এক সাহেব ডি. আই. জির সঙ্গে দেখা করতে যাই তিনি তাতে মোটেই খুশী না হয়ে আমায় ভর্ৎসনার সুরে বলেন, "তুমিও শেষে ওই হতচ্ছাড়া যান কিনলে?"

হ্যাঁ যা বলছিলাম। যে সাহেব জমিদারদের কথা হচ্ছিল তারা এক কালে নীল কুঠীর সাহেব বলে পরিচিত ছিল। তাদের ব্যবসা ছিল এক উদ্ভিদ থেকে নীল তৈরী করে ইউরোপে রপ্তানি করা। পরে যখন জার্মানিতে কৃত্রিম নীল তৈরী হল, তখন এ দেশের নীল কুঠির সাহেবরা তাদের ওই কাজ ছেড়ে সাধারণ শস্য উৎপাদনের কাজে লেগে যায়। তারা কিন্তু আমাদের দেশের লোকেদের ওপর অত্যাচার করত। তাই গান্ধীজী যখন আফ্রিকা ফেরৎ এদেশে আসেন তখন তাঁর প্রথম অভিযান বিহারের সাহেব জমিদারদের বিরুদ্ধে পরিচালিত হয়েছিল।

আমি যে যুগের কথা বলছি সে যুগে আর একজাতীয় লোক ছিল যাদের অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান বা ট্যাঁস বলে থাকি। তাদেরও প্রতি[illegible] কিছু কম ছিল না যেহেতু তারা নিজেদের ভারত সম্রাটের [illegible] বলে মনে [illegible]। তাদের প্রতি সেকালের শাসকদের বিশেষ পক্ষপা[illegible] ছিল। তার ফলে তারা রেল, টেলিফোন, টেলিগ্রাফ অর্ডনেন্স বিভা[illegible] প্রায় সকল মধ্যস্তরে

অধিকারিকের পদ দখল করে রাখত। পুলিশ বিভাগের সার্জেন্ট ও রিজার্ভ ইন্সপেক্টরের পদ একাধারে তাদেরই জন্য রক্ষিত থাকত। ওই জাতীয় লোকদের সঙ্গে ভারতীয়দের খটাখটি প্রায়ই লেগে থাকত।

আমি যখন ১৯২৫ সালে পুলিশ সুপার তখন আমার এক অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান রিজার্ভ ইন্সপেক্টরের সঙ্গে মন কষাকষি হয়। লোকটার ব্যবহারে আমার প্রতি কেমন যেমন অবজ্ঞার ভাব ছিল। তবে সে নিজেকে এমন করে বাঁচিয়ে চলত যে আমার দ্বারা তার বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ আনা চলত না। তাই কিছুদিন ধরে আমি যখন দেখি লোকটা শোধরাবার নয় তখন আমি আমার এক সাহেব ডি. আই. জিকে লিখে জানাই তাকে যেন স্থানান্তরিত করা হয়। তার উত্তরে কিন্তু তিনি আমায় মিষ্টি করে লিখে জানান যে ওই জাতীয় লোকেদের আমার মত ভারতীয় অফিসারদের সঙ্গে খাপ খাওয়াতে আরও কিছুদিন লাগবে। তাই আমি যেন এ বিষয়ে উদ্বিগ্ন না হই।

আমাদের ব্রিটিশ প্রভুদের পক্ষে আমাদের আচার ব্যবহার ও চালচলন অনুকরণ ত দূরের কথা তারা আমাদের ভাষাও ভাল করে আয়ত্ত করার চেষ্টা অনাবশ্যক বলে মনে করত। যতটুকু বা আয়ত্ত করত সেটুকুও তারা এমন বিকৃত সুরে উচ্চারণ করত যে শুনতে অদ্ভুত লাগত। বলতে হাসি পায়, আমাদের স্বদেশীয় অফিসারদের মধ্যে অনেকে ওই রকম মেকী সুরে তাদের অনুচরবর্গের সঙ্গে কথা বলতে বা নিজেদের আচার ব্যবহার ত্যাগ করে সাহেবিয়ানা করতে কুণ্ঠিত বোধ করত না। এ সূত্রে এক দেশী সাহেবের কথা বলি যিনি একদিন ভান করে তাঁর একটি অমাত্যকে জিজ্ঞাসা করেন, বল দেখি তোমাদের হোলী পর্বটা কিরূপ ও তোমরা সেটার পালনই বা কিভাবে কর? সে লোকটিও বেশ ওস্তাদ ছিল। উত্তরে সে বলে, বেশী হুজুর কি বলবো সায়েব। ওটা আমাদের কাছে ঠিক তেমনটি যেমন আপনাদের কাছে ক্রিস্‌মাস। দুঃখের বিষয় আমাদের মধ্যেকার ওই বিজাতীয় ভাব এখনও সম্পূর্ণ লোপ পায় নি। আমাদের মধ্যে অনেকেই পরস্পরের সঙ্গে ইংরাজিতে কথা কইতে ভালবাসে ও আমাদের ছেলেমেয়েরা মামি ড্যাডি বলে আমাদের ডাকতে শিখেছে।

আমি ওই যে আমাদের আচার ব্যবহারের বিষয়ে বললাম সে সূত্রে একটা কথা মনে পড়ে গেল। মুরাদাবাদ ট্রেনিং স্কুলে থাকতে আমি যখন আমার বাড়িতে কয়েকদিনের ছুটি উপভোগ করার পর মুরাদাবাদ ফিরে যাই তখন আমার এক সাহেব সহকর্মী জানতে চায় আমার বাড়ির লোকেরাও আমায়

দেখে কি বললেন ? আমি তখন আমার এক দিদির উল্লেখ করে জানাই, তিনি আমায় বলেছিলেন—তুই দেখছি সাহেবদের জামাই সেজে তাদের মধ্যে খুব আদরে গোবরে ছিলি। কথাটা বাংলায় বলা সহজ কিন্তু তার ইংরাজি অনুবাদ করতে গিয়ে আমায় হিমসিম খেতে হয়েছিল। তাছাড়া আমাদের দেশের জামাই আদর যে কি বস্তু সেটা বোঝাতে আমার ঝাড়া একটি ঘণ্টা সময় লেগে যায়।

এবার আমি ওই পুলিশ মেসে যোগ দেবার কয়েকদিন পরেকার ইনট্রোডকশন নাইটের কথা বলি। সেদিন ডিনারের পর আমার সঙ্গীরা আমায় ধরে বসল আমাকে এদেশের একটা গান গেয়ে শোনাতে হবে। আমি যেহেতু কোন কালেই গান গাওয়ার ধার দিয়েও যাইনি তাই এই অন্যায় আব্দারের ফলে মহা ফাঁপরে পড়ি। তাদের নাছোড়াবান্দা অনুরোধে অনন্যোপায় হয়ে আমি এক টেবিলের ওপর দাঁড়িয়ে আমার বাল্যকালের পড়া পদ্যপাঠ প্রথম-ভাগের এক পদ্য হাত পা নেড়ে আউড়ে গেলাম। এই ভূমণ্ডল দেখ কি সুখের স্থান, সকল প্রকারে সুখ করিতেছে দান। জীবন ধারণ কিম্বা আরাম কারণ ইত্যাদি। আমার সাথীরা হাঁ করে আমার আবৃত্তিটা শুনে গেল। তার পর আমি যখন টেবিল থেকে নেমে পড়ি তখন যেন তাদের হুঁস হয়। তাদের মধ্যে একজন আমায় বলে—কই তোমার ওই গানে ত কোন রকম ই-ই-ই ছিল না—যা এদেশের সব পাকা গানেতেই শোনা যায় ?

এই গানের কথায় আমার মনে পড়ে গেল আজকালকার দিনে আমাদের দেশে পাকাই হোক্ বা কাচ্চাই হোক্ সব রকম গানের যা দুর্গতি হচ্ছে তার অন্ত নেই। দিনে বা রাত্রে এমন কোন সময়ই নেই যখন আমাদের বাড়ির আশেপাশের কোন না কোন লাউড স্পিকারের মাধ্যমে একটা না একটা গান বিকৃতভাবে ভেসে আসছে। ব্যাপারটা এমন সঙ্গীন হয়ে দাঁড়িয়েছে যে কোন কোন রাত্রে ত আমাদের চোখ বোঁজবার যো নেই। আমি বলি গান-বাজনা উত্তম পদার্থ, কিন্তু তার আধিক্য অনেকেরই সয়না। সময় সময় ত এমন বিশ্রী ও কর্কশ সুর আমাদের কানে এসে লাগে যে তাকে গানের শ্রাদ্ধ বললেও চলে। দুঃখের বিষয় অনেকেই তাদের পাড়াপড়শিদের সুবিধা অসুবিধার কথা ভাবতেও শেখেনি।

উচ্চাঙ্গের সঙ্গীতের প্রতি খাঁটি অনুরাগ যতটা ইউরোপীয়দের মধ্যে আছে, ততটা আমাদের মধ্যে নেই। অনেকদিন আগে যখন আমি একবার ভিয়েনা যাই তখন দেখি সেখানে প্রায় সব পার্কের ভেতরই একটা করে কনসার্ট হল্

আছে, যেখানে বসে লোকেরা মনের আনন্দে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত শোনে। তার এক একটি পর্ব শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাদের কী হাততালির ধুম। সেখানকার এক বিখ্যাত অপেরা হাউস্ দেখে ত আমার চক্ষুস্থির। বাড়িখানা বিরাট ও গোলাকৃতি। তার ভেতর কয়েক হাজার দর্শকের থাকে থাকে বসবার ব্যবস্থা আছে।

অপেরা অনেকটা আমাদের দেশের যাত্রার মত। তবে যেহেতু আমি তার একটি অক্ষরও বুঝতে পারছিলাম না, তাই আমি আমার কয়েকটি ভারতীয় সঙ্গীদের সঙ্গে অতি নিম্ন স্বরে কথা জুড়ে দিই। ফলে চারধার থেকে আমার কানে এমন এক আপত্তিসূচক হিস্ শব্দ যায় যে লজ্জায় আমার যেন মাথা কাটা গেল। আমি তখন দেখি উপস্থিতদের মধ্যে প্রায় সকলেরই হাতে একখানা করে বই। সেটা তারা গভীর মনোযোগ দিয়ে দেখছে। সেটা দেখে আমার মনে হল মিথ্যাই আমরা আমাদের সঙ্গীতানুরাগের বড়াই করি।

আমি যেকালে পুলিশ মেসে ছিলাম সেকালে আমাদের এক প্রিন্সিপ্যাল মিঃ গর্ডন (যিনি ডড সাহেবের পর এসেছিলেন) প্রায়ই আমাদের সঙ্গে বসে ডিনার খেতেন। ডিনারের পর তিনি আমাদের নৈশ গানের আসরে যোগ দিতেন। কখন কখন আমাদের ওই আসর ভাঙতে রাত ১টা বা ২টো বেজে যেত। একবার ওই রাত জাগার ফলে আমাদের মধ্যে থেকে দু একজন পরদিন সকালে প্যারেডে আসতে এক আধ মিনিটের জন্য দেরী করে ফেলে। মিঃ গর্ডন সেজন্য তাদের বেশ দু-এক কথা শুনিয়ে দেন। যদিও তাদের দেরীতে আসার জন্য তিনি নিজেই অনেকটা দায়ী ছিলেন। এই ঘটনা সূত্রে ব্রিটিশ চরিত্রের এক বিশেষ দিক্ আমার চোখে ফুটে ওঠে।

মেসে থাকতে আমি লক্ষ্য করি যে ইংরাজদের মধ্যে কোন রকম শৈথিল্য সে প্যারেডের সময়েই হোক্ বা অন্য কোন সময়েই হোক্ অমার্জনীয়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলি, একবার এক শিক্ষানবিশ প্রিন্সিপ্যাল সাহেবের ঘরে ঢোকবার আগে তার কোটের একটা বোতাম আঁটতে ভুলে যায়। তাতে সে যে বকুনিটা খেয়েছিল তা সে কখনও ভুলতে পারেনি। আমাদের চরিত্র গঠনের বিষয়ে এই খুঁটিনাটি বিষয়গুলি যে কতটা সাহায্য করে তা আমরা বুঝেও বুঝি না।

ইংরাজিতে এক প্রবাদ আছে—ইমিটেশন ইজ দ্য বেস্ট ফর্ম অফ কমপ্লিমেণ্ট। কিন্তু সময়ে সময়ে তার যে কতটা উল্টো ফল হয় সেটা একবার আমি নিজের চোখে দেখি।

এক ভারতীয় শিক্ষানবিশ সাহেবদের দেখাদেখি পাইপের সাহায্যে ধূম-

পানের অভ্যাস শুরু করেছিল। তার ধারণা ছিল ওটা এক আধুনিক ফ্যাশান যা তার আয়ত্ত করা চাই। সে কিন্তু জানত না সেটা কোন বৈঠকে বা মহিলাদের সমক্ষে করা ভদ্রজনোচিত নয়। তাই একদিন সে যখন পুলিশ মেসে ঘরভরা পুরুষ ও মহিলা অতিথিদের মধ্যে বসে নির্বিকার চিত্তে তার পাইপের সাহায্যে ধূমপান করছিল তখন সেটা পুলিশের বড কর্তার চোখে পড়ে। তিনি রাগে গম্ গম্ করতে করতে তার কাছে গিয়ে তাকে রূঢ় স্বরে সেই মুহূর্তে পাইপটা ছুঁড়ে ফেলতে বলেন।

ইংরাজি আচার ব্যবহার সম্বন্ধে ভারতীয়দের মধ্যে অনেকেই যে অজ্ঞ ছিল সেটা স্বাভাবিক। আমি নিজে একবার ওই ব্যাপারে কতদূর বোকা বনেছিলাম তার এক দৃষ্টান্ত দিই :

আমি মুরাদাবাদ পৌঁছবার পর আমাদের প্রিন্সিপ্যাল আমায় স্থানীয় বিবাহিত অফিসারদের এক তালিকা দেন ও বলেন, আমি যেন আমার সুবিধামত তাদের বাড়ি গিয়ে নিজের নাম লেখা কার্ড ছেড়ে আসি। সেকালে প্রত্যেক সাহেবের বাডির বাইরে একটা করে নট্ এট্ হোম্ বক্স টাঙ্গানো থাকত। তার ওপর সে বাড়ির শুধু কর্ত্রীর নাম লেখা থাকত। আমার মত নবাগত পুরুষদের তাতে কিন্তু দুখানা করে কার্ড ফেলার নিয়ম ছিল। আমি সেটা না জেনে ভুল করে এক বাডিতে গিয়ে শুধু একখানা কার্ড ছেডে আসি। সেজন্য আমায় পরে লজ্জিত বোধ করতে হয়। আর এক বাডি গিযে আমি যখন শুনি সাহেব বাড়ি নেই, শুধু মেমসাহেব আছেন, তখন আমার উচিত ছিল সে বাডির নট্ এট্ হোম্ বাক্সে আমার দুখানা কার্ড ছেড়ে চলে আসা। আমি কিন্তু তা না করে নাছোড়বান্দার মত বাডির বাইরে দাঁড়িয়ে থাকি। কাজে কাজেই বাড়ির কর্ত্রী আমায় ডেকে পাঠাতে বাধ্য হন। যদিও তিনি সে সময় কারুর সঙ্গে দেখা করার জন্য প্রস্তুত ছিলেন না। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ আজকালকার দিনে আমাদের দ্বারা ওই সব জটিল সমস্যার সমাধান করার আর কোন বালাই নেই।

আমি আগেই বলেছি, সাহেবদের মধ্যে অনেকে সেকালে এদেশে বাঘ ভাল্লুক ও অন্যান্য বন্য জন্তু জানোয়ার শিকারের লোভে চাকরি নিয়ে আসত। অবশ্য বাঘ শিকারই ছিল সবচেয়ে আকর্ষণীয়। এক সময় এদেশের বাঘের সংখ্যাও ছিল বহু। এই বাঘ শিকারের ঝোঁকে যে শুধু সাহেবদেরই মধ্যে ছিল তা নয়। আমাদের অনেক রাজা মহারাজাও এ বিষয়ে সিদ্ধহস্ত ছিলেন। আমি এক মহারাজার কথা জানি যিনি গর্ব করে বলতেন, তাঁর বাঘ শিকারের

সংখ্যা এক হাজারেরও ওপর হয়ে গেছে। আর একজন রাজার কথা জানি, যাঁর দ্বারা ৮।৯ শ' বাঘ মারা হয়ে গেছিল ও যিনি তাঁর এক হাজারের কোটা পুরো করার জন্য বিশেষ উৎসুক ছিলেন।

অনেক বিদেশী দিগ্‌গজরা আবার বাঘ শিকারের উদ্দেশ্যে এ দেশের বিশেষ-বিশেষ মহারাজাদের অতিথি হয়ে আসতেন। একবার আমি জয়পুর বেড়াতে গিয়ে সেখানকার গভীর জঙ্গলের ভিতর এক পাকা কুঠরি দেখতে পাই। তার সামনে এক লোহার খুঁটি পোঁতা ছিল। যখনই মহারাজার কোন গণ্যমান্য অতিথির বিদেশ থেকে আসবার কথা উঠত তখন থেকে ওই খুঁটিতে প্রত্যহ একটা করে মোষ বাধা হত। বাঘ তার খাদ্যদ্রব্য অত সহজে পেয়ে ওই জায়গাটা আর ছাড়ত না। ফলে নির্দিষ্ট দিনে উপরোক্ত কুঠরিতে বসে তাকে গুলি করে মারার চেয়ে সহজ কাজ আর ছিল না।

বাঘ ভাল্লুক শিকার ছাড়া সেকালে অনেকের আবার পাখী শিকারের খুব ঝোঁক ছিল। প্রত্যেক বছরে কোন না কোন রাজা বা মহারাজা তাঁদের এলাকায় বড়লাট বা ছোটলাটের খাতিরে পাখী শিকারের একটা করে বিরাট আয়োজন করাতেন। তাতে হাজার হাজার পাখী মারা যেত। ভরতপুরে এক ঝিল আছে যেখানে শীতকালে লক্ষ লক্ষ রাজহাঁস সাইবেরিয়া থেকে উড়ে চলে আসে। তাই সেখানকার মহারাজা ভাইসরয়ের খাতিরে ওই রকম এক শিকারের আয়োজন প্রত্যেক বছর করতেন। শিকারীদেরও বছরে একবার করে ওই রকম পাখী শিকারের ধুম পড়ে যেত।

সাহেবদের কাছে অন্যান্য শিকারের মধ্যে বন্যবরাহ শিকারও যথেষ্ট প্রিয় ছিল। এই শিকার ঘোড়ার পিঠে চড়ে বর্শা দিয়ে করার নিয়ম ছিল। সাধারণতঃ এটা নভেম্বর-ডিসেম্বর থেকে মে-জুন পর্যন্ত চলত। এই শিকারের ক্ষেত্র ছিল বড় বড় নদীর চরভূমি। বছরে একবার করে গ্রীষ্মকালে মীরাট জেলায় এরই এক আন্তদেশীয় প্রতিযোগিতা হত। তাতে অনেক সাহেব অংশ নিত। জন্তুটা যখন তাড়া খেয়ে ঝোপ ঝাপের ভেতর থেকে বেরুতো ও তীর-বেগে আঁকাবাঁকা উঁচু পথ দিয়ে ছুটতো তখন শিকারীরা তার পেছনে ঘোড়া ছুটিয়ে দিত। যে সবার আগে জন্তুটার গায়ে তার বর্শার খোঁচা দিয়ে রক্ত বার করতে পারত তাকেই জয়ী বলে ধরা হত। কিন্তু জন্তুটাকে প্রাণে মারা সহজ ছিল না। মাঝে মাঝে সে আবার ঘুরে দাড়াত ও তার নাকের অগ্রভাগের খাড়া দিয়ে অনেককে ঘায়েলও করত।

এবার আমি আর এক ঘটনার কথা বলে আমার এ অধ্যায় শেষ করবো।

১৯২২ সালের ডিসেম্বর মাসের মাঝামাঝি লর্ড রেডিংএর লখনউ আসার উপলক্ষে আমায় সেখানে স্পেশাল ডিউটিতে যেতে হয়। আমার কাজ ছিল যেসব রাস্তা দিয়ে তিনি যাবেন সেই সব রাস্তায় টহল দেওয়া। সেই সূত্রে আমার জন্য সেথান থেকে একটি ঘোড়া সংগ্রহ করা হয়েছিল। ঘোড়াটা আর সব দিক থেকে এক রকম ভালই ছিল। তবে একটা তার মহা দোষ ছিল। সে হাতী দেখলেই এমন ক্ষেপে যেত যে আমার বিপদের সম্ভাবনা দেখা দিত। ঘটনাচক্রে ওই সময় লখনউতে বহু সংখ্যক হাতীর আমদানী হয়। তাদের শুধু কাজ ছিল দরবারের দিন দরবার-তাঁবুর এক পাশে অর্ধচক্রাকারে দাঁড়িয়ে তাদের শুড তুলে লাটসাহেবকে সেলাম জানানো। ওই হাতীর ছড়াছড়ির দরুন আমার প্রাণান্ত হবার উপক্রম হয়। আমার ঘোড়া আমায় যাতে ফেলে না দেয় সেই ভয়ে আমাকে সর্বদা সতর্ক থাকতে হত। যে মুহূর্তে আমি আমার চোখের গণ্ডীর মধ্যে কোন হাতী দেখতে পেতাম সেই মুহূর্তে আমার ঘোড়ার লাগাম টেনে তার মাথা অন্য দিকে ঘুরিয়ে দিতাম। বার বার ওই কসরত করার পর আমি তাতে এমন অভ্যস্ত হয়ে যাই যে তা নিয়ে আর ভাবতে হত না।

ওই ক'টা দিনের মধ্যে এক ছুটির দিন সকালে আমি যখন সাইকেলে চেপে দিব্যি আমার বাসস্থানের দিকে যাচ্ছি তখন দেখতে পাই আমার সামনের দিকে কিছুদূরে রাস্তার পাশে একদল হাতী এক ডোবার জলে তাদের স্নান সারছে। সেটা দেখামাত্র অভ্যাসবশে ঝঁা করে আমার সাইকেলের হ্যাণ্ডেলটা উল্টো দিকে ঘুরিয়ে দিই। পরে অবশ্য নিজেই হেসে হেসে বাঁচি না। আমি মনে ভাবি, মানুষের অভ্যাস তাকে কতদূর না কাবু করে ফেলে। ঘটনাটা সেই কল্পিত ভদ্রলোকটির কথা মনে করিয়ে দেয়, যিনি প্রত্যহ সকালে ছড়ি হাতে হেঁটে বেড়াতে যেতেন ও একদিন বাড়ি ফিরে নাকি তাঁর ছড়ির বদলে তিনি নিজেই এক দেয়ালের গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন।

সত্যযুগ

আমার চাকরিতে ঢোকার কিছুদিন পর এ. এস. পি. হয়ে ফরাক্কাবাদ যাই। সেখানে আমি মিঃ নট্‌বাওরের (পরে স্যার জন) অধীনে কাজ করার সুযোগ পাই। তিনি এক নামকরা পুলিশ অফিসার ছিলেন ও নিজের দেশে ফেরবার পর কিছুদিনের জন্য লণ্ডন মেট্রোপলিটন্ পুলিশের কমিশনারের পদে কাজ করেন। আমি যখন ফারাক্কাবাদ গিয়ে পৌঁছাই তখন তিনি ট্যুরে ইন্দরগড় গেছেন।

খবর নিয়ে জানলাম ইন্দরগড় পৌঁছাতে হলে আমায় প্রথমে ট্রেনে কনৌজ, তারপর কনৌজ থেকে মাইল দশেক পাকা রাস্তা দিয়ে তিরওয়া, আবার তিরওয়া থেকে আরও মাইল চৌদ্দ কাঁচা রাস্তা দিয়ে ইন্দরগড় যেতে হবে। তাই আমি একদিন দুর্গা নাম জপ করে রাত একটার গাড়িতে রওনা হয়ে ভোর চারটে নাগাদ কনৌজ গিয়ে পৌঁছলাম। শীতের দিন বলে তখনও সূর্যোদয় হতে ২/৩ ঘণ্টা বাকী। ওই সময়টুকু আমি স্টেশনেই অপেক্ষা করলাম। কনৌজের বড় দারোগা আমার জন্য তিরওয়ার রাজার এক জুড়ীগাড়ির ব্যবস্থা করে রেখেছিলেন। আমি সেই গাড়ি করে বেলা ১০টা নাগাদ তিরওয়া গিয়ে পৌঁছলাম।

তিরওয়া থেকে কাঁচা রাস্তা দিয়ে আরো ১৪ মাইল আমার যাওয়ার ছিল। ওই পথটুকু আমি আবার রাজা তিরওয়ার এক হাতীর পীঠে অতিক্রম করি। আমার সেই প্রথম হাতী চড়ার অভিজ্ঞতা হয়। তাতে আরোহীর শরীর পর পর একবার সামনের দিকে একবার পিছনের দিকে একবার ডাইনে ও একবার

বাঁয়ে এমন দোল খেতে থাকে যে তার অবস্থা কাহিল হবার কথা। আর যদি হাতীটা ক্ষেপে যায় সেই ভয়ে তাকে খোঁচানও যায় না। তাই ওই চৌদ্দ মাইল পথ অতিক্রম করতে মনে হল যেন চৌদ্দ বছর কেটে গেল। মোট কথা আমি যখন ইন্দরগড় গিয়ে পৌছাই তখন বেলা দুটোর কাছাকাছি। আমার অনভিজ্ঞতার জন্য আমি আমার সঙ্গে অন্য জামা কাপড় বা বিছানা-পত্তর নিয়ে যাওয়া আবশ্যক মনে করিনি। আমার বাড়ি ফিরবার তাড়াও ছিল তাই আমি কালবিলম্ব না করে ফিরতি পথে বেরিয়ে পড়ি।

ইন্দরগড় থেকে আবার ওই হাতীর পিঠে চড়ে তিরওয়া পর্যন্ত আসতে আমি বেশ কাবু হয়ে পড়ি। সেখান থেকে আমি রাজার এক সন্‌বীম্ গাড়ি করে কনৌজ আসি। কনৌজে কিন্তু এসে দেখি আমার ট্রেন ছেড়ে দিয়েছে। আমি তখন আবার সেই মোটরে করে রেলগাড়ির সঙ্গে পাল্লা দিই। কনৌজ থেকে রেলের লাইন ফরাক্কাবাদ পর্যন্ত পাকা রাস্তার ঠিক পাশ দিয়ে গেছে। কিন্তু মাঝে কয়েকটা রেলের ক্রসিং থাকাতে আমায় বারবার আটকে পড়তে হয়। সেটা রেলের যাত্রীদের পক্ষে এক মজার ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। যখনই তারা আমায় ক্রসিং-এর সামনে আটকে থাকতে দেখে তখনই আমায় লক্ষ্য করে হাততালি দেয়।

আমি যখন গুরসহায়গঞ্জ স্টেশনে এসে পৌছাই তখন দেখি ট্রেন সেখানে দাঁড়িয়ে। তারপর যদিও সেদিন আর কোন ব্যাঘাত ঘটেনি তবু আমার বাড়ি ফিরতে রাত ১০টা বেজে গেছিল। বাড়ি পৌছে আমার প্রথম হুঁস হয় যে গত ২৪ ঘণ্টার মধ্যে আমি জলস্পর্শ পর্যন্ত করিনি।

•

আমার এই অভিযানের কয়েকদিন বাদে যখন নট্‌বাওর সাহেব কায়মগঞ্জে ক্যাম্প করছেন তখন তিনি আমায় সদর থেকে ডেকে পাঠান। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল যাতে আমি তাঁর কাছে দু-চার দিন থেকে কিভাবে থানার কাজ দেখতে হবে শিখে নিই। ফরাক্কাবাদ থেকে কায়মগঞ্জ ২০।২২ মাইল। সেই পথটুকু আমি আমার ঘোড়ার পিঠে ঘণ্টা তিনেকের মধ্যে অতিক্রম করি। মাঝে কিছু দূর আমায় এক খাদের মধ্যে দিয়ে যেতে হয়। সেই সময় দুটো জন্তুকে আমার পিছু নিতে দেখি। প্রথমটা আমি তাদের দিকে বিশেষ লক্ষ্য করিনি। পরে যখন দেখি যে তারা কিছুতেই আমার সঙ্গ ছাড়ছে না তখন আমার মনে একটু ভয়ের উদ্রেক হয়। আমি বুঝতে পারি যে জন্তু দুটো নেকড়ে। আমি যখন ওই খাদটা পেরিয়ে শস্যের ক্ষেতের মধ্যে গিয়ে পড়ি তখন তারা আমার পিছু

ছাড়ে আমিও হাঁফ ছেড়ে বাঁচি। তাদের হিংস্র চাহনি ও লকলকে জিবের দৃশ্য আজও আমার মনে আছে।

এদেশে নেকড়ের উপদ্রবের কথা অনেকেরই জানা আছে। প্রায়ই তারা রাতের অন্ধকারে গ্রামের ভিতর ঢুকে ছোট ছোট শিশুদের মুখে তুলে নিয়ে পালায়। ওইভাবে আমাদের দেশের কতশত বাচ্চা যে তাদের কবলে প্রাণ হারিয়েছে তার ইয়ত্তা নেই।

আমি যখন কায়মগঞ্জ গিয়ে পৌঁছাই তখন দেখি মিঃ নট্‌বাওর বন্দুক হাতে তাঁর কয়েকজন চাকর চাপরাশি নিয়ে পাখী শিকারের উদ্দেশ্যে বেরুচ্ছেন। তখন বিকাল ৫টা। আমিও শুধু হাতেই ওঁর সঙ্গ নিলাম। আমাদের কাজ হল মিঃ নট্‌বাওরকে মাঝে রেখে এক লম্বা সার বেঁধে সেখানকার শস্যক্ষেতের ভেতর দিয়ে হৈ হৈ করতে করতে অগ্রসর হওয়া। যে সব পাখী এখন তাদের খাবার অন্বেষণে ব্যস্ত তারা আমাদের তাড়া খেয়ে উড়ে পালাবার চেষ্টা করতে বাধ্য। ওড়ার সঙ্গে সঙ্গেই নট্‌বাওর সাহেব বন্দুকের গুলিতে তাদের ধরাশায়ী করেন। ওঁর নিশানা এমনই মোক্ষম ছিল যে কোনটাই যেন ফাঁকা গেল না। মিনিট ২৫ ৩০ এর মধ্যে তিনি ডজন খানেক পাখী ও গোটা দুই খরগোস মেরে ফেললেন।

তাঁবুতে ফিরে রাত্রের ডিনারের জন্য আমার কি পোষাক পরা দরকার তা নিয়ে আমি এক সমস্যায় পড়ি। আমার বেয়ারা নট্‌বাওর সাহেবের বেয়ারার কাছে চুপিচুপি খোঁজ নিয়ে আবিষ্কার করে সাহেব প্রত্যহ রাত্রে ডিনার ড্রেস পরে খেতে বসেন। সৌভাগ্যক্রমে আমার সঙ্গে আমার ডিনার ড্রেস ছিল বলে আমার কোন অসুবিধা হল না। সেকালে পাকা সাহেবরা একা থাকলেও ওই রকম ধড়াচূড়া পরে ডিনার খেতে অভ্যস্ত ছিলেন।

রাত্রে ডিনারেব পব সাহেব আমার জন্য এক ট্যুর প্রো. াম তৈরী করেন। তিনি কাগজে এঁকে দেখিয়ে দেন আমার এলাকার মধ্যে কালী নদীর কোন কোন বাঁকে বা কুণ্ডতে আমি কুমীর শিকারের আশা করতে পারি। তাঁর কথায় বেশ বোঝা যাচ্ছিল জেলার প্রত্যেকটি অলিগলি তাঁর নখদর্পণে।

পরদিন সকালে প্রাতঃরাশ সারবার পর ৯টা নাগাদ আমরা নিজের নিজের ঘোড়ার পিঠে বসে থানায় গেলাম। শহরে ঢুকতেই দেখি স্থানীয় দারোগা মহম্মদ সিদ্দিক আমাদের অপেক্ষায় নিজের ঘোড়ার লাগাম ধরে রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে। দারোগার আমাদের সঙ্গে যোগ দেবার পর মনে হচ্ছিল আমরা যেন এক শোভাযাত্রায় বেরিয়েছি। নট্‌বাওর সাহেব ও আমি আগেভাগে চলেছি। মহম্মদ সিদ্দিক চলেছেন আমাদের পেছনে কয়েক হাত ব্যবধান

রেখে। দেখি রাস্তার দুধারে বহু সংখ্যক নরনারী হাঁ করে দাঁড়িয়ে। মাথার ওপরে দড়িতে গাঁথা রং বেরং-এর পতাকা শোভা পাচ্ছে। মাঝে মাঝে আমাদের অভ্যর্থনাসূচক কয়েকটা ফুল পাতার তোরণও দেখতে পেলাম।

থানার সদর দরজা ও ভেতরটা যেন বিয়ে বাড়ির মত সাজানো। বিশেষ করে আমার চোখে পড়ে সোনালি জরির কাজ করা এক লাল ভেলভেটের আচ্ছাদন যা সাধারণতঃ হাতীর পিঠে ঝুলের কাজে আসে। উপস্থিত ক্ষেত্রে সেটা থানার অফিস টেবিলের ওপর পাতা ছিল। তার চেয়েও মজার ছিল সেই রকমই ধার করে আনা আমাদের বসবার জন্য লাল ভেলভেটের গদি দেওয়া ও সিংহাসনের আকারে তৈরি দুখানা চেয়ার। তার মধ্যে একটা ছিল সোনালি রং-এর ও অন্যটা রূপোলী। অবশ্য সোনালিখানা ছিল মিঃ নটবাওরের জন্য ও রূপালীখানা আমার জন্য। এইসব ভড়ং দেখে আমার খুব হাসি পায়। মিঃ নটবাওরের কাছে কিন্তু এসব নতুন কিছু নয় বলে তাঁকে একটিবারও চোখের পাতাটি পর্যন্ত ফেলতে দেখলাম না।

আজকাল অবশ্য পুলিশ সাহেবের বাৎসরিক থানা ইন্সপেকশন উপলক্ষে উপরোক্তভাবে তাঁর অভ্যর্থনার পদ্ধতি একেবারেই উঠে গেছে। কিন্তু এক সময় ছিল যখন সেটা খুবই সাধারণ ব্যাপার বলে ধরা হত। আমি যখন একবার মির্জাপুর জেলার অদলহাট থানা ইন্সপেকশনে যাই তখন দেখি যে আমার ক্যাম্পের চারধারে অগুনতি ছোট বড় পতাকার ছড়াছড়ি ত আছেই উপরন্তু সেখানকার প্রবেশ দ্বারের ওপর বড় বড় সোনালী অক্ষরে লেখা ওয়েল-কাম টু আওয়ার নোব্‌ল এস পি এণ্ড হিজ ওয়াইফ্‌।

এ সূত্রে আমার আর এক ক্যাম্পের কথা মনে পড়ে। সেটা আমি ওই মির্জাপুরে থাকতেই বড়দিনের সময়ে করি। আমার সঙ্গে আমার ডি আই জি মিঃ বেল্‌ ও তাঁর স্ত্রী ছাড়া আরও কয়েকজন সাহেব মেম ছিলেন। ক্যাম্পের জায়গাটার নাম হাতিনালা। সে এক গভীর জঙ্গলের মধ্যে। সেখানে গিয়ে দেখি জায়গাটা ঘিরে এক খাল বয়ে চলেছে, তার স্ফটিক স্বচ্ছ জল কুলকুল শব্দে প্রবাহিত হচ্ছে। ক্যাম্পের চারধারে অসংখ্য শাল গাছ। তাদের ওপর সূর্যের কিরণ পড়ে এক অদ্ভুত আলো ছায়ার সৃষ্টি হয়েছে। ক্যাম্পের প্রবেশ দ্বারে এক বিরাট লাল শালুর কাপড় টাঙানো। তার ওপর বড় বড় সোনালী অক্ষরে লেখা—"ওয়েলকাম টু হাতিনালা ক্যাম্প"। ক্যাম্পের ভেতরটা আবার এমন ভাবে সাজানো যে হঠাৎ মনে হয় যেন দ্বিতীয় ইন্দ্রপুরী।

এখানে সেখানে গাছের কাটা ডাল থেকে কলা কমলালেবু আপেল আনারস ন্যাসপাতি ইত্যাদি অনেক ভাল ভাল ফল ঝুলছে। রাত্রে যাতে আলোর অভাবে আমাদের কষ্ট না হয় সে জন্যে দেখি অনেকগুলি গ্যাস বাতি এখানে সেখানে টাঙ্গানো। সন্ধ্যার পর যখন সেগুলো জ্বালানো হত তখন দিনের মত আলো ছড়িয়ে পড়ত। আরো দেখি যে প্রত্যেকটি তাঁবুর মেঝে আগাগোড়া পুরু মির্জাপুরী কার্পেট দিয়ে মোড়া। তার ওপর পা ফেললে মনে হয় যেন পা তার মধ্যে ডুবে গেল।

এই সব ব্যবস্থাই স্থানীয় দারোগা সামসুদ্দিনের উর্বর মস্তিষ্কের গবেষণার ফল। আমাদের মনোরঞ্জনের জন্য স্থানীয় আদিবাসীদের এক রকম নাটকের ব্যবস্থা ছিল। রাতের আহারের পর আমরা খোলা আকাশের নীচে গন্‌গনে আগুনের সামনে গোল হয়ে বসলে সেই নাটক শুরু হত। নাচে একদল পুরুষ ও একদল স্ত্রীলোক তাদের জাতীয় বেশভূষা পরে ও হাত ধরাধরি করে মুখোমুখি দাঁড়াত। তার পর তাদের বাজনার সঙ্গে তাল রেখে গান গাইতে গাইতে একবার সামনের দিকে ও একবার পিছনের দিকে দুলে দুলে পা ফেলত। এই নাচ ছাড়া আমাদের মনোরঞ্জনের উদ্দেশে এক রকম ভালো কাঠ পোড়াবার ব্যবস্থা ছিল। সেই কাঠ থেকে অজস্র আগুনের ফুলকি অনেকটা তুবড়ি বাজির মত বেরুতো।

ক্যাম্পের রসদ বিশেষ করে দুধ ডিম ও পাঁঠার মাংস সরবরাহ করার সম্বন্ধে আমার যথেষ্ট ভাবনা ছিল। কিন্তু দেখি দারোগা সামসুদ্দিনের তত্ত্বাবধানে সে সবেরও চমৎকার বন্দোবস্ত হয়ে আছে।

প্রথমতঃ এক কুঠরিতে ঢুকে দেখি সেখানে অন্ততঃ হাজার খানেক মুর্গীর ডিম মন্দিরের চূড়ার আকারে সাজানো। আর এক জায়গায় গিয়ে দেখি সেখানে অন্ততঃ গোটা পঁচিশ জলজ্যান্ত পাঁঠা জড়ো করা। তেমনি দুধের জন্য দেখি গোটা পঞ্চাশ গরু জঙ্গল থেকে ধরে আনা হয়েছে। গরুগুলো সেখানে চরতে ছাড়া ছিল। বাঘ ও অন্যান্য বন্য পশু শিকারের উপলক্ষ্যে হাঁকওয়ার জন্য যত সব লোকের দরকার তারাও দেখি জঙ্গলের মধ্যে বসে দিব্বি তাদের রান্না বান্নায় ব্যস্ত। তাদের সকলকে তাদের গ্রাম থেকে ধরে এনে জড়ো করে রাখা হয়েছিল। ভেবে দেখতে গেলে এ সব পুলিশের জুলুম ভিন্ন আর কিছু নয়। তবে এই নিয়ে সেকালে কোন বিক্ষোভ দেখানোর যো ছিল না।

দারোগা সামসুদ্দিনের কেরামতির আর এক দৃষ্টান্ত আমার চোখে পড়ে, যেদিন বেল্ সাহেব এক বাঘ মারেন সেদিন দেখি আমাদের ক্যাম্পে ঢোকার

মুখে যে এক লাল শালুর কাপড়ে সোনালি অক্ষরে আগে লেখা ছিল ওয়েলকাম টু হাতিনালা ক্যাম্প, তাতে লেখা হয়ে গেছে কনগ্র্যাচুলেশন স্যার।

আবার যেদিন নিউ ইয়ার্স ডে, সেদিন সকালে বিছানা থেকে উঠেই দেখি আমাদের প্রত্যেকের তাঁবুর ঠিক সামনে একটা করে পতাকা টাঙ্গানো যাতে বড বড় সোনালি অক্ষরে লেখা হ্যাপি নিউ ইয়ার স্যার।

অবশ্য আজকাল সামসুদ্দিনের মত সরেস লোক বড একটা দেখা যায় না। তবে ওই সব লোকের মধ্যে যে পরিমাণ দোষ ছিল সেই পরিমাণে গুণও ছিল।

সামসুদ্দিনেরই মত আর এক চতুর দারোগার সঙ্গে আবার ১৯৪০ কি ৪১ সালে দেখা হয়। তার নাম ছিল যদুনন্দন পাণ্ডে। সে তখন ফয়জাবাদ জেলার রৌনাহি থানার বড দারোগা। ওই সময় আমি একবার লখনউ থেকে ফয়জাবাদ আমার গাডি হাঁকিয়ে যাই। রাস্তাটা বেশ প্রশস্ত ও সোজা বলে আমি গাড়িখানা মনের আনন্দে বেশ বেগেই চালাচ্ছিলাম। যখন আমি ফয়জাবাদের কাছাকাছি এসে পৌঁচেছি তখন দেখি একজন তার দুজোড়া বলদ ওই রাস্তা দিয়ে আমার কিছু আগে ভাগে হাঁকিয়ে নিয়ে চলেছে। সেটা দেখামাত্র আমার গাডির হর্ণ আমি কয়েকবার বাজাই। যাতে লোকটা জন্তু-গুলোকে রাস্তার এক ধারে করে আমার যাবার পথ ছেড়ে দেয়। কিন্তু তার ফল উল্টো হয়। জন্তুগুলো সমস্ত পথটাই জুডে বসল। আমি তখন আমার গাড়ির ব্রেক সজোরে চাপি। তা সত্ত্বেও গাড়িখানা একটা বলদের সঙ্গে ধাক্কা খায় ও সেই ধাক্কায় তার পেছনের এক ঠ্যাং ভেঙ্গে যায়। আমি তখন মহা বিভ্রাটে পড়ি। ইতিমধ্যে কয়েকজন গ্রামবাসী ঘটনাস্থলে এসে জোটে ও আমার সঙ্গে তর্কবিতর্ক জুড়ে দেয়। গতিক ভাল নয় দেখে আমি আর সেখানে কাল বিলম্ব না করে সোজা থানায় গিয়ে উপস্থিত হই। সেখানে যদুনন্দন পাণ্ডেকে ঘটনার কথা বলি ও সে যেন ঘটনাস্থলে গিয়ে মামলা দফারফা করার ব্যবস্থা করে তাও বলি। না জানি কত টাকা আমায় গুণাগার দিতে হবে এই ভেবে আমার মন সমস্ত দিন খারাপ রইল।

পরে যখন আমি সন্ধ্যা ৬।৭ নাগাদ ফিরতি পথে ঘটনাস্থলের কাছে এসে পৌছাই তখন আমার গাড়ির হেড লাইটে দেখি বিস্তর লোক রাস্তার দুধারে সারা দিন দাঁড়িয়ে। সেটা দেখে ত আমার বুক ধড়্ ফড়্ করতে থাকে। কিন্তু আমি যখন তাদের মাঝে আমার গাড়িখানা থামাই তখন দেখি তারা হাত জোড় করে দাঁড়িয়ে। তাদের মধ্যেকার দুজনের হাতে আবার দুটো মালা। আমি যখন তাদের কাছে সকালের ঘটনার জন্য আমার দুঃখ প্রকাশ করি তখন

তারা আমার কথা চাপা দিয়ে বলে, সে কি হুজুর, দোষটা ত সম্পূর্ণ সেই লোকটার, যে বলদগুলোকে হাঁকিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল। যাক্ সে কথা, আমাদের মহা সৌভাগ্য এই তুচ্ছ ঘটনা সূত্রে আপনার মত মহান পুরুষের সঙ্গে আমাদের সাক্ষাৎ হল। এই বলে তারা ঝুপঝাপ করে তাদের হাতের মালা দুটো আমার গলায় পরিয়ে দেয়। অনেক ধ্বস্তাধ্বস্তির পর ক্ষতিপূরণ স্বরূপ গোটা কুড়ি টাকা আমি তাদের হাতে গুঁজে দিতে সক্ষম হই।

আজকালকার দিনে ত ওই রকম ঘটনা হলে আস্ত মাথায় আমার বাড়ি ফিরে আসা হত না। হ্যাঁ একটা কথা বলি। আমি যখন ওই গাঁয়ের মোড়লদের সঙ্গে কথাবার্তা বলছি তখন দেখি যদুনন্দন পাণ্ডে সকলের পেছনে চুপটি করে দাঁড়িয়ে। মুখে তার মুচকি হাসি। তা দেখে আমার বুঝতে বাকি রইল না যে তারই মধ্যস্থতার ফলে আমি এ যাত্রা বেঁচে গেছি।

অনেকের হয়ত জানা নেই—আমি ইতিপূর্বে যে নট্‌বাওর সাহেবের উল্লেখ করেছি, তাঁরই হাতে ১৯৩১ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে বিপ্লবী চন্দ্রশেখর আজাদের মৃত্যু ঘটে। আজাদের নামে তখন সকলে থরহরি কম্পমান ছিল। সে বলে রেখেছিল, তার জীবনের একমাত্র লক্ষ্য উচ্চপদস্থ সাহেব কর্মচারীদের একটি একটি করে প্রাণহরণ। এই ঘটনার কিছুদিন পূবে চাটগায় হত্যাকাণ্ড হয়। খুব সম্ভব তলে তলে সূর্য সেনের সঙ্গে চন্দ্রশেখরের যোগ ছিল।

নট্‌বাওর সাহেবকে উত্তরপ্রদেশ সরকারের তরফ থেকে স্পেশাল ডিউটিতে নিযুক্ত করা হয়, যাতে তিনি চন্দ্রশেখরকে বন্দী করার জন্য উঠে পড়ে লাগতে পারেন। পুলিশের দিক থেকে অনেক গুপ্তচরও তাঁর খোঁজে নিযুক্ত ছিল। তাদেরই মধ্যে থেকে একজন খবর দেয় যে, আজাদ এলাহাবাদে এসে কোথাও লুকিয়ে বাস করছে।

দৈবক্রমে তার পর একদিন সকালে ঠাকুর বিশ্বেশ্বর সিং এলাহাবাদের আলফ্রেড পার্কের মধ্যে দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিলেন। তিনি পথের ধারে এক নিমগাছ তলায় দুজন লোককে বসে চুপিচুপি আলোচনা করতে দেখেন। তাদের দেখে তাঁর মনে কিছু সন্দেহ জাগে। তাই তিনি খবরটা নট্‌বাওর সাহেবকে গিয়ে দেন। তখন তিনি নট্‌বাওর সাহেবেরই অধীনে কাজ করতেন। সাহেব তৎক্ষণাৎ বিশ্বেশ্বর সিংকে সঙ্গে করে তাঁর এক টু সীটার গাড়িতে বসে পার্কে এসে উপস্থিত হন। গাড়ি থেকে নামামাত্র তিনি পিস্তল হাতে আজাদ ও তার সঙ্গীকে ঘেরাও করেন। আজাদ তৎক্ষণাৎ সাহেবকে লক্ষ্য করে পিস্তল চালায়। গুলি সাহেবের বাঁ হাতের কনুই ছুঁয়ে বিশ্বেশ্বর সিং-এর চিবুকে গিয়ে লাগে। অন্যদিকে

সাহেবের গুলি আজাদের বাম জানুতে গিয়ে লাগে ও তাকে পঙ্গু করে দেয়। আজাদের সঙ্গী তখন ছুটে পালায় ও একজনের বাইসাইকেল কেড়ে তাতে করে অদৃশ্য হয়ে যায়।

নট্‌বাওর সাহেব ও বিশ্বেশ্বর সিং ছুটে ওঁদের গাড়ির আড়ালে গিয়ে দাঁড়ায়। তার পর থেকে প্রায় আধঘণ্টা ধরে আজাদের ও সাহেবের মধ্যে গুলি বিনিময় হয়।

সাহেব যেই তাঁর মাথা তুলে আজাদকে লক্ষ্য করে গুলি ছোড়ার চেষ্টা করেন, আজাদও সেই মুহূর্তে সাহেবকে লক্ষ্য করে তার গুলি ছোড়ে। সেই সঙ্গে সে বন্দেমাতরম্ বলে চিৎকার করে। তার চিৎকার শুনে আশেপাশের অনেকেই দাঁড়িয়ে পড়ে ও ব্যাপারটা যে কি তা বুঝে আজাদের সঙ্গে সমস্বরে বন্দেমাতরম্ বলে চিৎকার করে। ক্রমে বহু সংখ্যক লোক ঘটনাস্থলে এসে জোটে ও সেই চিৎকারে যোগ দেয়। তাতে এক অভূতপূর্ব দৃশ্যের সৃষ্টি হয়।

এইভাবে চন্দ্রশেখর ও সাহেবের গুলির আদানপ্রদানের ফলে সাহেবের গাড়ির বনেটে আজাদের কয়েকটা গুলি গিয়ে লাগে ও সেটাকে স্থানে স্থানে ফুটো করে দেয়। কিন্তু সাহেবের কপাল জোরে তিনি এ যাত্রায় বেঁচে যান। নট্‌বাওর সাহেবের এক গুলি চন্দ্রশেখরের মাথার খুলিতে গিয়ে লাগে ও তৎক্ষণাৎ সে ধরাশায়ী হয়। আবার এও শোনা গেছে যে চন্দ্রশেখর যখন দেখে তার কাছে আর একটিমাত্র গুলি রয়ে গেছে তখন সেটা দিয়ে সে আত্মহত্যা করে।

আজাদের বীরত্ব ও দেশভক্তির জন্য লোকে তাকে ধন্য ধন্য করতে থাকে। কয়েক দিন ধরে তারা দলে দলে ঘটনাস্থলে আসে ও উপরোক্ত নিমগাছের গুঁড়িতে চন্দ্রশেখরের উদ্দেশে সিঁদুর, আবীর ও কুমকুমের প্রলেপ লাগায়। তাই দেখে কর্তৃপক্ষ গাছটা কেটে ফেলার ব্যবস্থা করেন। তবু সেই স্থানটা তীর্থক্ষেত্র হয়ে আছে। আজও লোকে সেখানে আজাদের এক ধাতুনির্মিত প্রতিমূর্তির গলায় মালা দেয়।

আজাদের পিস্তল নট্‌বাওর সাহেব এই ঘটনার চিহ্ন স্বরূপ তাঁর দেশে নিয়ে যান। সেটা নাকি সম্প্রতি ভারত গভর্নমেণ্টের চেষ্টার ফলে ফেরত পাওয়া গেছে ও এলাহাবাদ মিউজিয়মে রাখার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

কোকেন বিক্রেতা করামত

এবার আমি ফর‍্যাক্কাবাদের এক বিখ্যাত কোকেন বিক্রেতার কথা বলি, যার নাম ছিল করামত। আমি অনেকের মুখে শুনেছিলাম সে নাকি লুকিয়ে লুকিয়ে কোকেন বেচে হাজার হাজার টাকা রোজগার করে। আমি তাই একদিন তার কাছ থেকে চুপি চুপি লোক মারফত কিছু কোকেন নমুনা হিসেবে কিনে আনাই। জিনিসটা যে খাঁটি সে সম্বন্ধে আমার যখন কোন সন্দেহ থাকে না তখন তার বাড়িতে একদিন হানা দেওয়া স্থির করি।

নির্দিষ্ট দিনে আমি ও স্থানীয় সিটি ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ শ্রীধর ছদ্মবেশে করামতের বাড়ি যাই। বাড়িখানা ছিল এক ঘুপ্‌চি গলির মধ্যে। তখন বেলা ১টা হবে। করামত তখন তার বাড়ির সামনে এক খাটিয়ার ওপর বসে তামাক খাচ্ছে। তার পরনে একটি স্যাণ্ডো গেঞ্জি ও একটি চেকের লুঙ্গি। আমাদের . খে সে উঠে দাঁড়ায় ও বলে, বাবুজি আপনারা কি চান? মিঃ শ্রীধর আমায় দেখিয়ে বলেন, ইনি কানপুরের এক ধনী-শেঠজি। ইনি অধিক পরিমাণে কোকেন সংগ্রহ করার ফিকিরে আছেন। আমরা দুজনে তোমার নামডাক শুনে তোমার কাছে এসেছি।

কথাটা শুনে করামত খুব খুশি। বলে—তা বাবুদের আমার কাছ থেকে যতই কোকেন কেনবার ইচ্ছে থাকুক না কেন আমি সেটা অনায়াসে জোগাড় করে দিতে পারবো। তার পর সে আমাদের জেরা ক'রে জানতে চায় আমরা কানপুরে কোথায় থাকি ও ফর‍্যাক্কাবাদে এসেই বা কোথায় উঠেছি ইত্যাদি। এইসব প্রশ্নের উত্তরের জন্য মিঃ শ্রীধর আগে থেকেই প্রস্তুত ছিলেন ও ফটাফট এক ঝুড়ি

মিথ্যা কথা বলে যান। তারপর তিনি তাঁর পকেট থেকে একখানা চিহ্নিত একশ টাকার নোট বার করে তাকে দেন ও বলেন, উপস্থিত আমরা খুব সামান্য কিছু সওদা করার উদ্দেশ্যে এটা নিয়ে এসেছি।

করামত নোটখানাকে হাতে নিয়ে প্রথমে সেটাকে বেশ উল্টে পাল্টে দেখে। তারপর সেটাকে সূর্যের দিকে তুলে ধরে বেশ খানিকক্ষণ ধরে পরীক্ষা করে। যখন সেই নোট সম্বন্ধে তার কোন সন্দেহ থাকে না তখন সে বলে—আচ্ছা এবার তাহলে আপনারা নিজেদের বাসায় ফিরে যান। আমি সময়মত মাল আপনাদের কাছে পৌঁছিয়ে দেবো। আমরা তার এই উত্তরের জন্য মোটেই প্রস্তুত ছিলাম না। মিঃ শ্রীধর তাকে বলেন—"তা কি হয়? আমরা এইখানেই বসে থাকবো, যতক্ষণ না তুমি মালটা এনে দিচ্ছ—" তার উত্তরে করামত নোটখানা আমাদের ফেরত দিতে উদ্যত হয় ও পরিষ্কার জবাব দেয়, সে তাতে রাজি নয়। তার কারণ, তাকে অন্য এক জায়গায় গিয়ে তার এক পরিচিত আড়তদারের কাছ থেকে মালটা আনতে হবে। সে নিজে কেনাবেচায় সামান্য কমিশনমাত্র পাবে।

আমরা তখন আর বেশী জেদাজেদি না করে করামতের কথামত এক নির্দিষ্ট স্থানে গিয়ে বসতে রাজি হই। সেটা ছিল করামতের বাড়ি থেকে ফার্লং দুয়েক দূরে এক নিমগাছতলা।

তার পর আমাদের যা ভোগান্তির পালা শুরু হয় তার কহতব্য নয়। ঘণ্টার পর ঘণ্টা ওই গাছতলায় চুপটি করে বসে কাটানো সত্ত্বেও করামত বা তার কোন লোকের চিহ্নমাত্র আমরা দেখতে পাই না। আমরা তখন তিতিবিরক্ত হয়ে উঠে গিয়ে করামতের সঙ্গে আবার দেখা করি। সে দেখি দিব্যি আরামে তার বাড়ির সামনে বসে কয়েকজনের সঙ্গে আড্ডা মারছে। আমাদের দেখামাত্র সে আমাদের দিকে এগিয়ে আসে ও মিঃ শ্রীধরের কানে কানে বলে, বাবু আপনারা নিশ্চিন্ত থাকুন। আরো কিছুক্ষণের মধ্যে আমি মাল আপনাদের কাছে নিশ্চয় পৌঁছিয়ে দেবো। আসল কথাটা কিছুক্ষণ হল কোতোয়াল সাহেব এদিক দিয়ে বেরিয়ে গেলেন। আমি ওঁর পেছনে লোক লাগিয়ে রেখেছি। উনি কোতোয়ালি ফিরে যাওয়া মাত্র আপনাদের কাজ হাসিল হয়ে যাবে।

খবরটা শুনে আমাদের হাসি পেল। সেই সঙ্গে আমরা কিছুটা স্বস্তিও বোধ করলাম। এই দেখে যে অন্ততঃ আমাদের সম্বন্ধে করামতের মনে কোন সন্দেহ জাগে নি। কোতোয়ালকে আমাদের বলা ছিল, সে যেন কয়েকজন সেপাই ছদ্মবেশে করামতের বাড়ির আশে পাশে ছেড়ে রাখে। দরকার পড়লে

যাতে তারা আমাদের সাহায্যের জন্য আসতে পারে। কিন্তু কোতোয়াল সাহেব যে আমাদের না দেখতে পেয়ে হাল ছেড়ে দিয়েছেন ও নিজের অনুচরবর্গের সহিত কোতোয়ালি ফিরে গেছেন সেটা আমাদের পক্ষে সুখবর ছিল না। যাই হোক আমরা দুজনে আবার গুটি গুটি সেই নিমগাছ তলায় ফিরে যাই ও সেখানে বসে ভাবি এখন মানে মানে বাড়ি ফিরতে পারলে হয়।

এইভাবে আরো কিছু সময় কেটে যায় ও দেখতে দেখতে সূর্যদেব তাঁর বাসায় ফিরে যান। তার কিছুক্ষণ পরেই চারিধারে অন্ধকার ছেয়ে যায় ও জোর বৃষ্টি নামে। এ হেন অবস্থায় আমাদের আর সেখানে বসে থাকা সম্ভব্ ছিল না। আমরা আবার কপাল ঠুকে করামতের বাড়ি গিয়ে হাজির হই। সে তখন তার বাসার সামনের এক দালানে তার দু-একজন সঙ্গী-সাথীর সঙ্গে অন্ধকারে বসে। আমাদের জন্য সে এক খাটিয়া পেতে দেয় ও আবার তার জেরা শুরু করে। ওই অসহায় অবস্থায় আমার বুক তখন বেশ ঢিপ্ ঢিপ্ করছে। আমি মনে মনে ভাবছি, সে ইচ্ছে করলেই আমাদের দুজনকে খুন করতে পারে। বৃষ্টির প্রকোপে পাড়ার লোকেরা তখন যে যার বাড়িতে ঢুকে গেছে ও চারদিক জনশূন্য হয়ে আছে।

আমি যখন মনে মনে ভাবছি না-জানি আরো কত দুর্ভোগ আমাদের কপালে লেখা আছে, তখন এক ছোকরা ছাতা মাথায় আমাদের দালানে এসে ওঠে ও করামতকে কানে কানে কিছু বলে। সেই সঙ্গে করামত উঠে পড়ে। তার ইশারায় মিঃ শ্রীধর ও আমি তার ও সেই ছোকরার পিছু পিছু বেরিয়ে পড়ি। বৃষ্টি তখন অনেকটা থেমে গেছে তবু চারিদিকে ঘোর অন্ধকার। জলের অবস্থা তখন এমন যে তাতে আমাদের পায়ের গোছা অব্দি ডুবে যাচ্ছে। আমার সঙ্গে সেই ছত্রধারী ছোকরা ও মিঃ শ্রীধরের সঙ্গে করামত। কিছুদূর গলি দিয়ে ছপ্ ছপ্ করতে করতে যাবার পর আমার সঙ্গী আমার হাতে এক কাগজের মোড়ক চুপি চুপি ধরিয়ে দেয়। আমি সেটা আমার বুক পকেটে রেখে আমার সঙ্গীর দুই হাত চেপে ধরি। সেই সঙ্গে মিঃ শ্রীধরকে উচ্চৈঃস্বরে বলি, তুমি তোমার আসামী গ্রেপ্তার কর। আমার সঙ্গী আমার কার্যকলাপ দেখে প্রথমটা হকচকিয়ে যায়। তারপর কিন্তু প্রাণপণে আমার পকেট থেকে তার দেওয়া সেই মোড়কটা ছিনিয়ে নেবার চেষ্টা করে। আমি তখন সেদিকে খেয়াল না করে সে যাতে আমার কবল থেকে পালাতে না পারে তাই নিয়ে ব্যস্ত। ওই ঝটাপটিতে আমরা দুজন ধরাশায়ী হই ও কিছুক্ষণের জন্য মাটিতে গড়াগড়ি যাই। তার পর যখন আমি তাকে নিরস্ত করি তখন সে ক্ষান্ত হয়।

অন্যদিকে মিঃ শ্রীধর করামতকে গুলি করার ভয় দেখাতে সে চুপ করে দাঁড়িয়ে পড়ে।

আমার এই লোমহর্ষক অভিজ্ঞতার পর আমি যখন আমার পকেটে হাত দিই তখন দেখি সর্বনাশ। আমার কাছে কোকেনের মোড়কটা মাত্র আছে। তাতে যেটুকু কোকেন ছিল সেটুকু জলে পড়ে ধুয়ে মুছে সাফ্ হয়ে গেছে। যাইহোক সেজন্য আর অনুতাপ না করে আমরা তখন করামতের বাড়ি সার্চ করার দিকে মনোযোগ দিই। আমাদের হাঁক ডাকে পাড়া-পড়শীদের মধ্যে থেকে অনেকে এসে পড়ে ও তার কিছুক্ষণ বাদেই স্বয়ং কোতোয়াল সাহেব তাঁর দলবল নিয়ে হাজির। করামতের বাড়ি থেকে কিন্তু বিন্দুমাত্র কোকেন পাওয়া যায় না।

পরে ভেবে চিন্তে দেখা গেল যে যদিও মালের অভাবে আমাদের মামলা অনেকটা ভেস্তে গেছে তবু সেটা একেবারে বাতিল করা যায় না। তাই অবশেষে আমি দুর্গা নাম করে করামত ও তার সাথীকে চালান করি। আমাদের কপাল জোরে ওরা দুজনেই আদালত থেকে এক বছর করে সশ্রম কারাদণ্ডের শাস্তি পায়। উপরন্তু করামতের এক হাজার টাকা জরিমানা হয়।

এই মামলায় মিঃ শ্রীধর ও আমার জবানবন্দি ছাড়া সেই কাগজের মোড়ক যা আমার কাছে রয়ে গেছিল ও কোকেন যা আমরা নমুনা হিসেবে করামতের থেকে আনাই তা যথেষ্ট কাজ দেয়।

আসল কথা সেকালে আদালতের দৃষ্টিকোণই অন্যরূপ ছিল। তাঁরা সাক্ষ্যের চেয়ে সত্যের ওপর বেশী জোর দিতেন।

আমাদের দেশে অনেকের বিশ্বাস দেবস্থানে একাদশীর দিন জুয়া খেললে লোকেদের কপাল খুলে যায়। তাই আমি যখন ফরাক্কাবাদে কাজ করি তখন ওই পর্বের দু একদিন আগে সেখানকার কোতোয়াল মহম্মদ আয়ুব আমার কাছে এসে বলেন—হুজুর আমি স্থির করেছি আগামী একাদশীর দিন কিছু ধর-পাকড় করব। সে উদ্দেশ্যে আমি কিছু ব্ল্যাঙ্ক সার্চ ওয়ারেন্ট এনেছি। আপনি যদি সেগুলো সই করে দেন ত বড় ভাল হয়।

আইন অনুসারে যেসব বাড়ি সার্চ করার কথা তাদের বিবরণ প্রত্যেক ওয়ারেণ্টে লিখে রাখা চাই। কিন্তু আমি দেখি যে এই নিয়মের পূর্তি কোনটাতেই করা হয়নি। তাই আমি যখন এ কথাটা তুলি তখন মহম্মদ আয়ুব আমায় বোঝান—এই জুয়ার ব্যবসা যারাই করে তারা নিজেদের আড্ডা সমানে বদলাতে থাকে। আড্ডাগুলো জানার সঙ্গে সঙ্গে তিনি ওয়ারেণ্টগুলো সেই মত শুধরে নেবেন। আমিও তখন সেগুলো সই করতে রাজি হই।

নির্দিষ্ট দিনে মহম্মদ আয়ুব তাঁর ইচ্ছামত ধর-পাকড় করেন। কিছু আসামী কোর্ট থেকে শাস্তিও পায়। আসামীদের মধ্যে কিন্তু একজন তার দোষ অস্বীকার করে। শুধু তাই নয়। সে আমাকে তার স্বপক্ষে সা দেবার জন্য তলব করায়। আমি ত তাতে অবাক্।

তারপর আমি যখন আদালতে গিয়ে হাজির হই তখন আসামীর উকিল একখানা ওয়ারেণ্ট আমার সামনে তুলে ধরে প্রশ্ন করেন, আমি যখন সেটাতে সই করি তখন কি তাতে আসামীর ঘর বাড়ির বিবরণ লেখা ছিল ?

প্রশ্নটা শুনে আমি বড় ফাঁপরে পড়ি। যদি হাঁ বলি ত সেটা ডাহা মিথ্যা হয় আর যদি বলি না তাহলে আসামীর রেহাই নিশ্চিত। উভয় ক্ষেত্রেই অবস্থা অনুকূল হবে না। অন্যদিকে তখনও আমার কানে সেই শপথটা বাজছে, যা আমি কিছুক্ষণ আগেই ঈশ্বর সাক্ষী করে এই বলে নিয়েছিলাম যে, আমি শুধু

সত্য বলবো, সত্য ছাড়া মিথ্যা বলবো না। ঈশ্বর আমার সহায়। তাই আর ইতস্তত: না করে বললাম, "না"।

আমার ওই বলাতে দেখলাম কোর্টে একটা সাড়া পড়ে গেল। সরকারের তরফ থেকে যিনি উকিল তাঁর বড় বড চোখ দুটো যেন তাদের কোটর থেকে ঠিকরে বেরিয়ে পড়ল আর কি। তাতে বেশ বোঝা গেল তাঁর মতে আমার উত্তরটা মহামূর্খামীর পরিচয়। ইচ্ছে করলেই আমি তখনও আমার ভুলটা শুধরে নিতে পারি। আদালতের তরফ থেকেও আমি ওই রকম এক ইঙ্গিত পাই। আমি কিন্তু তখন দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। তাই আর কিছু না বলে কোর্ট থেকে গুটি গুটি বেরিয়ে পড়ি।

মামলার ফলাফল শেষে যা হবার তা হলই! কিন্তু এই সাক্ষ্যের ফলে আমার আত্মসম্মান নিজের চোখে বেড়ে গেল বই কমলো না। উপরন্তু সাধারণ লোকদের মধ্যেও আমার সত্যনিষ্ঠার খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ল।

উপরোক্ত মামলায় আমি বেকুব বনে গেছিলাম তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু আমার এই ভুলটার পূরণ আমি অল্পদিনের মধ্যেই ফরাক্কাবাদে থাকতে করি। ঘটনা এ রকম।

এক বিশ্বস্ত সূত্রে একদিন আমি খবর পাই যে সেখানকার এক বিশেষ বাড়ির ভেতর প্রত্যহ মস্ত এক জুয়ার আড্ডা বসে। তাতে অনেক জুয়াড়ি এসে যোগ দেয়। খবর পাবার পর আমি একদিন আবদুল ওহীদ নামের এক নবাগত দারোগাকে সঙ্গে নিয়ে রাতের অন্ধকারে চুপি চুপি ওই বাড়িখানার চারদিকে ঘুরে ফিরে দেখি। পরদিন বেলা ১২টা নাগাদ আমি আবদুল ওহীদ ও গোটা বারো সেপাই সহ চারখানা ঢাকা একায় বসে আমার বাসা বাড়ি থেকে রওনা হই। আমার পরনে তখন সাধারণ ধুতি কুর্তা। অনেকের বিশ্বাস ছদ্মবেশ করতে হলেই মুখময় কালি ঝুলি মাখতে হয় ও যাত্রাদলের দাড়ি গোঁফ আঁটতে হয়। এই ধারণাটা কিন্তু ভুল।

আমরা যখন আমাদের গন্তব্য স্থানের কাছে গিয়ে পৌঁছাই তখন আমার ও আবদুল ওহীদের কাজ হল ওই বাড়ির খিড়কির দরজায় টোকা মারা। সেপাই কজনের কাজ হল চুপিচুপি ওই বাড়ির অন্ধধারে ঘিরে দাঁড়ানো। আমাদের জানা ছিল উপরোক্ত খিড়কির দরজায় টোকা মারা মাত্র সেটা খুলে যাবে। অনেকটা সেই আলিবাবার গল্পে লেখা গুপ্তদ্বারের মত যেটা তিনবার চিচিঙ ফাঁক বলা মাত্র আপনা হতে খুলে যেত।

উপস্থিত ক্ষেত্রে হলও তাই। আমাদের দ্বারা দরজায় টোকা মারা মাত্র একটি দশ-এগারো বছরের মেয়ে সেটা সামান্য ফাঁক করে প্রথমে দেখে নিল কে এসেছে। যখন তার বুদ্ধিতে কোন সন্দেহের কারণ দেখতে পেল না তখন দরজা পুরোপুরি খুলে দিল। আমি ও আবদুল ওহীদ সেই সঙ্গে বাড়ির ভেতর হুড়মুড় করে ঢুকে পড়ি। ঢুকেই দেখি আমরা যেখানে দাঁড়িয়ে সেটা এক উঠানের মত। আমাদের কয়েক হাত দূরে একটি মই দাঁড় করানো আছে। সেই মই বেয়ে এক খোলা ছাতে ওঠা যায়। আমরা দুজনে তারই সাহায্যে চটপট ছাদে উঠে যাই ও দেখি কতকগুলি লোক সেখানে গোল হয়ে বসে খেলাতে মত্ত। প্রথমটা তারা আমাদের দিকে ভ্রূক্ষেপ মাত্র করল না। মনে করল আমরাও নিশ্চয় তাদেরই মত জুয়ো খেলতে এসেছি। আমি যখন আমার পিস্তল হাতে তাদের জোর গলায় বলি আমি কে ও কেন এসেছি তখন তারা প্রথমটা হকচকিয়ে যায়। তারপর তাদের যখন হুঁস হয় তখন তারা প্রাণের দায়ে একজোট হয়ে সামনের গলির ওপর ঝপাঝপ লাফিয়ে পড়ে। আশ্চর্যের বিষয় ওইভাবে লাফ দেওয়াতে তাদের কারুর ঠ্যাং ভাঙ্গে না। তাদের মধ্যে অনেকেই কিন্তু সেই সেপাইদের হাতে ধরা পড়ে যারা সেখানে আগে থেকেই ওৎ পেতে বসে ছিল। তাদের পা মাটিতে ঠেকার সঙ্গে সঙ্গে তারা যে অমন করে ধরা পড়বে সেটা তারা ভাবেও নি।

আমি ও ওহীদ তখন এক পাশের বাড়িতে বসে এই মামলা সংক্রান্ত লেখা পড়ার কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ি। যে সব টাকাকড়ি ও মালমসলা আমাদের হাতে আসে তার একটা ফর্দ তৈরী করতেই আমাদের অনেক সময় লেগে গেলো।

ইতিমধ্যে ঘটনার কথা শহরের চারিদিকে হু হু করে ছড়িয়ে পড়ে ও দলে দলে লোকে ঘটনাস্থলে এসে হাজির হয়। আমার সম্বন্ধে তাদের কৌতূহল দূর করার উদ্দেশ্যে তারা বার বার আমায় বলে পাঠায় আমি যেন একবারটি আমার ছদ্মবেশে তাদের দেখা দিই। আমার যথাসাধ্য চেষ্টা যাতে তারা আমার বাইরে বেরোবার আগে সরে পড়ে নিষ্ফল হয়। আমি তখন অনন্যোপায় হয়ে এক একা ডেকে পাঠাই ও তাতে করে আমার সামনেকার গলি দিয়ে রওনা হয়ে পড়ি। তার পর আমি যখন আমার ভাঙা একায় চড়ে মন্থর গতিতে ভীড় ঠেলে চলেছি তখন ছেলে বুড়ো পুরুষ ও স্ত্রী মিলে যে কী প্রগাঢ় শ্রদ্ধার চোখে আমায় দেখে ও বাহবা দেয় তা বর্ণনাতীত। আমার তখন মনে মনে বেশ কুণ্ঠা বোধ হয়—কারণ সেটা বস্তুতঃ আমার ন্যায্য পাওনার চেয়ে ছিল ঢের বেশী।

ঝোঁকের মাথায়

আমি এককালে যখন সীতাপুরে তখন একদিন এক খুনের মামলা তদন্ত করতে ট্রেনে চেপে বিসওয়া যাই ও সেখানে ভোর ৫টা নাগাদ পৌঁছাই। সকাল ১০টা নাগাদ যখন আমার কাজ সারা হয়ে যায় তখন খোঁজ নিয়ে জানি যে সন্ধ্যা ৬টার আগে সীতাপুরে ফেরবার কোন গাড়ি নেই। ইচ্ছা করলেই আমি বিসওয়ার পুলিশ দারোগার অতিথি হয়ে দিনটা অনায়াসে কাটাতে পারতাম। কিন্তু তাতে আমার কেমন বাধ বাধ ঠেকল। আমি তাই সেখান থেকে সাইকেলে চেপে ফেরা স্থির করি।

বিসওয়া থেকে সীতাপুর ২৪ মাইল। আমি যেদিনের কথা বলছি সেটা ছিল ২৯শে মে। তখন দিনের উত্তাপ ১১৫।১১৬ ডিগ্রি হবার কথা আর ছিলও তাই। আমার সেখান থেকে বেরুতে ১১টা বেজে গেছিল। সূর্যদেব তখন আকাশের অনেকটা উপরে উঠে গেছেন। রোদের তাপও প্রায় অসহ্য হয়ে উঠেছিল। আমার পরনে এক খাকি কোট, এক খাকি প্যান্ট ও মাথায় শোলার টুপি। চোখে কালো কাঁচের চশমা। রোদের প্রকোপ থেকে বাঁচবার উদ্দেশে আমি আমার বাঁ হাতটা প্যান্টের পাশ পকেটে পুরে রাখি। ডান হাতটা ভাল করে এক রুমাল দিয়ে জড়াই। তারপর মা দুর্গা বলে সাইকেল নিয়ে বেরিয়ে পড়ি।

কিছু দূর যেতে না যেতেই আমার গা থেকে যেন আগুন ছুটতে থাকে। ঘামে আমার জামা কাপড় ভিজে জবজবে হয়ে যায়। তাছাড়া আমার চশমার কাঁচ দুটো বারবার মোছার দরকার হয়ে পড়ে। আমার আশপাশের মাঠ ময়দান তখন উগ্র রূপ ধারণ করেছে। আমার সামনের পাকা রাস্তা এক

ঝকঝকে ক্ষীণ রেখার মত দেখাচ্ছে। তার ওপর বেশীক্ষণ ধরে তাকানো যায় না। আমি তখন যতদূর সম্ভব চোখ কান বুজে চলেছি। প্রাণে শুধু একটি আশা। আমি যখন বাড়ি পৌঁছবো তখন সেখানে এক টব ঠাণ্ডা জলে বসে আমার শরীরের জ্বালা মেটাবো।

এমনি ভাবে আমি যখন প্রায় ৬ মাইল পথ অতিক্রম করেছি তখন রাস্তার পার্শ্ববর্তী এক বিরাট আম গাছের দিকে আমার দৃষ্টি যায়। মনে হয় যেন সে তার শীতল ছায়ায় বসে একটু বিশ্রাম করতে আমায় হাতছানি দিয়ে ডাকছে। আমি তখন আমার সাইকেল থেকে নেমে সেই গাছের গুড়ির ওপর ঠেসান দিয়ে বসে আমার ক্লান্তি দূর করবার চেষ্টা করি। ক্ষুধায় আমার পেট চোঁ চোঁ করছে। এক বোতল লেমনেড ছাডা আমার পেটে গতরাত্রি থেকে তখন পযন্ত কিছুই পড়ে নি। এ হেন অবস্থায় আমি কয়েকটা কাঁচা আম আমার মাথার ওপর ঝুলতে দেখি। সেগুলো দেখে আমার বড লোভ হয়। আমি লাফ দিয়ে তার মধ্যে থেকে একটা পাড়ি। কিন্তু তাতে এক কামড় দিতেই দেখি সেই ভীষণ টক্। তাই রাগের মাথায় সেটাকে ছুঁড়ে ফেলি এবং আবার রাস্তায় নেমে পডি। মনে মনে ঠিক করি আরও মাইল ছয়েক গিয়ে একটু বিশ্রাম করবো।

পথে তখন লোক চলাচল নেই বললেই হয়। যত পশুপক্ষী তারাও যেন অদৃশ্য হয়ে গেছে। কিছুদূর যাবার পর দেখি এক সার গরুর গাড়ি আমার দিকে মন্থর গতিতে এগিয়ে আসছে। তাদের চালকেরা গাড়ির ওপর পা ছড়িয়ে দিব্বি ঘুম দিচ্ছে। ওই যে প্রচণ্ড রোদ সেদিকে তাদের বিন্দুমাত্র ভ্রূক্ষেপ নেই। মনে মনে আমি তখন ভাবি ভগবান মানুষ কত রকমেই না গড়েছেন। আমার নিকট যে অবস্থা প্রায় অসহ্য ঠেকছে সেটা ওই চালকদের কাছে কেমন গা-সওয়া হয়ে গেছে।

এই সব কত কি আবোল তাবোল ভাবতে ভাবতে আরও মাইল ছয়েক যাবার পর রাস্তার ধারে আমি এক পাকা কুয়ো দেখতে পাই। তাতে এক পারশিয়ন্ হুইল খাটানো ও তার থেকে এক মোটা স্ফটিক স্বচ্ছ জলের ধারা নীচে গড়িয়ে পড়ছে। আমি তখন আর থাকতে না পেরে সেই শীতল জলের ধারায় যতটা সম্ভব নিজেকে সিক্ত করি ও প্রাণ ভরে আমার তৃষ্ণা মেটাই। তারপর আবার বেরিয়ে পড়ি ও মনে মনে [ঠিক] করি আরও ছয় মাইল পথ যাবার পর খয়রাবাদ পুলিশ চৌকিতে গিয়ে উঠবো। ওই ছয় মাইল পথ মনে হচ্ছিল যেন ফুরোবে না।

কোন গতিকে আমি যখন খয়রাবাদ গিয়ে পৌঁছাই তখন সোজা সেখানকার পুলিশ চৌকির অফিস ঘরে ঢুকে এক ভাঙ্গা চেয়ারের ওপর ঝপাৎ করে বসে পড়ি। আমার সমস্ত শরীর তখন যেন অবসন্ন প্রায়। মুখ থেকে কথা বেরুচ্ছে না।

আমি ভেবেছিলাম আমায় দেখামাত্র চৌকির সেপাইরা আমার কাছে ছুটে আসবে। কিন্তু তা না করে তারা দেখি আমার চোখের আড়ালে দাঁড়িয়ে যে যার উর্দি পরতে ব্যস্ত। সেটা দেখে আমার হাসি পেল। কিন্তু আমার অবস্থা তখন এতই কাহিল যে আমার মনের ভাব ব্যক্ত করা সম্ভব ছিল না। কয়েক মিনিট যেতে না যেতেই চৌকির হেড কনস্টেব্‌ল আমার সামনে এসে দাঁড়ায়। আমায় দেখা মাত্র তার বুঝতে বাকি রইল না আমি অনেক দূর থেকে তেতে পুড়ে আসছি। সে তাড়াতাড়ি একখানা বড় দেখে বাঁধান রেজিষ্টার হাতে নিয়ে আমায় সজোরে বাতাস করতে থাকে। আমি তখন স্থিরভাবে তার দিকে আমার কৃতজ্ঞতাভরা চোখে চাইছি। সেও আমার দিকে তার স্নেহভরা চোখে চাইছে। আমাদের পরস্পরের ওই দৃষ্টি বিনিময় থেকে স্পষ্টই ধারণা হোল যে, উর্দির ব্যবধানকে অতিক্রম করতে পারলে প্রত্যেক মানুষই বুঝি এক।

মিনিট কয়েক বাদে যখন আমি একটু ধাতস্থ বোধ করি তখন ক্ষীণকণ্ঠে বলি 'জল'। কথাটা যে আমারই কণ্ঠ থেকে বেরুচ্ছে তা যেন আমি নিজেই বুঝতে পারছিলাম না। সে তখন মিনতি করে আমায় বলে সায়েব আর একটু সময় যেতে দিন। তা না হলে যে সর্দিগর্মি লেগে যাবে। তার কথাটা খুবই খাঁটি ছিল, তাই আমি আরও কিছুক্ষণ চুপ করে বসে থাকি। তার পর সে যখন বাজার থেকে আমার জন্য কিছু বরফ আনিয়ে সেটা এক ঘটি জলে ছেড়ে দেয় তখন সেই জলটা আমি প্রাণের আনন্দে পান করি। বেলা তখন দুটো। তাই আমি আবার বেরিয়ে পড়ি। সেখান থেকে আমার বাড়ি আরও ছয় মাইল ও সেখানে পৌঁছতে পৌঁছতে আরও ঘণ্টা খানেক লেগে যায়।

আমার অবস্থা তখন অনেকটা সেই ম্যারাথন রাণারের মত, যে তার গন্তব্য স্থানের কাছে এসে পড়েছে ও যার একমাত্র চিন্তা কি করে সেখানে গিয়ে সে পৌঁছাবে। তার চতুর্দিকের যেসব দর্শকেরা হৈ হল্লা করছে সেদিকে তার কিছুমাত্র লক্ষ্য নেই। সে মরিয়া হয়ে ছুটে চলেছে, যাতে সে তার প্রতিদ্বন্দ্বীদের হার মানাতে পারে।

আমার বাড়ির ফটকে ঢুকেই আমি সাইকেলের ঘণ্টি বাজাতে শুরু করেছি,

যাতে আমার চাকর চাপরাশিদের মধ্যে থেকে কেউ এসে সেটাকে ধরে। কিন্তু তাদের কোন সাড়াশব্দ পাই না। অগত্যা আমি সাইকেলটিকে আমার বাড়ির দরজার কাছে ঠেলে ফেলে দিই ও কোনগতিকে টলতে টলতে আমার শোবার ঘরে গিয়ে ঢুকি। তারপর জুতো জামা সুদ্ধ আমার খাটের ওপর শুয়ে পড়ি। সেই সঙ্গে আমার পাখা কুলিকে বলি—খিঁচো। সেও প্রাণপণ শক্তিতে আমার মাথার ওপরকার সেকালের ঝালর দেওয়া এক পাখা টানতে থাকে। তার বাতাস যখন আমার গায়ে লাগে তখন সেটা যে কি মধুর ও আরামদায়ক মনে হয় তা বলা যায় না।

আমার তখন আর নড়বার চড়বার শক্তি নেই। তাই আমি একই ভাবে প্রায় আধ ঘণ্টাটাক কাটিয়ে দিই। তার পর আমি যখন একটু সুস্থ বোধ করি তখন আমার স্নানের ঘরে ঢুকে ভর্তি এক টব জলে গলা পর্যন্ত ডুবিয়ে অনেকক্ষণ ধরে বসে থাকি। আঃ তাতে আমি যেন স্বর্গ সুখ অনুভব করি।

স্নানের পর আমি আমার খাবার টেবিলে বসে কিছু খাই তারপর আর একবার আমার বিছানায় শুয়ে পড়ি। পরে যখন আমার ঘুম ভাঙ্গে তখন দেখি রাত প্রায় ৯টা। তাতে একটু আশ্চয বোধ করি। কিন্তু ভেবে দেখতে গেলে তাতে আশ্চর্য হবার কোন কারণই ছিল না।

আজ আমি বেশ বুঝি আমার পক্ষে ঝোঁকের মাথায় মে মাসের প্রচণ্ড রোদে ২৪ মাইল পথ সাইকেলে চেপে অতিক্রম করতে যাওয়া নেহাৎই বোকামি।

আর একদিনের কথা। আমি তখন পিলিভিত জেলা বিসলপুর থেকে পিলিভিতে ঘোড়ায় চড়ে ফিরছি। সময়টা সেই আগেকারই মত—প্রচণ্ড রোদ মাথায় করে ঠিক দুপুর। মজা এই, এবারও সেই ২৪ মাইল পথ আমার যাবার কথা। আমার পথের যখন আমি প্রায় অর্ধেক পার হয়ে এসেছি তখন দেখি যে আমার ঘোড়ার সমস্ত শরীর ঘামে জব্‌জবে হয়ে গেছে। আমারও অবস্থা তদ্রূপ। ঠিক সেই সময় রাস্তার লাগোয়া এক আমবাগান আমার চোখে পড়ে ও তার শীতল ছায়া আমার বড় লোভনীয় মনে হয়। আমি ঘোড়ার থেকে নেমে তার লাগাম মুঠোর মধ্যে ধরে সেই আমবাগানের সংলগ্ন এক খাদের দেয়ালে হেলান দিয়ে কিছু বিশ্রামের চেষ্টা করি। আমার পরনে এক খাকি কোট এক খাকি ব্রিচেস্ ও বাদামী চামড়ার হাঁটু পর্যন্ত তোলা এক জোড়া ঝকঝকে রাইডিং বুট। মাথায় এক বিরাট শোলার টুপি। আমার অনুমান

রোদের তাপে আমার মুখখানাও তখন লাল টকটকে দেখাচ্ছিল। মোটকথা আমার বেশভূষা ও অবস্থা দেখে যে কোন সাধারণ গ্রামবাসীর অবাক্ লাগবার কথা।

ওই বাগানে তখন ছুটি ছোট ছেলে ভিন্ন আর কেউ ছিল না। তারা দূর থেকে আমার কার্যকলাপ নিশ্চয় লক্ষ্য করছিল। আমার সম্বন্ধে তাদের কৌতূহল মেটাতে তারা গুটি গুটি অগ্রসর হয়ে আমার কাছ থেকে হাত দশেক দূরে এসে থমকে দাঁড়ায়। আমি তখন দেখি একটির বয়স ৫।৬ ও অন্যটির ৬।৭ বছর হবে। ছুটিই সম্পূর্ণ নগ্নাবস্থায়। বড়টির হাতে এক মাটির কলকে যা সে খুব সম্ভব ওই আমবাগানের মধ্যে কুড়িয়ে পেয়ে থাকবে। ছেলে ছুটি আমার দিকে কিছুক্ষণ ধরে লক্ষ্য করবার পর স্থির করে আমি এক সাধারণ মানুষ ভিন্ন আর কিছু নয়। আমার কাছ থেকে তাদের কোন ভয়ের কারণ নেই। তখন আমার অবস্থা দেখে তাদের মনে আমার প্রাত করুণার উদ্রেক হয়। ফলে বড়টি আমার দিকে আরো ছু পা এগিয়ে আসে ও তার হাতের কল্কে আমার দিকে তুলে ধরে তার কোকিলসুলভ কণ্ঠে বলে "পিয়বো ?" (অর্থাৎ একটান দেবে কি ?) কথাটা শুনে ছেলেটির প্রতি আমার মন তখন কৃতজ্ঞতায় ভরে ওঠে। তাকে না বলতে আমার কুণ্ঠা বোধ হয়।

উপরোক্ত ঘটনার আজ পঞ্চাশ বছর হতে চলল, তবু তার মধুর স্মৃতিটুকু আমার মনে আজও তেমনই উজ্জ্বল হয়ে আছে। অনেককাল আগে আমি এক ইংরাজী কবিতায় পড়েছিলাম—এ থিং অব বিউটি ইজ এ জয় ফর এভার কথাটা এক্ষেত্রে কিছুটা খাটে না কি ?

বাক্সসে ঘোড়া

মে মাসের প্রচণ্ড রোদ মাথায় করে বিসওয়া থেকে সীতাপুর সাইকেলে যাওয়াটা আমার কাছে যতটা স্মরণীয় ঠিক ততটাই স্মরণীয় আর একটা যাত্রা। আমি সীতাপুরে থাকতেই ঘোড়ার পিঠে কমলাপুর থেকে প্রায় ১৪ মাইল দূরে আর এক জায়গায় যাই। সেখানে আমার যাবার উদ্দেশ্য ছিল একটা খুনের মামলার তদন্ত করা।

কমলাপুর পৌঁছে আমি রাজা সুরজ বক্স সিংএর কাছ থেকে তাঁর এক ঘোড়া চেয়ে নিই। ঘোড়া বাছাই করতে তিনি আমায় তাঁর অশ্বশালায় নিয়ে যান। সেখানে তাঁর প্রায় দু ডজন ঘোড়া বাঁধা ছিল। আমার কাছে সমস্যা হল আমি কোনটি পছন্দ করি। রাজার মতে অবলক্ ও তব , এই দুটি ঘোড়া সব চেয়ে সেরা। তিনি আমায় ওই দুটির মধ্যে একটিকে পছন্দ করতে বললেন। আমি অবলক্‌কে পছন্দ করি। অবলকের ভাব গতিক দেখে কিন্তু মনে হল সে আমায় পছন্দ করছে না। তাকে যখন আমার কাছে তার সাজ-সজ্জাসহ আনা হয়, সে আমার দিকে বেশ সন্দেহের চোখে দেখছে মনে হল। আমি যতই তার দিকে অগ্রসর হই ততই সে তার ঘাড় বেঁকিয়ে পিছু হটতে থাকে। আমি তখন তার লাগাম ধরে তাকে ধীর গতিতে এক ক্ষেতের আলের পাশ দিয়ে নিয়ে চলি। নিজে সেই আলের ওপর দিয়ে হেঁটে চলি। তাতে আমার পক্ষে সময় বুঝে তার পিঠে লাফিয়ে চড়ার সুযোগ হয়। আমার কার্যকলাপ দেখার জন্য সেখানে ইতিমধ্যে অনেক লোক জমে গিয়েছে। আমার কাছে ব্যাপারটা এক অগ্নি পরীক্ষার মত হয়ে দাঁড়ালো। ভগবানের অসীম দয়ায়

আমি অল্পক্ষণ বাদেই এক লাফে আমার ঘোড়ার পিঠে উঠে বসলাম। তাতে আমার মুখ রক্ষা হয় ও আমার দর্শকরাও ধন্য ধন্য করে ওঠেন।

আমার বাহনটি কিন্তু পরাজয় মেনে নেবার পাত্রই নয়। পিঠে চড়ে বসা মাত্র সে এমন তাণ্ডব শুরু করে যে স্বয়ং দেবাদিদেব মহাদেব সেটা দেখে লজ্জা পেতেন। আমি তবু তার পিঠে কোনগতিকে এঁটে বসে থাকি ও তাকে কাবু করার জন্য তার দ্বারা কযেকটা গোল চক্কর দেওয়াই। আমার এইসব কেরামতিতে দর্শকদের চোখে আমার সম্মান আরো যেন বেড়ে যায।

তার পর গন্তব্য স্থানের দিকে আমার ঘোড়া আমি তীর বেগে ছুটিযে দিই। স্থানীয় দারোগা মহম্মদ ফৈয়াজ সেইমত আমার পেছনে তার ঘোড়া ছুটিযে দেয়। কিছুক্ষণ ধরে ওই ভাবে যাওয়ার পর আমি যখন দেখি আমার বাহন অনেকটা শায়েস্তা হয়ে এসেছে তখন তার রাশ আলগা করে দিই যাতে মহম্মদ ফৈয়াজ আমায ধরে ফেলতে পারে। সে কিন্তু তখন আমার অনেক পেছনে পড়ে গেছে। আমার কাছ পর্যন্ত আসতে তার আরো মিনিট ১৫।২০ লেগে যায়, যদিও সে তার ঘোড়া সাধ্যমত জোরে হাঁকিয়ে আসছিল।

তার পর আমরা দুজনে পাশাপাশি ধীর গতিতে চলেছি ও ঘটনার বিবরণ মহম্মদ ফৈয়াজের কাছ থেকে আমি মন দিয়ে শুনছি। আমার ঘোড়া তার ঘাড় বেঁকিয়ে মহম্মদ ফৈয়াজের পশ্চাৎভাগ এমন জোরে কামড়ে ধরে যে সে বেচারা উচ্চৈস্বরে বাপ্ বাপ্ চিৎকার করতে থাকে। আমি ত এই কাণ্ড দেখে অবাক। আমি সজোরে আমার ঘোড়ার লাগাম টানতে থাকি। তাতে কিন্তু কিছুমাত্র ফল হয় না। অতঃপর আমার হাতের ছড়ি দিয়ে আমি তার ঘাড়ে বেদম প্রহার লাগাই। একদিকে আমার ঘোড়া তার দাঁত দিযে দারোগাজীকে প্রাণপণে টানছে অন্যদিকে সে বেচারা প্রাণপণে তার কবল থেকে মুক্তি পাবার চেষ্টা করছে। এই টানা হেঁচড়ায মহম্মদ ফৈয়াজের জিনের পেটি ছিঁড়ে যায ও তার জীনসুদ্ধ সে ধরাশায়ী হয়। এইভাবে কোনগতিকে সে আমার ঘোড়ার কবল থেকে ছাড়া পায়। আমার ঘোড়া কিন্তু তখন আরো ক্ষেপে গেছে ও বার বার আমার দুই পায়ের দিকে মুখ ঝাপটা দিচ্ছে। তাই দেখে আমি আবার তাকে ছুটিয়ে দিয়েছি এর ফলে সে অনেকটা কাবু হয়।

আমার গন্তব্যস্থানে পৌছে আমি উপরোক্ত মামলার তদন্ত শেষ করি। তার পর সেই ঘোড়ার পিঠে কমলাপুর ফিরে আসি ও তাকে তার মালিকের কাছে ধন্যবাদসহ ফেরৎ দিই। সেই হল অবলকের সঙ্গে আমার প্রথম ও শেষ দেখা।

চুরি বিদ্যে বড় বিদ্যে—

পিলিভিত জেলার পূরণপুর ডিভিসনে এক গ্রাম আছে যেখানে এককালে দুই মানিকজোড় ভাই থাকত। তাদের নাম ছিল হরিরাম ও গোপালরাম। হরিরাম ছিল বড় ভাই ও গোপালরাম ছিল ছোট ভাই। হরিরাম বলিষ্ঠকায় ও কুস্তিগীরের মত দেখতে ছিল। তাদের কিছু জমিজমা ও ঘর-বাড়ি ছিল বলে তারা অনায়াসে সুখে-স্বচ্ছন্দে থাকতে পারত। কিন্তু তাদের মন গেল চুরিচামারি ও লুটপাটের দিকে। ক্রমশঃ তারা নিজেদের এক দল গড়ে তাদের গ্রাম থেকে অনেক দূর পর্যন্ত ধাওয়া করতে লাগল। ফলে বহু সংখ্যক ছোট বড় চুরিচামারি ও লুটপাটের রিপোর্ট পূরণপুর ও তার আশেপাশের থানায় হতে থাকে। পুলিশ অনেক চেষ্টা করা সত্বেও ঐ সব ঘটনার কোন সুরাহা করতে পারে না। হরিরাম ও গোপালরাম মোটামুটি অবস্থাপন্ন লোক ছিল বলে তাদের বিরুদ্ধে খোলাখুলি অভিযোগ করার কারুর সাহস ছিল না।

ইতিমধ্যে একদিন আমার সামনে এক আসামীকে ধরে আনা হয়। সে এক চুরির অভিযোগে ঘটনাস্থলে ধরা পড়ে গেছিল। আমি যখন তাকে ঘটনা সম্বন্ধে প্রশ্ন করি তখন সে বলে, পুলিশ শুধু চুনোপুঁটিদেরই ধরে বেড়ায়। যারা রুই কাতলা তাদের ধরতে সাহস করে না। কথাটা শুনে আমার কৌতূহল হয়। আমি তাকে সব কিছু খুলে বলতে বলি। সে আমায় হরিরাম ও গোপালরামের কথা বলে। তারাই চোরাইমালের অধিকাংশ আত্মসাৎ করে বাকিটুকু তাদের সঙ্গী-সাথীদের হাতে বিলিয়ে দেয়। লোকটা আমায় আশ্বাস

দিল, যদি আমি তাকে সঙ্গে করে তাদের গ্রামে নিয়ে যাই তাহলে সে তাদের বাড়ি থেকে বিস্তর চোরাই মাল উদ্ধার করে দিতে পারে।

আমি সেই দিনই রাত ১০ টার ট্রেনে কয়েকজন পুলিশ কর্মচারীদের সঙ্গে নিয়ে পুরণপুর যাই। তারপর স্টেশনের নিকটবর্তী এক গ্রামে গিয়ে আমরা সেখানকার মুখিয়ার সঙ্গে দেখা করি। গ্রামে ঢুকতেই কয়েকটা কুকুর ভেউ ভেউ করে রাতের নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে। বেচারা মুখিয়া ও তার সঙ্গীসাথীরা তখন তাদের বাড়ির সামনে অকাতরে ঘুম দিচ্ছে। আমরা তাদের ঠ্যাং ধরে নাড়া দিতেই তারা মনে করে বাড়িতে বুঝি ডাকাত পড়েছে। সেই ভয়ে তাদের দাঁতকপাটি লেগে যায়। এক আধজন আবার ঘুমের ঘোরে গোঙাতে থাকে: সেটা দেখে আমাদের হাসি পায়। যখন তাদের হুঁস হয় তখন আমরা তাদের বলি আমাদের জন্য কিছু লোক সংগ্রহ করে দিতে। ঘণ্টা খানেকের মধ্যে শ' খানেক লোক তাদের লাঠিসোটা নিয়ে হাজির হল।

মুখিয়া আমার জন্য এক টাট্টু ঘোড়াও সংগ্রহ করে। তাতে আমার অনেকটা সুবিধে হয়। রাত তখন ১টা।

আমি যে সময়ের কথা বলছি সেটা শ্রাবণ মাসের এক চাঁদনি রাত। যেতে যেতে দেখি আমাদের চতুর্দিকে শুধু জল। তার ওপর চাঁদের আলো পড়ে এক অলৌকিক আবেশের সৃষ্টি হয়েছে। আমি আমার টাট্টু ঘোড়ার ওপর বসে ক্ষেতের আলের ওপর দিয়ে আগে ভাগে চলেছি। আমার দলের অন্যান্য সকলে আমার পিছনে চলেছে। অনেকটা সেই বানর সেনার মত যারা এককালে সেতুবন্ধ পার করে লঙ্কার দিকে সার বেঁধে চলেছিল। সকলেই নির্বাক ও প্রকৃতি যেন গভীর নিদ্রায় মগ্ন। আমার কাছে সবটাই যেন স্বপ্নের মত লাগছিল। একমাত্র জীব যারা আমার স্বপ্ন ভঙ্গের কারণ হয়ে দাড়ায় তারা ছিল অসংখ্য ব্যাঙের দল। তাদের ডাকে আমার কানে তালা লাগবার উপক্রম আর কি।

প্রায় ঘণ্টাখানেক ধরে পথ চলার পর আমরা হরিরাম ও গোপালরামের বাড়ির কাছাকাছি এক আমবাগানে গিয়ে পৌছাই। সেখানে নিজেদের ভিন্ন ভিন্ন দলে ভাগ করি ও কোন্ দল কোন্ দিকে যাবে স্থির করি। আমি আমার দলের সঙ্গে হরিরামের বাড়ি ঘেরাও করবো বলে ঠিক করি।

তারপর আরো কিছুক্ষণের জন্য আমরা সেই আমবাগানে বসে কাটাই। ভোর সাড়ে চারটের কাছাকাছি সময়ে আমরা সেখান থেকে নিজের নিজের গন্তব্যস্থানের অভিমুখে বেরিয়ে পড়ি। আমাদের এই সমস্ত বাক্যবিহীন কার্যকলাপে বেশ একটু রোমাঞ্চের স্বাদও ছিল।

আমি যখন আমার দলবলসহ হরিরামের বাড়ি ঘেরাও করি তখন চারদিক নির্জন নিস্তব্ধ। তখনও চারদিক অন্ধকারাচ্ছন্ন। তারপর যখন আমরা দেখি সামান্য একটু দিনের আলো ফুটে উঠেছে তখন আমার দলের এক সাহসী অল্প বয়স্ক সেপাই তার লাঠির ওপর ভর করে অনায়াসে হরিরামের বাড়ির ছাদের ওপর উঠে যায়। তার ওই ওঠাতে যথেষ্ট বাহাদুরি ছিল। তারপর সে ওই বাড়ির উঠানে নেমে ভেতর থেকে তার সদর দরজা খুলে দেয়। আমরা সেই সঙ্গে হুড়মুড় করে বাড়ির ভিতর ঢুকে পড়ি। ঢুকেই দেখি হরিরাম তার উঠানে এক খাটিয়ার ওপর শুয়ে অকাতরে ঘুমোচ্ছে। আমাদের দলের আর এক বলিষ্ঠ গোছের সেপাই তখন তাকে চেপে ধরে। তাতে তার ঘুম ভেঙ্গে যায় ও সে উপরোক্ত সেপাইকে এমন এক ঝট্‌কা দেয় যে সেপাই বেচারা ছিট্‌কে সাত হাত দূরে গিয়ে পড়ে।

হরিরাম সেই সঙ্গে চট্‌ করে তার বালিশের তলা থেকে এক চকচকে ভোজালি বার করে ও সেটা তার আত্মরক্ষার জন্য বাঁই বাঁই করে তার মুখের সামনে ঘোরাতে থাকে। কিন্তু যখন সে বুঝতে পারে আমরা কে তখন সে ক্ষ্যান্ত হয়। আমরাও তখন আমাদের কাজে লেগে যাই।

তারপর একদিকে হরিরাম তার বাড়ির এক কোণে হাতকড়ি পরে ম্রিয়মাণ হয়ে বসে। অন্যদিকে তার বাড়ির ছেলেমেয়েরা ঝাড়া হাত পায়ে আর এক কোণে বসে। একটি মাত্র ৩/৪ বছরের শিশু বালক বাদে যার কাছে আমাদের কার্যকলাপ মোটেই বোধগম্য ছিল না, সে প্রথমটা তার মার কোলে বসেছিল। তারপর যখন তার খেয়াল হয় তার বাপের কোলে যেতে তখন সে গুটি গুটি পায়ে বাবার কাছে গিয়ে তার গলা জড়িয়ে ধরে। তাতে হরিরামের ধৈর্যের বাঁধ যেন ভেঙ্গে যায় ও সেই সঙ্গে তার চোখের দুফোঁটা জল তার গুম্ফদেশ দিয়ে গড়িয়ে পড়ে।

ইতিমধ্যে হরিরামের বাড়ির খানাতল্লাস পুরোদমে চলছে। কিন্তু এমন কিছু মাল পাওয়া যাচ্ছে না যা নিয়ে তার বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ আনা যেতে পারে। তখন পর্যন্ত তার বাড়ির শুধু একটি কুঠরির খানাতল্লাসি বাকি ছিল। সেই কুঠরিতে মেঝে থেকে ছাদ পর্যন্ত তার জন্তু জানোয়ারের খাদ্যসামগ্রী ঠাসা ছিল। তার মধ্যে হাতড়াতে হাতড়াতে একটা বন্দুক বেরিয়ে পড়ে। তারপর ক্রমান্বয়ে অনেক কিছু চোরাই মাল বেরোয়। সে সমস্ত মালের হিসাব পত্র করতেই আমাদের অনেক সময় লাগে।

মালের মধ্যে বস্তা বস্তা কোরা কাপড়ের থান ধরা পড়ে যা গোলাগোকরণ

নাথের এক দোকান থেকে কিছুদিন আগে চুরি যায়। তাছাড়া প্রায় আধ মণটাক ওজনের রূপোর গহনাও পাওয়া যায়।

গোপালরামের বাড়ি থেকেও বহু পরিমাণে চোরাই মাল পাওয়া যায়। সেইসব মাল সনাক্ত হবার ফলে ওই দুই ভায়ের সাত বছর করে সশ্রম কারাদণ্ড হয়।

আমাদের এই অভিযানের সাফল্যের খবর বিদ্যুৎবেগে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। তাই আমি যখন রেলযোগে পলিভিতে ফিরছি তখন দেখি বিস্তর লোক স্টেশনে স্টেশনে আমাকে অভিনন্দন জানাবার জন্য দাঁড়িয়ে। তাতে বেশ বোঝা যাচ্ছিল ওই দুই ভায়ের ভীতি তাদের সকলকে কতটা সন্ত্রস্ত করে রেখেছিল।

পাতাল প্রবেশ

পিলিভিতে থাকতে আমি এক গভীর রাতে আমার ঘোড়ার পিঠে শহরের ভিতর টহল দিতে বেরোই। সঙ্গে আমার মহম্মদ ইম্‌তিয়াজ দারোগা। যেতে যেতে আমরা এক সঙ্কীর্ণ গলির মধ্যে গিয়ে উপস্থিত হই। সেখানে এক কাঁচা বাড়িতে সিঁধ কেটে চোর ঢুকেছিল। সিঁদটা তখনও খোলা হয়ে আছে। আমরা দুজনে [illegible] দাঁড়িয়ে ঘটনার বিষয় আলোচনা করছি এমন সময় আমার মনে হল আমার ঘোড়ার পেছনের ঠ্যাং দুটো যেন পাতালের মধ্যে ঢুকে যাচ্ছে। পর মুহূর্তে আমিও আমার বাহনসহ সেই পাতালের ভিতর অপসৃত হয়ে যাই।

সে ছিল কৃষ্ণপক্ষের এক ঘোর অন্ধকার রাত ও ভরা বর্ষাকাল যখন সমানে বৃষ্টি পড়ছে। আমি তাই কিছুই ভাল করে দেখতে পাচ্ছি না। শুধু আন্দাজে বুঝছি যেখানে আমি পড়ে সেখানে প্রায় ডুব জল ও সেই জল বেগে ছুটে চলেছে। আমার বাহন তখন ওই পাতালপুরি থেকে নিজেকে উদ্ধার করার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করছে। তার পেছনের নাল বাঁধানো খুর দুটো [illegible] পাকা দেয়ালে গিয়ে দমাদম্ লাগছে। ফলে সেখান থেকে আগুনের ফুলকি ছুটছে। আমি তখন স্পষ্ট বুঝছি তার খুরের একটি মাত্র ঘা যদি আমার মাথার খুলিতে লাগে ত সেটা ফেটে চৌচির হয়ে যাবে। তাই আমি আমার মাথাটা যতদূর সম্ভব আমার ঘোড়ার পেটের তলায় ঢুকিয়ে তাকে বাঁচাতে সক্ষম হই।

আমার ঘোড়া যখন কোনগতিকে ওপরে উঠে পড়ে তখন আমার একটা ফাঁড়া কাটে। তার পর আমি নিজেও যেমন-তেমন করে সেই পাতালপুরি থেকে উঠে পড়ি। যদিও এই ব্যাপারটা ঘটতে মাত্র এক-আধ মিনিট লেগে থাকবে তবু সেটা আমার কাছে যেন অনন্তকাল বলে মনে হয়। আমি যখন রাস্তার ওপর উঠে পড়েছি তখন দেখি মহম্মদ ইম্‌তিয়াজ হতবুদ্ধি প্রায় ও তার মুখে শুধু একই বুলি "গজব হোগয়া, গজব হোগয়া" (কি সর্বনাশ, কি সর্বনাশ)।

ভাগ্যক্রমে আমার বাহন তখন রাস্তার ওপর স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে। আমি তাই আর কালবিলম্ব না করে তার পিঠে উঠে পড়ি ও তাকে তীরবেগে আমার বাড়ির দিকে ছুটিয়ে দিই। তখন আমার সর্বাঙ্গ থেকে এমন বিকট গন্ধ বেরুচ্ছে যে কহতব্য নয়।

আমি যেখানে পড়ে গেছিলাম সেটা ছিল এক প্রশস্ত খোলা ড্রেন। যার মধ্যে দিয়ে সারা শহরের ময়লা জল ছুটে চলেছিল। ভগবানের অসীম কৃপায় আমরা কিছুদূর যাবার পরই মুষলধারে বৃষ্টি নামে। তাতে আমার অঙ্গের কিছুটা ময়লা ধুয়ে যায়। বাড়ি এসে আমি এক টব্ ভর্তি জলে বসে খুব করে কারবলিক সাবান ঘসে আমার গায়ের দুর্গন্ধ দূর করি। আমার এই অভিযানের পর আমি যখন শুতে যাই তখন রাত দুটো।

উপরোক্ত ঘটনাব ২২।২৩ বছর বাদে যখন আমি উত্তর প্রদেশের আই জি পুলিশ তখন আমাদের মুখ্যমন্ত্রী পণ্ডিত গোবিন্দবল্লভ পন্থ কংগ্রেস সভাসদদের এক পার্টি মিটিং-এ আমায় উপস্থিত থাকতে বলেন। মিটিং-এ পুলিশের হরেক রকম অত্যাচারের ব্যাখ্যা হয়। তখন দেশ সবে স্বাধীন হয়েছে। আমি তাদের বলি আর একটু সময় যেতে দিন যাতে প্রাদেশিক পুলিশকে আবার নতুন করে গড়ে তুলতে পারা যায়। আমার বক্তব্য শেষ হওয়া মাত্র দেওরিয়া জেলার এক সভাসদ্ ঠাকুর রামধারি সিং উঠে দাঁড়ান ও বলেন লোকে সাধারণতঃ পুলিশের মন্দ দিকটাই দেখে। তিনি গভীর রাতে যখন একদিন স্টেশন থেকে বাড়ি ফিরছেন তখন দেখেন স্থানীয় পুলিশ সুপার কয়েকজন সেপাইয়ের সঙ্গে শহরে টহল দিতে বেরিয়েছেন। তাঁর বক্তব্য পুলিশের ভাল দিকটাও দেখা চাই।

ঠাকুর রামধারি সিং-এর পর পিলিভিত জেলার অল্পবয়স্ক এক সদস্য উঠে দাঁড়িয়ে বলেন, তিনি যখন ছোট ছিলেন তখন শুনতেন আমি নাকি গভীর রাতে ছদ্মবেশে শহরে টহল দিতে অভ্যস্ত ছিলাম। সেজন্য সেখানে চুরি-চামারি অনেক কমে যায়। তাঁর বক্তব্য এখনও কেন পুলিশের উচ্চতম কর্মচারীরা সেই রকম টহল দিতে অভ্যস্ত নয়?

আমি যে অমন করে আমার অপরিচিত এক ভক্তের কাছে বাহবা পাবো তা স্বপ্নেও ভাবিনি।

মিটিং যখন ভাঙ্গে তখন দেখি পুলিশের বিরোধী দলও যেন আর সে রকমটি নেই।

এই পিলিভিতে থাকতেই আর একদিন আমি যখন আমার অফিস থেকে বাড়ি ফিরছি তখন দেখি পুলিশ ইন্‌সপেক্টর হেণ্ডরসনের বাড়িতে বিস্তর লোক জড়ো হয়ে আছে। ঘটনাটা অস্বাভাবিক বলে আমি বাড়ি এসে আমার আরদালি আহমদ হুসেনকে সে সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করি। উত্তরে একটু মুচকি হেসে সে বলে —হুজুরের কি জানা নেই লাইন সাহেব এক মুসলমান মহিলার সঙ্গে নিকা করছেন? সেই সূত্রেই ত শহর থেকে মোল্লারা এসেছে।

কথাটা শুনে আমি আকাশ থেকে পড়ি। হেণ্ডরসন খাঁটি ইংরেজ ও এই ঘটনার অল্পদিন পূর্বেই সে তার স্ত্রী ও পাঁচটি সন্তানকে তার শ্বশুরালয় আগ্রায় পৌঁছে এসেছিল। আমি তখন স্থির করি এই নিকা আমায় বন্ধ করতেই হবে। সেই উদ্দেশ্যে হেণ্ডরসনকে ডেকে পাঠাই।

তার পর আমি যখন হেণ্ডরসনকে জিজ্ঞাসা করি আমি যে খবরটা পেয়েছি সেটা কি সত্য? সে তখন তার উত্তরে বলে, হঁ্যা। স্যার আমি ঠিক করেছি এক স্থানীয় মুসলমান মহিলাকে বিবাহ করবো। আমি তখন তাকে বলি তুমি কি পাগল হয়েছ? তুমি কি জানো না তোমার স্ত্রী ও ছেলেমেয়েরা যখন বর্তমান তখন তুমি এই দ্বিতীয় বিবাহ করলে বাইগামিতে ধরা পড়বে ও তোমার শাস্তি হবে?

হেণ্ডরসন আমার কথায় কিছুমাত্র বিচলিত না হয়ে বলে, তা কি করে সম্ভব? আমি তো ইসলাম ধর্মে দীক্ষা নেবো বলে ঠিক করেছি। তার বুদ্ধির যে এতটা বিপর্যয় ঘটতে পারে আমি তা ভাবতেও পারিনি। তাই তখন তাকে বলি, কেন

তোমার নিজের ধর্মে কি দোষ দেখলে যে সেটা ত্যাগ করতে প্রস্তুত ? সে তখন বলে, স্যার আমি অনেক চিন্তা করে দেখেছি খ্রীষ্টধর্মের চেয়ে ইসলাম ধর্ম অনেক উৎকৃষ্ট। কথাটা শুনে আমার হাসি পেল। আমি তখন হেণ্ডরসনকে আমার বাড়ির অফিস কামরায় বসিয়ে রেখে সেখানকার মুসলমান সুবেদারকে ডেকে পাঠাই। সে হেণ্ডরসনের অধীনে কাজ করত। তাকে ধমক দিয়ে বলি, এই কাণ্ড-কারখানায় তোমারই তলে তলে হাত আছে। তুমি যদি অবিলম্বে লাইন সাহেবের বাড়ি থেকে ওই মোল্লাদের দূর না করে দাও তাহলে আমি তোমায় শাস্তি দিতে বাধ্য হবো।

সেই সঙ্গে আমি টেলিফোনে শহর কোতোয়ালকে হুকুম দিই সে যেন তৎক্ষণাৎ পূর্বো[illegible] মহিলাটিকে পিলিভিত থেকে স্থানান্তরিত করবার ব্যবস্থা করে। তার পর আমি হেণ্ডরসনকে সঙ্গে করে কিছুক্ষণের জন্য হেঁটে বেড়াতে যাই। পরে যখন দেখি তার মাথা ঠাণ্ডা হয়ে গেছে তখন তাকে তার বাড়িতে ফেরৎ পাঠাই।

এই ঘটনার কিছুকাল বাদে আমি একদিন কৌতূহলবশে হেণ্ডরসনকে জিজ্ঞাসা করি তার কি করে ওই রকম মতিভ্রম হয়েছিল ? তখন সে আমতা আমতা করে বলে স্যার সুবেদার সাহেব আমার সেই মহিলাটির সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেয়। তার পর থেকে আমি তার বাড়ি নিয়মিত যেতাম। একদিন সে আমায় এক খিলি পান খেতে দেয়। আমার যতদূর বিশ্বাস তাতে লভ্ পোষণ জাতীয় কোন দ্রব্য মেশানো ছিল। তারই ফলে আমি মহিলাটির বশীভূত হয়ে যাই।

ব্যাপারটা যে আমার মধ্যস্থতায় এত সহজে মিটে যাবে তা আমি আশা করিনি।

একটি দিনের কথা

১৯৩২ সালের গোড়ার দিকে মহাত্মা গান্ধী দ্বিতীয় রাউণ্ড টেবিল কনফারেন্সে যোগ দেবার পর শুধু হাতে দেশে ফিরলে ভারত সরকার তাঁর গ্রেফতারের জন্য দিন স্থির করেন ৪ঠা জানুয়ারী। সেই সঙ্গে তাঁরা জেলা অধিকারিদের লিখে পাঠান মহাত্মার গ্রেফতারির সূত্রে জনসাধারণের মধ্যে যাতে কোন গোল না বাধে সেদিকে কড়া নজর রাখতে।

আমি সে সময় মির্জাপুর থেকে শ' খানেক মাইল দূর কুলডুমরিতে ক্যাম্প করছি। নির্দেশটা মির্জাপুরের ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট লোক মারফৎ আমায় পাঠান ও সেটা আমি ২রা জানুয়ারি রাতে পাই। ভেবে দেখলাম আমার অবিলম্বে মির্জাপুরে যাওয়া দরকার। আমার প্রধান সমস্যা হল কুলডুমরি থেকে মির্জাপুর যেতে হলে আমায় রবার্টসগঞ্জ পর্যন্ত প্রথম ৫২ মাইল পথ হয় হেঁটে ব না হয় ঘোড়া বা হাতীর পিঠে পার হতে হবে।

আমি ২রা রাতেই রওনা হতে পারতাম কিন্তু সেটা সম্ভব ছিল না। কারণ আমার পথের অধিকাংশই ঘন জঙ্গলের ভেতর দিয়ে। তাই আমি রাতারাতি স্থানীয় রাণী সিংরৌলির কাছ থেকে একটি ঘোড়া যোগাড় করে পরদিন সকাল ৮টা নাগাদ বেরিয়ে পড়ি। রাণীর একজন অশ্বারোহীও আমার সঙ্গে চলল।

কুলডুমরি থেকে ১২ মাইল দূর সেমরতর। সে একটা পাড়াগাঁ। কোনকালে সেখানে হয়ত এক-আধটা শিমুল গাছ ছিল বলে ঐ নামে জায়গাটা প্রসিদ্ধ হয়। সাধারণ অবস্থায় আমি নিশ্চয় সেখানেই রাত কাটাতাম। কিন্তু তা না করে

আমি আরও ১২ মাইল পথ অতিক্রম করে সোজা ওব্রায় গিয়ে উঠবো বলে ঠিক করলাম।

সেমরতরের মত ওব্রাও সেকালে জঙ্গলঘেরা এক পাড়াগাঁ ছিল। তফাৎ এইটুকু যে তার পাশ ঘেঁষে রিহন্দ নদী সেখান থেকে ১৫ মাইল দূর শোন নদীতে গিয়ে মিশেছে। বর্তমানকালে ওব্রায় একাধিক ভীমকায় থারমাল্ পাওয়ার স্টেশন অশ্রান্তভাবে বিদ্যুতের সৃষ্টি করে চলেছে।

আমি যখন ওব্রায় গিয়ে পৌছাই তখন বেলা ১২টা। ওই ২৪ মাইল পথ আমায় ঘন অরণ্যের মধ্যে দিয়ে পার হতে হয়। সেটা আমি বেশ উপভোগই করেছিলাম। যখন কুলডুমরি থেকে রওনা হই তখন গাছের পাতায় পাতায় ও প্রত্যেক ছাট বড় পাথরের কুচিতে যে সব শিশির বিন্দু পড়েছিল সেগুলো সূর্যের কিরণে ঝলমল করছিল। আমার মুখে যে শীতল বাতাস ও সর্বাঙ্গে সূর্যের তাপ লাগছিল তাতে আমি যেন স্বর্গসুখ অনুভব করছিলাম। আমার বাহন যেভাবে মৃদুমন্দ গতিতে মাইলের পর মাইল আঁকা বাঁকা উঁচু নীচু পথ অতিক্রম করে চলেছিল তাতে আমার মনে হচ্ছিল আমি যেন রূপকথার রাজ-পুত্তুরের মত কোন এক অজানা স্বপ্নপুরীর দিকে চলেছি। আর সব কথা ভুলে গিয়ে আমি তখন শুধু আমার পারিপার্শ্বিক প্রাকৃতিক শোভা উপভোগ করছি। পথের দুধারে শাল ও অন্যান্য বুনো গাছ সার বেঁধে যেন আমাকেই অভিনন্দনের জন্য দাঁড়িয়ে। কোথাও কোথাও বা এক আধটা বন্য জন্তুজানোয়ার গাছের শীতল ছায়ায় বসে বা দাঁড়িয়ে বিশ্রাম করছে। পাখীদের মধ্যে ময়ূরই বেশী করে দেখতে পাই। তাদের কেকা রবে ওই ঘন অরণ্যের নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করছিল।

যেতে যেতে লক্ষ্য করি কোথাও কোথাও ছোট বড় পাথরের কুচি গম্বুজের আকারে স্তূপ করা আছে। শুনলাম সেগুলো নাকি মৃত ব্যক্তিদের গোরস্থান। লোকে তাদের বঘৌত বলে। যখনই কোন ব্যক্তি জঙ্গলের ভেতর দিয়ে যেতে যেতে বাঘের মুখে তার প্রাণ হারায় তার আত্মীয়-স্বজনরা তার অস্থি মাংস জড়ো করে কাছাকাছি কোন এক স্থানে সেগুলো রেখে তার ওপর পাথর চাপা দেয়। উদ্দেশ্য, মৃত ব্যক্তির প্রেতাত্মা যাতে যেখানে সেখানে ঘোরাঘুরি না করে একই স্থানে বাস করে। এই আবিষ্কারের পর থেকে কিন্তু কোন বঘৌত আমার চোখে পড়া মাত্র আমার গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠত।

ওব্রায় এসে দেখি চোপনের বড়ো দারোগা আমার জন্য অপেক্ষা করছেন। তিনি নিজের বুদ্ধি খাটিয়ে আমার আগমনের প্রতীক্ষায় সেখানে

এসে পৌঁছান। কাজের মধ্যে তিনি আমার ও আমার বাহনের জন্য কিছু খাদ্য সামগ্রী বা চারা যোগাড় করে দেন। তাছাড়া আমার বিশ্রামের জন্য একখানা দড়ির খাটিয়া এক আম গাছতলায় বিছিয়ে দেন। আমি ওই খাটিয়ার ওপর আমার জুতো জামা সুদ্ধ শুয়ে পড়ি। স্থির করি বেলা ১টা বাজলেই সেখান থেকে আবার রওনা হব। আমার এই সঙ্কল্পটা দেখলাম দারোগাজীর তেমন মনঃপূত নয়। তবু তিনি কোন আপত্তি না করে চুপ করে রইলেন।

আমার ওই খাটিয়ার ওপর শোওয়া মাত্র একটু তন্দ্রা আসে। সেই অবস্থায় আমার চোখের সামনে সেই সাত সকালে কুলডুমরি থেকে রওনা হওয়া, সেই মাইলের পর মাইল ঘোড়ার পিঠে ঘন অরণ্যের মধ্যে দিয়ে যাওয়া ও সেই স্থানে স্থানে বঘৌতের স্তূপ দেখতে পাই। তাছাড়া আমি তখন আমার মানস চক্ষে দেখছি আমার পার্শ্বস্থিত রিহন্দ নদী অবিরাম গতিতে ও অদম্য উৎসাহের সঙ্গে তার প্রাণসখা শোন নদীর সঙ্গে মিলিত হতে চলেছে। আমার মাথার ওপরকার আম পাতার মর্মর ধ্বনি ও বন্য পশু পক্ষীর ডাক যা থেকে থেকে আমার কানে প্রবেশ করছিল সে সবও আমি বেশ উপভোগ করছিলাম। কিন্তু একটা জিনিস যা আমাকে আমার বুকে কাঁটার মত বিঁধছিল সে ছিল আমার সেই চিন্তা যে ১টার সময় আমায় সেখান থেকে আবার রওনা হতে হবে।

একটা বাজতেই আমার চোখ যেন আপনা হতেই খুলে যায় ও আমি তড়াক্ করে আমার খাটিয়া থেকে উঠে পড়ি। তার মিনিট পাঁচেকের মধ্যে স্থানীয় দারোগাকে সঙ্গে নিয়ে সেখান থেকে আবার বেরিয়ে পড়ি।

উপস্থিত সে রামও নেই সে অযোধ্যাও নেই। প্রগতির চাপে প্রকৃতির অনেক অঙ্গহানি হয়েছে। যেখানে এককালে শুধু বনানী ছিল সেখানে আজ মানুষের কুৎসিৎ বস্তী ও কলকারখানায় ছেয়ে গেছে।

ওব্রা থেকে চোপন যেতে ওই যে ১৪ মাইল পথ আমার অতিক্রম করার ছিল সেটা সমতল ভূমি দিয়ে গেছিল বলে সেটা আমি সহজেই পার হলাম। লক্ষ্য করার মত এখানে সেখানে কাঁটার বেড়া দিয়ে ঘেরা ছোট বড় শস্য ক্ষেত্র ভিন্ন আর বিশেষ কিছুই ছিল না। তবে এক-আধ জায়গায় আমি পথের ধারে গরু মোষের আশ্রয় স্বরূপ কাঠের বেড়া দিয়ে ঘেরা অস্থায়ী পশুশালা দেখতে পাই। সেকালে যেসব জন্তু জানোয়ার মির্জাপুরের জঙ্গলে অন্যান্য জেলা থেকে চরতে পাঠান হতো তাদের রাতে রক্ষণাবেক্ষণের কাজে এই পশুশালাগুলো তৈরি করা হত।

যেতে যেতে দেখি আমার আগে আগে যে একটি লোক হেঁটে চলেছে তার ঘাড়ের ওপর ৬/৭ ইঞ্চি লম্বা এক দগ্‌দগে ঘা। সে-সম্বন্ধে তাকে জিজ্ঞাসা করায় সে বলে, কিছুদিন ধরে সে তার মাথার যন্ত্রণায় ভীষণ কষ্ট পাচ্ছিল। তারই গাঁয়ের এক লোকের কথায় সে এক জলন্ত লৌহ শলাকা দিয়ে তার ঘাড়ের ওপর ছেঁকা দেয়। তাতে তার যথেষ্ট লাভ হয়েছে। আমি মনে মনে লোকটার ধৈর্য ও সাহসের প্রশংসা না করে থাকতে পারলাম না। তবে শুনেছি ওই জাতীয় চিকিৎসা পদ্ধতি নাকি আজকাল খুবই প্রচলিত।

ওব্রা থেকে চোপন পৌছুতে আমার ঘণ্টা দুয়েক লাগে। ভেবে দেখলাম আর একটা ঘোড়া যদি যোগাড় করতে পারা যায় ত আমি তার পিঠে চড়ে রাত ৮টা নাগাদ রবার্টসগঞ্জ পৌছতে পারি। ঘোড়া যোগাড়ের উদ্দেশ্যে চোপনের দারোগা তার সেপাইদের আশে পাশের গ্রামে পাঠিয়ে দিলেন কিন্তু তারা কিছুক্ষণ বাদে শূন্য হাতে ফিরে এলো। তখন বিকেল ৪টে। আমার ঝোঁক চাপল আমি যে ঘোড়ায় চেপে চোপন পযন্ত এসেছি তারই পিঠে চেপেই বেরিয়ে পড়ি।

সেকালে চোপন ঘন জঙ্গল দিয়ে ঘেরা এক মনোরম জায়গা ছিল। তার কোল দিয়ে শোন নদী আজও প্রবাহিত। বর্তমানে এক চমৎকার সেতু দিয়ে ঐ নদী পার হওয়া যায়। কিন্তু সেকালে সেরকম ব্যবস্থা না থাকায় আমাকে ঘোড়ার পিঠে বসেই নদী পার হতে হল। অপর পারে গিয়ে পৌছালাম বিকেল ৫টার কাছাকাছি। সেখান থেকে চোপনের দারোগাকে বিদায় দিয়ে দিই। তারপর আমার ঘোড়া রবার্টসগঞ্জের দিকে ছুটিয়ে দিই। ঘোড়াটা কিন্তু এতই ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল যে কিছুদূর যেতে না যেতেই থেমে যেতে লাগল। থেকে থেকে সে আবার মুখ ঘুরিয়ে থম্‌কে দাঁড়াতে লাগল। তখন আমি প্রমাদ গণি ও মাটিতে নেমে তার লাগাম ধরে হেঁটে চলি। দেখতে দেখতে চারধারে অন্ধকার ছেয়ে যায়। এমনকি আমার পক্ষে পথ চিনে এক পাও অগ্রসর হওয়া কঠিন হয়ে পড়ে।

ঘন জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছি। মনে শুধু ভয় এই বুঝি কোন বাঘ বা ভাল্লুক আমার পথ আটক করে দাঁড়ায়। আমার কিন্তু বাঘের চেয়ে ভাল্লুকের ভয়ই বেশী। জানতাম বাঘ খুব নিরীহ জন্তু না হলেও অনর্থক কোন মানুষ জাতীয় জীবের ওপর আক্রমণ করে না। যদি না সে ম্যান্‌ইটার হয়। ভাল্লুকের কথা কিন্তু স্বতন্ত্র। সে আচম্‌কা কোন মানুষের সামনে এসে পড়লেই আত্মরক্ষার জন্য তাকে আক্রমণ করে ও বিশ্রীভাবে আহত করে ছেড়ে দেয়।

এই কারণে আমার বুক তখন বেশ টিপ্‌টিপ্‌ করছে। বেশ বুঝছি ওই অসময়ে আমার উপস্থিতি সব বন্য জন্তুই আপত্তিজনক মনে করতে পারে। অনন্যোপায় হয়ে রাম নাম করতে করতে আমার ঘোড়ার লাগাম ধরে পায়ে পায়ে হেঁটে চলেছি। যদিবা ভাগ্যক্রমে কোন আশ্রয় আমার কপালে জোটে।

ভগবানের অসীম কৃপায় আরও কিছু দূর যাবার পর আমার মাথার ওপরকার নক্ষত্রের ক্ষীণ আলোকে আমার পথের ডানদিকে কাঠের বেড়া দিয়ে ঘেরা এক উন্মুক্ত পশুশালা দেখতে পেলাম। তার ভেতর বিস্তর গরু মোষ ছাড়া ছিল ও তারই এক কোণে আবার খড়ের ছোট্ট এক ছাউনি ছিল। সেটা দেখা মাত্র আমি ওই পশুশালার মধ্যে ঢোকবার উপক্রম করছি, এমন সময় এক গোছা ঘণ্টির টুন্‌টুন্‌ আওয়াজ ও এক মানুষের পদধ্বনি আমার কানে এলো। আমি তখন থমকে দাঁড়িয়ে পড়লাম। ক্রমেই সেই পদধ্বনি আরও স্পষ্ট হয়ে ওঠে ও অবশেষে এক ব্যক্তি আমার পারিপার্শ্বিক অন্ধকারের আবরণ ভেদ করে বেরিয়ে আসে। সে ছিল থানার এক চৌকিদার। তাকে দেখে হাঁফ ছেড়ে বাঁচি। তার মানুষপ্রমাণ লাঠির অগ্রভাগে এক গোছা পিতলের ঘণ্টি ও এক ডাকের ঝোলা বাঁধা ছিল। সে আমারই "ডাক" নিয়ে যাচ্ছিল। তাতে আমার খুব সুবিধা হল, তাকে আমার সঙ্গে নিলাম।

তার পর থেকে আমি খানিক পথ হেঁটে ও খানিক পথ ঘোড়ার পিঠে চেপে এগোলাম। এইভাবে আমি রাত ১০টা নাগাদ রবার্টসগঞ্জে গিয়ে পৌঁছাই। রবার্টসগঞ্জের দারোগা আমার জন্য 'বাসের' ব্যবস্থা করে দেন ও তাতে করে রাত ১২টা নাগাদ মির্জাপুর গিয়ে পৌঁছাই।

আমার ম্যারাথন্‌ রাইডের জন্য আমার ওপরওয়ালাদের কা়ছ থেকে আমি ভূরি ভূরি প্রশংসা পেয়েছিলাম। আমি কিন্তু জানতাম এ ক্ষেত্রে আমার চেয়ে আমার বাহনই বেশী প্রশংসার পাত্র।

ভাগ্যক্রমে পরদিন অর্থাৎ ৪ঠা জানুয়ারি মহাত্মার গ্রেপ্তারি নিয়ে মির্জাপুরে কোন গোলমাল বাধে নি।

যদিও মহাত্মা গান্ধীর গ্রেপ্তারি উপলক্ষ্যে আমার ওখানে কোন গোলমাল বাধে নি কিন্তু ইতিপূর্বে আমাদের দেশে যে রাজনৈতিক আন্দোলন চলছিল তার থেকে আমার জেলা বাদ থাকেনি। ে সময় গান্ধীজীর ডাণ্ডি যাত্রার অনুকরণে লবণ তৈরি নিয়ে অথবা বিদেশী বস্ত্র বর্জন বা মাদক বর্জন জাতীয় একটা না একটা একটানা সত্যাগ্রহ লেগেই ছিল।

লবণ সত্যাগ্রহ অনেকটা লোকদেখানো বা ছেলেখেলার মত ছিল। সাধারণতঃ শহরের কোন চৌমাথায় কতকগুলো ছেলে-ছোকরা মিলে হৈ-হল্লা করে আগুন জ্বালাত। পরে সেই আগুনের ওপর একটি হাঁড়ি চাপিয়ে লবণ তৈরি করার ভানমাত্র করত।

তেমনই বিদেশী বস্ত্র বর্জন বা মাদক বর্জন জাতীয় সত্যাগ্রহেরও একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল পুলিশের হাতে নিজেদের কোন ছুতোয় ধরা দেওয়া। ওই সব কংগ্রেস স্বেচ্ছাসেবকদের আর একটা কাজ ছিল। সরকারি বিশেষ করে পুলিশের লোক দেখলেই তাদের টোডি বাচ্চা হায় হায় বলে টিটকিরি দেওয়া। সুতরাং ওই সময়ে পুলিশ কর্মচারিদের দুরবস্থারও অন্ত ছিল না। এমনকি তাদের প্রতি ধোপা-নাপিত ও মেথর পর্যন্ত বিরূপ হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

মির্জাপুরে থাকতে আমার আর এক ধরণের সত্যাগ্রহের অভিজ্ঞতা হয় যা কংগ্রেসের প্রোগ্রামের ঠিক অন্তর্গত ছিল না। ব্যাপারটা এরকম:

একদিন আমার অফিসে বসে কাজ করছি এমন সময় স্থানীয় স্টেশন সুপারের কাছ থেকে খবর পাই যে এক দল কংগ্রেস ভলানটিয়ার চুনার থেকে বিনা টিকিটে মির্জাপুর স্টেশনে এসে পৌচেছে। তারা টিকিটের পয়সা দেবে না বলে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। আমি তখন আমার গাড়ি হাঁকিয়ে সেখানে গিয়ে উপস্থিত হই ও দেখি স্টেশন কম্পাউণ্ডের ভিতর বিস্তর পুরুষ ও স্ত্রী জড়ো হয়ে রয়েছে। তাদের মধ্যে কয়েকজন আবার হাতে কংগ্রেসের পতাকা নিয়ে। থেকে থেকে তারা সকলে মিলে জয় গান্ধীজী, জয় মতিলাল, জয় জওহরলাল বলে উচ্চৈঃস্বরে ধ্বনি দিচ্ছে।

গাড়িতে বসে চিন্তা করছি কি করা উচিত এমন সময় কংগ্রেস পতাকাধারী এক বৃদ্ধা আমার গাড়ির ভিতর তার মাথা ঢুকিয়ে ওই বিনা টিকিটের সত্যাগ্রহীদের স্বপক্ষে আমার কাছে ওকালতি করে। জনসাধারণের সহানুভূতি তখন ষোল আনা সত্যাগ্রহীদের দিকে। আমি ভীড় ঠেলে তাদের সামনে গিয়ে দেখি তাদের নেতা ছাড়া আর সকলেই নেহাৎ অল্প বয়সী। তাদের মুখে একটি কথা নেই। তাদের মনোভাব, তোমাদের যা করনীয় কর, আমরা সেজন্য প্রস্তুত। আমার বুঝতে বাকি রইল না যে, ছেলেগুলো কোন প্রাইমারি স্কুলের ছাত্র ও তারা তাদের গুরুজীর কথামত ধরা দিতে এসেছে। আমি তাদের এক 'বাসে' করে স্থানীয় কারাগারে নিয়ে যাই ও স্থির করি তাদের মধ্যে যারা অন্ততঃ ষোল বছরের তাদের আটক রেখে অন্যদের ছেড়ে দেবো। আমার সংকল্প ওদের মধ্যে জানাজানি হওয়াতে ওরা সকলেই নিজেদের বয়স

ষোল বছরের অধিক বলে জাহির করতে থাকে। আমি কিন্তু তাদের কথায় কান না দিয়ে তাদের নেতাটিকে ছাড়া আর সকলকে এক 'বাসে' করে শহর থেকে মাইল পাঁচেক দূরে ছেড়ে দিয়ে আসার ব্যবস্থা করি। তাতে কিন্তু ফল উল্টো হয়। যখন তারা হেঁটে মির্জাপুর শহরে ফিরে আসে তখন জনসাধারণের কাছে তাদের অভ্যর্থনার কি ধূম।

পরের দিনও চুনার থেকে ঠিক ওই রকম একদল সত্যাগ্রহী মির্জাপুর এসে হাজির হলে আমি প্রমাদ গণি। ভাগ্যক্রমে তার পরদিন কংগ্রেস হাইকমাণ্ড থেকে এক বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয় যে বিনা টিকিটে রেলযাত্রা কংগ্রেস প্রোগ্রামের বাইরে। আমি তখন হাঁফ ছেড়ে বাঁচি।

বড়লাটের বড় কথা

বড়লাটদের মধ্যে লর্ড ওয়েভেলই সর্বপ্রথম প্লেনে করে এদেশে যাতায়াত আরম্ভ করেন। তাঁর আগেকার বড়লাটরা রেলে যাতাযাত করতেন। তাঁদের জন্য এক বিরাট সেলুন গাড়ি সংরক্ষিত থাকত। তাকে লোকে ভাইসরয়েজ স্পেশাল বলে জানত। গাড়িখানার এমনি আভিজাত্য ছিল যা জনসাধারণকে তাক্ লাগিয়ে দিত। তার বহির্ভাগ ছিল আগাগোড়া সাদা।

গাড়িখানাকে কাছ থেকে দেখবার সুযোগ আমার দুবার হয়। একবার ১৯২৫ সালের জানুয়ারি মাসে অন্যবার ১৯৩১ সালে। প্রথমবার মিরাটে থাকতে আমায় গাড়িখানাকে পাস্ করাতে খুর্জা স্টেশনে যেতে হয় ও দ্বিতীয়বার মির্জাপুরে থাকতে অহরওরা রোড স্টেশনে।

খুর্জায় পৌঁছেই আমার কাজ হয় স্টেশনের আগাগোড়া ভাল করে নিরীক্ষণ করা। কাজটা রাত ১২টা নাগাদ সেরে ফেলি। তারপর থেকে ভোর ৪টে পর্যন্ত সাঙ্গ-পাঙ্গ নিয়ে ওইখানে শুধু পাহারা দেওয়া ছাড়া আর কোন কাজ ছিল না। চতুর্দিক তখন নিঝুম ও স্টেশনের কর্মচারীদের মধ্যে দু' একজন ছাড়া সকলেই প্রায় সুপ্তি মগ্ন। ট্রেনখানার আসবার সময় হয়ে এলে দেখি তাদের মধ্যে এক সাড়া পড়ে গেছে ও যে যার কাজে লেগে গেছে।

৪টে বাজতে ১০ মিনিট বাকি থাকতে দেখি একখানা খালি পাইলট্ এঞ্জিন নিঃশব্দে সেখানে এসে জলস্তম্ভের নীচে দাঁড়িয়ে। মাঝের ১০ মিনিট কেটে যেতেই এঞ্জিনখানা আবার তেমনি নিঃশব্দে অন্ধকারের মধ্যে মিলিয়ে গেল।

তার কিছুক্ষণ বাদেই আমাদের আকাঙ্ক্ষিত স্পেশালখানা চতুর্দিকের অন্ধকার ভেদ করে এসে পড়ল। স্টেশন স্টাফের কারুর মুখে কথাটি পর্যন্ত নেই। সকলেই যেন যন্ত্রচালিতের মত ও কেবল ইশারার সাহায্যে নিজের নিজের কাজ করে চলেছে, পাছে ট্রেন-যাত্রীদের, বিশেষ করে বড়লাট দম্পতির ঘুমের ব্যাঘাত হয়। আমি ওই সব কাযকলাপ হাঁ করে দেখছি ও মনে মনে ভাবছি, গত জন্মে লাট-দম্পতি না জানি কত পুণ্য অর্জন করে থাকবেন যার জন্য তাঁরা আজ এতখানি খাতির পাচ্ছেন।

দেখতে দেখতে গাড়িখানার ছাড়বার সময় হল। সে যেমন নিঃশব্দে এসে দাঁড়িয়েছিল তেমনি নিঃশব্দে ছেড়ে গেল। আমি অবাক হয়ে গাড়িখানার দিকে চেয়ে এমন সময় দেখি তার একটি কক্ষ থেকে জোর আলো বাইরের দিকে ঠিকরে পড়ছে। সেই কক্ষের ভেতর একজন দক্ষিণ ভারতীয় তন্বী এক আয়নার সামনে তার আজানুলম্বিত কেশরাশির প্রসাধন করছে ও একটি অল্পবয়স্ক বেয়ারা জাতীয় পুরুষ রূপসীটির দিকে মুগ্ধনয়নে চেয়ে রয়েছে। দুজনেরই মুখে এক অস্ফুট হাসির রেখা। আমি স্বপ্নেও ভাবিনি ওই নিভৃত প্রেমালাপ অনেকটা সিনেমার ছবির মত আমায় একঝলক দেখা দিয়ে কালের অন্তরালে মিলিয়ে যাবে।

ঘটনার তার এক দিক যা আমার মনকে তখন দোলা দিচ্ছিল তা আমার চিন্তাধারা। আমি তখন ভাবছি, হা কপাল! আমি যখন প্রচণ্ড শীতে সমস্ত রাত জেগে কাটিয়ে দিলাম অন্যদিকে তখন লাটসাহেবের ঝি চাকর পর্যন্ত কি আরামেই না তাদের গন্তব্যপথে চলেছে।

পরে যখন ১৯৩১ সালে ওই স্পেশালখানা পাস্ করা অহরওরা রোড স্টেশনে যাই তখন লর্ড রেডিং-এর বদলে লর্ড উইলিংডন্ দিল্লীর মসনদে বসে। কথা ছিল তাঁর স্পেশাল সেখানে রাত ৮টায় এসে ৮-৪৫-এ ছাড়বে। লাটসাহেব চলতি গাড়িতে তার ডিনার খাওয়া পছন্দ করতেন না বলে ওরকম ব্যবস্থা হয়েছিল। গাড়িখানা আসামাত্র লাটসাহেবের অনুচরবর্গ তাদের পুরী তরকারি ও পানীয় জলের সন্ধানে এক হট্টগোল বাধিয়ে দেয়। হাজার হোক্ তারা দিল্লীর অধীশ্বরের খাস্ লোকজন। তাদের ছুটোছুটি থেমে গেলে লাট্সাহেব প্লাট্ফর্মে দুচার বার পাইচারি করতে গাড়ি থেকে নেমে পড়েন। তিনি যে মুহূর্তে তাঁর কক্ষ থেকে বেরোবার জন্য প্রস্তুত ঠিক সেই মুহূর্তেই তাঁর এক চোগা চাপকান্ধারি অনুচর তাঁর কামরার একস্লাইডিং দরজা খুলে দেয়।

আর একজন ওই জাতীয় লোক এক পাদান তাঁর প্ল্যাটফর্মে নামবার জন্য যথাস্থানে রেখে দেয়। দুটি কাজই এমন কেতাদুরস্ত ও পরিপাটি ভাবে করতে দেখা গেল যে তাতে তাক্ লাগবার কথা।

লাটসাহেব পাইচারি করা শেষ করে ট্রেনের ডাইনিং সেলুনে গিয়ে উঠলেন।

সেকালে লাট্সাহেব ট্যুরে বেরোলেই স্থানীয় রেল ডাক পুলিশ ও অন্যান্য বিভাগের অন্ততঃ এক-আধজন করে উচ্চপদস্থ কর্মচারী তাঁর সঙ্গে যেতেন। তাছাড়া রেল লাইনের ধারে পুলিশের সেপাই ও চৌকিদারদের সমানে পাহারা বসত। পথের মধ্যস্থিত প্রত্যেকটি রেলের ফটক বা ছোট বড় পোলের দেখাশোনার জন্য বহু সংখ্যক লোক নিযুক্ত থাকত। যাতে কোন বাধা বিঘ্ন না ঘটে। বলা যায় গড়ে প্রত্যেক শ'খানেক গজের ব্যবধানে একজন করে লোক দাঁড়িয়ে থাকত। রাত্রে যখন তারা সার বেঁধে একটা করে জ্বলন্ত মশাল হাতে গাড়ীখানাকে পাস্ করাতো তখন সেটা দেখবার মত জিনিস।

. আমি যেদিনের কথা বলছি সেদিন উপরোক্ত ভিন্ন ভিন্ন বিভাগের এক-আধ জন পদাধিকারী ব্যক্তি ছাড়াও লাট্সাহেবের কাউন্সিলের দুজন মেম্বর তাঁর সঙ্গে ছিলেন। তাঁরা ডাইনিং টেবিলে লাট্সাহেবের দুধারে বসে লাট্সাহেবের সঙ্গে গভীর আলোচনা করছিলেন। আলোচনার বিষয় ছিল কি কৌশলে মহাত্মা গান্ধীকে দ্বিতীয় রাউণ্ড টেবিল কনফারেন্সে যোগ দিতে সম্মত করানো যায়।

ওই তিনজনের মধ্যে যে আলোচনা চলছিল তাতে লাট্সাহেব এতই ব্যস্ত ছিলেন যে তাঁর সময়ের আর কোন জ্ঞান ছিল না। গাড়ি ছাড়বার সময় উত্তীর্ণ হয়ে যাওয়াতে তাঁর সঙ্গে যে একজন উচ্চপদস্থ রেলের কর্মচারী যাচ্ছিলেন তিনি বারবার লাট্সাহেবের মিলিটারি সেক্রেটারিকে ইশারায় সে বিষয়ে তাগিদ দেন। মিলিটারি সেক্রেটারি কিন্তু শুধু মাথা নেড়ে তাঁর আপত্তি জানান।

ইতিমধ্যে একাধিক আপ্ ও ডাউন ট্রেন অহরওরা রোডের দুদিককার স্টেশনে আটক পড়ে যায়। তার কারণ সেকালে কোন ট্রেনেরই পঙ্গে ভাইসরয়েজ স্পেশালকে জংশন স্টেশন ভিন্ন অন্য কোথাও পাস্ করা নিষেধ ছিল পাছে কোন দুষ্টলোক স্পেশালের ওপর বোমা ফেলে।

যখন লাট্সাহেব তাঁর ডিনার সেরে উঠে দাঁড়ান তখন তাঁর গাড়িখানা অহরওরা রোডের মত এক ছোট স্টেশনে ৪৫ মিনিটের বদলে ১ ঘণ্টা ৩৫ মিনিটের জন্য দাঁড়ায়। মহাত্মা গান্ধীকে কিভাবে দ্বিতীয় গোলটেবিল বৈঠকে যোগ দিতে সম্মত করা যায় এই চিন্তা লাট্সাহেবকে গভীরভাবে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল বলেই এই বিলম্ব।

বম্ মহাদেব

মির্জাপুরে থাকতে একদিন সকালে আমি আমার বাসার অফিস ঘরে বসে, এমন সময় এক অপরিচিত ব্যক্তি আমার সঙ্গে দেখা করতে এল। তাকে দেখে ভদ্র ঘরেরই বলে আমার মনে হল। কিন্তু তার কথাবার্তায় বা হাবভাবে সন্দেহ হল তার মধ্যে যেন কোথাও একটু গলদ আছে। আমার কাছে তার আসার উদ্দেশ্য জিজ্ঞাসা করায় সে মুখে কিছু না বলে তার কোটের পকেট থেকে একখানি বাদামী রং-এর কাগজ বার করল। সেটা দেখে আমি বুঝি তাকে সামান্য এক ব্যাপারে ফরিয়াদির তরফ থেকে সাক্ষ্য দেবার জন্য কোর্ট থেকে তলব করা হয়েছে। বেচারা আদালতের মুখ কোনদিন দেখেনি। তাই ভয়ানক চঞ্চল হয়ে পড়েছে। তাকে বুঝিয়ে বলি ভয়ের কোন কারণ নেই। সে কিন্তু তাতে বিশেষ আশ্বস্ত বোধ করল না দেখে আমি তাকে অভয় দিই, যদি সে কোন ফ্যাসাদে পড়ে ত আমার কাছে যেন সোজা চলে আসে। আমি তখন তার বিহিত করবো। আশ্বস্ত হয়ে সে তার বাড়ি ফিরে যায়।

তারপর দিন যখন আমি কাছারিতে বসে আমার নিয়মিত কাজকর্ম করছি তখন দেখি সেই লোক আমার অফিস ঘরের বাইরে তার এক ৫/৬ বছরের ছেলের হাত ধরে বসে। সে আবার মাঝে মাঝে বম্ মহাদেব বম্ মহাদেব হুঙ্কার ছাড়ছে। তাকে দেখে মনে হ'ল সে নিশ্চয় তার কোন মামলা মকদ্দমার সূত্রে কাছারিতে এসেছে এবং ওই ভাবে তার ইষ্ট দেবতার নাম করছে। সেটা কিছু-মাত্র অস্বাভাবিক বলে মনে হল না কারণ জানা ছিল ওই অঞ্চলের লোকেরা

কাশীবিশ্বনাথের বিশেষ ভক্ত ও যখন তখন বম্ মহাদেব বলতে অভ্যস্ত। তাই আমি তার দিকে লক্ষ্য না করে নিজের কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ি।

তারপর যখন বিকেল ৫টার কাছাকাছি আমি অফিস থেকে উঠবো উঠবো করছি তখন সেই লোকটার দিকে আবার আমার নজর যায়। সে তখনও ঠিক আগেকারই মত সেই একই জায়গায় বসে। দেখে আমার একটু আশ্চর্য বোধ হয় কারণ কাছারি তখন সেদিনকার মত উঠে গেছে। পেশকারকে বললাম, যাও দেখে এস লোকটা কি চায়। সে আমারই সঙ্গে দেখা করতে চায় জানতে পেরে তখন তাকে ডেকে পাঠাই। সে তাতে খুব খুশী হয়ে তার ছেলের হাত ধরে আমার ঘরে ঢোকে।

লোকটার হাতে একটি ছোট পুঁটলির মত ছিল। সেটা খুলে তার থেকে সে একে একে নৈবেদ্যের যাবতীয় সামগ্রী যথা চাল কলা নারিকেল গন্ধ পুষ্প ইত্যাদি বার করে আমার অফিস টেবিলের ওপর সাজিয়ে রাখে। তার পর সে জোড় হাতে হাঁটু-গেড়ে আমার চেয়ারের পাশে মেঝের ওপর বসে আমার মুখের দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে একদৃষ্টে চেয়ে থাকে। আমি তার কার্য্যকলাপ দেখে অবাক। লোকটার যে মতিভ্রম হয়েছে স্পষ্ট বোঝা গেল। আমি জানতে চাই সে কি চায়, সে বলে, ভগবান্ আমার কিছুই চাই না। আমি তখন তাকে বলি, বেশ তুমি তাহলে তোমার বাড়ি ফিরে যাও। উত্তরে সে আম্‌তা আম্‌তা করে বলে, ভগবানের কাছে আমার একটি মাত্র আবেদন আছে। আবেদনটা যে কি জিজ্ঞাসা করায় সে বলে, ভগবান্ আমি চাই যখনই আমার মনে ইচ্ছা জাগবে তখনই আপনি আমায় দর্শন দেবেন। লোকটা যে আমাকেই স্বয়ং মহাদেব বলে ঠিক করেছে সেটা বুঝতে আমার আর বাকি রইল না। ব্যাপারটা যে এত দূর গড়াবে তা আমি ভাবিনি। তখন আমার এক মাত্র চিন্তা কি করে তার হাত থেকে ছাড়া পাই। তাই আমি তাকে "তথাস্তু" বলে বিদায় দিই।

তার পর দিন ছিল রবিবার। আমি আমার মধ্যাহ্নের আহার সেরে বাসাতেই বিশ্রাম করছি এমন সময় বম্ মহাদেব, বম্ মহাদেব চিৎকার শুনতে পেলাম। বাসার বাইরে এসে দেখি সেই লোকটা আমার এক আর্দালির সঙ্গে রীতিমত মল্লযুদ্ধ করছে। আমি তাদের কাছে এগিয়ে গেলাম। আমায় দেখা মাত্র লোকটা হন্তদন্ত হয়ে তার সেই পুরাতন ভঙ্গিতে জোড় হাতে হাঁটু-গেড়ে ঝপাৎ করে মাটিতে বসে পড়ে ও আমার মুখের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে থাকে। আমার আর্দালির মুখে শুনি লোকটা আমার ঘরে সটান ঢোকবার চেষ্টা

করছিল। যখন সে তাকে আটকাবার চেষ্টা করে তখন লোকটা বলে, আমি নাকি তাকে কথা দিয়েছি যখনই তার মনে ইচ্ছা জাগবে তখনই আমি তাকে দর্শন দেবো। আমি দেখি কথাটা ঠিক কিন্তু মনে মনে ভাবি এভাবে ক'দিন চলবে। যাই হোক আমি তখন তার দিকে চেয়ে বলি, এবার তুমি বাড়ি যাও। সেও আমার কথায় বিনা বাক্যব্যয়ে সুড় সুড় করে চলে যায়।

আরও দিন দুয়েক বাদে লোকটা বম্ মহাদেব, বম্ মহাদেব বলতে বলতে আবার আমার বাসায় আসে। তার সঙ্গে আমার দুজন আর্দালির যুদ্ধ বেধে যায়। তখন সে বাড়ি ফিরে যেতে বাধ্য হয়। কিন্তু আমার মনে এক খট্‌কা লেগে রইল, না জানি সে আবার কখন এসে হাজির হবে ও বিভ্রাট ঘটাবে। আমি তখন তার বাড়ির কর্তাকে ডেকে পাঠাই ও বলি লোকটার ভাল করে চিকিৎসা করানো দরকার। তার উত্তরে সে বলে সেই যেদিন থেকে লোকটা প্রথমবার আমার সঙ্গে দেখা করতে আসে সেদিন থেকে তাকে বাড়িতে আটক রাখা কঠিন হয়ে পড়েছে। সে সমানে আমার দর্শনের জন্য ব্যস্ত। কথাটা শুনে আমার খারাপ লাগল। আমি তাকে চিকিৎসার জন্য শীঘ্র রাঁচি পাঠাবার ব্যবস্থা করতে বলি। অবশ্য তার পর থেকে আমি আর সেই লোকটার কোন খবর রাখি নি।

এক রোমাঞ্চকর ঘটনা

দুর্ধর্ষ জগন্নাথ সিং-এর বাস ছিল বিন্ধ্যাচলের কাছাকাছি এক গ্রামে। তার অত্যাচারের ফলে তাকে সকলেই ভয় পেত ও ঘৃণার চক্ষে দেখত। একদিন সূর্যাস্তের কিছু পরে ক্ষেত খামার থেকে বাড়ি ফেরার সময় এক অজানা লোক তাকে লক্ষ্য করে কয়েকবার রিভলবারের গুলি ছোঁড়ে। লোকটা তার পথের ধারে অড়হরের ক্ষেতের মধ্যে তারই জন্য ওৎ পেতে বসেছিল ও হঠাৎ সেখান থেকে বেরিয়ে আসে। জগন্নাথ সিং গুলি খেয়ে বাপ্ বাপ্ করে পালাবার চেষ্টা করে। কিন্তু লোকটা তাকে তাড়া করে আরও দুএক রাউণ্ড গুলি ঠুকে দেয়। ফলে সেইখানেই তার ইহলীলা সাঙ্গ হয়।

ঘটনাস্থল জনমানবহীন ছিল। তার চারধারে অনেক দূর পর্যন্ত মানুষ-প্রমাণ অড়হরের ক্ষেত থাকায় এই নৃশংস হত্যাকাণ্ড কারুর চোখে পড়ে না। হত্যাকারীও সহজেই উধাও হয়ে যায়। ঘটনার কয়েক ঘণ্টা বাদে যখন পুলিশ মামলার তদন্ত করতে সেখানে আসে তখন তারা কয়েকটা '৪৫৫ বোর গুলির টুপি ছাড়া আর কিছুই পায় না। তবে তারা স্পষ্ট বুঝতে পারে এই হত্যাকাণ্ড কোন সিদ্ধ হস্তের কাজ।

ঘটনাচক্রে ঠিক সেই সময় দিগ্‌গজ সিং নামের এক ব্যক্তি এলাহাবাদের আশে পাশে ওই ধরণের কয়েকটা খুনের ব্যাপারে নামাঙ্কিত হয়। তার কাজ ছিল লোকেদের কাছ থেকে মোটা টাকা নিয়ে তাদের শত্রুদের খুন করা। সেইজন্য সকলের মনে দৃঢ় বিশ্বাস জন্মায় এই হত্যাকাণ্ড দিগ্‌গজ সিং-এরই কাজ।

ঘটনার কয়েকদিন বাদে মির্জাপুরের কোতোয়াল মহম্মদ সয়ীদকে তাঁর এক গুপ্তচর খবর দেয় যে, সে গতদিন সন্ধ্যার সময় এক অপরিচিত লোককে রিভলবার হাতে বিন্ধ্যাচলের লাগোয়া রেল লাইন ধরে কিছুদূর পর্যন্ত যেতে ও পরে তাকে বিন্ধ্যাচলের এক খালি বাড়িতে ঢুকতেও দেখেছে। মহম্মদ সয়ীদ এই খবরটা আমায় দেন ও তার পর থেকে লোকটার গতিবিধির দিকে কড়া নজর রাখার ব্যবস্থা করেন। ফলে জানা যায় সে দিনে মাত্র দুবার বাড়ির বাইরে দেখা দেয়। একবার সকালের দিকে যখন সে বাড়ির লাগোয়া এক কূয়ার ধারে স্নান করতে যায়। আর একবার সন্ধ্যার দিকে যখন সে জনসাধারণের চোখ এড়িয়ে রেল লাইন ধরে কিছুদূর পর্যন্ত বেড়াতে যায়।

লোকটার গতিবিধি খুবই সন্দেহজনক বোধ হওয়ায় একদিন সকাল ৮টা নাগাদ মহম্মদ সয়ীদ, ইন্সপেক্টর সিদ্দীক ও আমি ২০/২৫ জন সেপাই সঙ্গে নিয়ে সেই বাড়িখানা ঘেরাও করি। বাড়িখানা বিন্ধ্যাচলের এক নামজাদা মোহন্ত রাঘবেন্দ্র গিরির সম্পত্তি ছিল। সেইজন্য তাতে ঢোকবার আগে আমরা তাঁকেও সঙ্গে নিই। তিনি নিজে তারই নিকটবর্তী তাঁর প্রাসাদতুল্য এক বাড়িতে বসবাস করতেন।

আমরা যে বাড়িখানা ঘেরাও করি সেখানে দোতলা ও এক উঁচু পাঁচিল দিয়ে ঘেরা ছিল। আমরা সেই পাঁচিলের এক খোলা দরজা দিয়ে ঢুকে এক কাঁচা প্রাঙ্গণের মধ্যে গিয়ে পড়ি। সেখানে বিস্তর মানুষপ্রমাণ আগাছা দেখতে পাই। প্রাঙ্গণের সামনে একখানা পাকা দালান ও দালানের পাশাপাশি তিনখানা পাকা ঘর ছিল। তেমনি দোতলাতেও তিনখানা ঘর ও একখানা খোলা বারান্দা।

আমরা চারজনে হুড়মুড় করে একটা খোলা দরজা দিয়ে নীচের তলার মাঝের ঘরে ঢুকে পড়ি। সেখানে ঢুকে দেখি তার এক কোণে দড়ির এক খাট পড়ে। খাটের ওপর একটি বালিশ একখানি স্তোত্রের বই ও একটি খদ্দরের টুপি। টুপির মধ্যে আবার রিভলবারের কয়েকটা গুলি। তখন স্পষ্ট বোঝা গেল আমরা যাকে খুঁজছি সে এইমাত্র তার রিভলবার হাতে পালিয়েছে ও আশে-পাশে কোথাও লুকিয়ে আছে। ব্যাপারটা যে সঙ্গীন সেই আমার প্রথম উপলব্ধি হয়। উত্তেজনায় আমার গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে।

ঠিক সেই ব্রাহ্ম মুহূর্তটিতে মোহন্ত রাঘবেন্দ্র গিরি সেখান থেকে কেটে পড়েন। আমরা বাদ বাকি তিনজন তৎক্ষণাৎ স্ব-স্ব রিভলবার খাপ থেকে বার করে মুঠোর মধ্যে নিয়ে ও সেই অবস্থায় হন্তদন্ত হয়ে এ-ঘর সে-ঘর ছুটে বেড়াই।

আমার মনে তখন এক মাত্র চিন্তা এই বুঝি লোকটা আড়াল থেকে তার গুলি চালাল। আশ্চর্যের বিষয় লোকটার কোন সাড়াশব্দ পাওয়া গেল না। সুতরাং আমাদের মনে দৃঢ় বিশ্বাস জন্মায় সে নিশ্চয় সিঁড়ি দিয়ে ওপর তলার ঘরে উঠে গেছে। আমরাও তখন নিজেদের ভাববার সময় না দিয়ে হুড়মুড় করে একসঙ্গে সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠে যাই। এখন বুঝি কাজটা অসমসাহসিক হয়েছিল। যেতে যেতে আমার বুক ধড়াস ধড়াস করছিল। আমি কেবল ভাবছি আজ তার হাতে আমাদের তিনজনের মধ্যে একজনের মৃত্যু নিশ্চিত। এবারও কিন্তু আমাদের কপাল জোরে সেরকম কিছু ঘটল না। তারপর আমরা যখন বাড়ির ওপর নীচ কোথাও লোকটাব চিহ্ন মাত্র দেখতে পেলুম না, তখন আমাদের বিস্ময়েং সীমা থাকে না।

ঠিক সেই মুহূর্তে নীচের প্রাঙ্গণের দিক থেকে প্রচণ্ড গুলির শব্দ আমাদের কানে যায়। আমি ছাদের ওপর থেকে সেদিকে উঁকি মেরে দেখি এক টুকরো ক্ষীণ ধোঁয়ার রেখা উঠানের আগাছার মধ্যে থেকে আকাশের দিকে ভেসে চলেছে। লোকটাকে চ্যালেঞ্জ করা সত্ত্বেও যখন তার কোন সাড়াশব্দ পাওয়া গেল না তখন তার কাছে গিয়ে দেখা গেল সে উপুড় হয়ে মরে পড়ে আছে। লোকটার কুস্তিগীরের মত শরীর। পরনে শুধু এক ল্যাঙট। সর্বাঙ্গে তেল চকচক্ করছে। তার ডান হাতের মুঠোর মধ্যে সে তখনও তার রিভলবার ধরে। তার বুকের ঠিক মধ্যেকার এক ছিদ্র থেকে ফোঁটা ফোঁটা রক্ত গড়িয়ে পড়ছে। বেশ বোঝা গেল পালাতে না পেরে সে আত্মহত্যা করেছে।

পরে লোকটাব আঙুলের ছাপ নিয়ে ফিংগার প্রিণ্ট ব্যুরোয় পাঠিয়ে তাব নাম ধাম জানা যায়। আসলে সে ছিল রায়বেরেলি জেলার বাসিন্দা। কিছু দিন সে সেনা বিভাগে কাজ করে। বিদেশ থেকে ফেরার পর সে একবার ১০৯ ধারায় এক বছর সশ্রম কারাদণ্ড ভোগ করে। কেন যে সে আত্মহত্যা করতে গেল কেনই বা সে ওই ভাবে অজ্ঞাতবাস করছিল সেটা শেষ পযন্ত হেঁয়ালীই রয়ে গেল। তবে অনুমান মোহন্ত রাঘবেন্দ্র গিরি নিজের কোন কাযসিদ্ধির উদ্দেশ্যে তাকে পুষে রেখেছিলেন। সে যে দিগ্‌গজ সিং নয় তাতে আমরা বিশেষ ক্ষুণ্ণ হই। উপরন্তু জগন্নাথ সিং-এর হত্যাকাণ্ডের যে কোন মীমাংসা হল না তাতে আমাদের কম ক্ষোভ হয়নি। তবে পুলিশের অনেক মামলাই যে সাক্ষ্যের অভাবে ভেস্তে যায় সেটা নতুন কিছু নয়।

একটি রাত

উন্নাও থেকে মাইল চল্লিশেক দূরে এক গ্রামে আছে এক বর্দ্ধিষ্ণু পরিবারের বাস। একদিন আমি এক বিশ্বস্ত সূত্রে খবর পাই সেই রাতে তাদের বাড়ি একদল বরযাত্রী বিস্তর ধন দৌলত নিয়ে কানপুর থেকে এসে পৌছাবে। সেই বরযাত্রীদের ধনদৌলত লুঠ করতে কানপুরেরই এক সশস্ত্র ডাকাতের দল প্রস্তুত আছে। আমি তখন উন্নাও-এ কাজ করি। খবর পেযে আমি কিছু লোকজন সঙ্গে নিয়ে রাত ৮টা নাগাদ চুপিচুপি উন্নাও থেকে রওনা হই। আমাদের গন্তব্য স্থানের কাছাকাছি পৌছে খোঁজ নিয়ে জানতে পারি বরযাত্রীর দল গ্রামের বাইরে এক আমবাগানে তাদের ক্যাম্প ফেলে রয়েছে।

আমি যে রাতের কথা বলছি সেটা অমাবস্যার কাছাকাছি অন্ধকার রাত ছিল বলে আমাদের কিছুটা সুবিধে হয়। আমরা অলক্ষিতে পা টিপে টিপে আমবাগানের অনেকটা কাছ পর্যন্ত অগ্রসর হতে সক্ষম হই। দূর থেকেই দেখতে পাই ক্যাম্পের চারধারে কয়েকটা গ্যাসের বাতি জ্বলছে ও আমবাগান আলোয় আলো হয়ে রয়েছে। মজা এই যে যদিও আমরা বরযাত্রীদের প্রত্যেককে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি, তারা কিন্তু আমাদের মোটেই দেখতে পাচ্ছে না। আমরা আমবাগান থেকে শ'খানেক গজ ব্যবধান রেখে তার চারধারে এমন এক ব্যূহের সৃষ্টি করলাম যাতে ডাকাতের দল তার বাইরে পালাতে না পারে। কাজটা সারা হল রাত ১১টায়।

তারপর প্রথমটা কিছুক্ষণ ধরে আমরা বেশ একটু উত্তেজনা অনুভব করছিলাম। আমাদের মানসিক ও স্নায়বিক অবস্থা তখন এমন যে পাতার মর্মর বা

বাতাসের সন্‌সনানি বা যৎসামান্য খুটখাট্ শব্দ কানে গেলেই আমাদের সর্বাঙ্গে কাঁটা দিয়ে ওঠে। আমরা কেবলই ভাবছি এই বুঝি ডাকাতের দল এসে পড়ল। কিন্তু যখন ঘণ্টা তিনেক ওই ভাবে কেটে যায় অথচ তাদের চিহ্নমাত্র দেখা যায় না তখন আমাদের সব আশা ও উৎসাহ যেন উবে যায়। আমাদের তখন এক-মাত্র চিন্তা কখন ভোর হবে যাতে আমাদের এই দুর্ভোগের অবসান হয়।

ভোর হতে না হতেই এক অভিনব দৃশ্য আমার চোখে পড়ে। আমি দেখি যে আমার দলের সেপাইরা প্রস্তর মূর্তির মত তাদের লাল পাগড়ি মাথায় চক্রাকারে দাঁড়িয়ে। অনেকটা এক বৃহৎ রক্তজবার মালার মত। আর একটি জিনিস আমার চোখে পড়ে। আমি দেখছি বরযাত্রীর লোকগুলো লোটা হাতে তাদের নিত্যকর্ম সারতে যেই সেপাইদের ব্যূহ ভেদ করতে তাদের পা বাড়িয়েছে অমনি সেপাইরা তাদের ধরে নিজেদের পাশে বসিয়ে রাখছে। তারা স্বপ্নেও ভাবেনি তাদের এভাবে আটক পড়তে হবে।

বলা বাহুল্য সূর্যোদয় হবার সঙ্গে সঙ্গে আমার দলবল আমি একত্র করে বাড়িমুখো হই।

সমস্ত রাত চোখের পাতাটি পর্যন্ত না ফেলে আমি যখন বাড়ি ফিরছি তখন মনে মনে কেবলই বলছি, হা কপাল একেই বলে লাভস লেবার লস্ট।

দুর্দান্ত লল্লু

আর একদিন উন্নাও-এ থাকতে রাত ১০টা নাগাদ যখন আমি শুতে যাচ্ছি তখন থানা অচলগঞ্জ থেকে এক স্পেশাল রিপোর্ট পেলাম। তাতে লেখা ছিল সেদিন সকালের দিকে লল্লু পন্সরিয়া ও তার ভাই হরিরাম ২০/২৫ জন লোকসহ জিউনাথপুর গ্রামে চড়াও হয়ে রামনাথ ও সুখরাম দুই ভাইকে বন্দুকের গুলিতে খুন করেছে ও তাদের মৃতদেহ সরিয়ে ফেলেছে। আমার জানা ছিল লল্লু এতই দুর্দান্ত প্রকৃতির লোক যে তার অত্যাচারে বহু লোক অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে। তাই আমি এই খবরটা পাওয়া মাত্র গোটা চারেক সশস্ত্র সেপাই সঙ্গে নিয়ে ঘটনাস্থলের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়ি।

ঘটনাস্থলে তদন্তের ফলে আমি মোটামুটি জানতে পারি রামনাথ ও সুখরামের বাড়ির লাগোয়া এক বড় মহুয়া গাছ ছিল। গাছটা শুকিয়ে যাওয়াতে তারা সেটাকে কাটিয়ে নিজেদের কাজে লাগাবার ব্যবস্থা করছিল। সেই খবর পেয়ে লল্লু ও তার ভাই হরিরাম কতকগুলো লাঠিয়ালসহ সেখানে উপস্থিত হয় ও এ-সম্বন্ধে তাদের ঘোর আপত্তি জানায়। তখন দুই দলের মধ্যে কিছু বচসাও হয়। রামলাল ও সুখরাম বেগতিক দেখে তাদের বাড়ির ভেতর ঢুকে দরজায় খিল দিয়ে দেয়। তারপর তাদের বাড়ির ছাদ থেকে তারা বিপক্ষ দলের উদ্দেশ্যে গালি বর্ষণ করে। সেটা লল্লুর অসহ্য বোধ হয়। সে তখন তার বন্দুক রামনাথের দিকে লক্ষ্য করে চালায়। সেইমত হরিরামও সুখরামের দিকে লক্ষ্য করে তার বন্দুক চালায়। ফলে সুখরাম তৎক্ষণাৎ মারা যায় ও রামনাথ মরণাপন্ন হয়। লল্লু তখন এক মই যোগাড় করে ও তাদের বাড়ির ছাদের ওপর উঠে যায়।

রামনাথ তখন তার মায়ের কোলে মাথা রেখে ছট্‌ফট্‌ করছে ও তার মা তার মুখে জল ঢালছে। লল্লু তার দেহ তার মার কোল থেকে নির্মমভাবে ছিনিয়ে নেয়। তারপর দেহ দুটো সে নীচে ঠেলে ফেলে দেয়। গ্রামের লোকেরা তখন ভয়ে কাঁটা। তারা শুধু হাঁ করে লল্লু ও হরিরামের কার্যকলাপ দেখছে। লল্লু মৃতদেহ দুটো খড় চাপা দিয়ে এক গরুর গাড়ি করে তার কয়েকজন বিশ্বস্ত লোকের হেফাজতে পাচার করে দেয়। তা ছাড়া সে গ্রামের চারধারে সন্ধ্যা পর্যন্ত পাহারা বসিয়ে দেয় যাতে সেখানকার কেউ থানায় গিয়ে ঘটনার কোন খবর না দিতে পারে।

রামনাথ ও সুখরামের বাড়ির ছাদের ওপর স্থানে স্থানে আমি রক্তের ছাপ দেখতে পেলাম। আমার এই তদন্তে ঘণ্টা দেড়েক লেগে যায়। তারপর আমি লল্লু ও তার ভাইকে গ্রেপ্তার করতে পন্‌সরিয়া যাই। রাত তখন ১টা। তাদের বাড়ি গিয়ে দেখি তারা যেন আমারই অপেক্ষায় সেজে গুজে বসে। লল্লুর কপালে লাল চন্দনের টিপ, মুখে পান। পরনে তার আদ্দির কুর্তা ও ধপধপে ধুতি। তাকে দেখে আমার বেশ একটু রাগ হল। আমি ভর্ৎসনার সুরে এই হত্যাকাণ্ডের জন্য তার কৈফিয়ত চাইলে সে হেসেই উড়িয়ে দিলে। সে বললে তার শত্রুরা তাকে মিথ্যা ফাঁসাবার জন্য ওই রকম এক জাল পেতেছে। আমি দেখি লোকটা পাজির পাঝাড়া তাই আর বৃথা বাক্যব্যয় না করে তার ও তার ভাইয়ের হাতে হাতকড়ি পরিয়ে থানার হাজতে পাঠিয়ে দিই। তারপর আবার আমি জিউনাথপুর ফিরে যাই ও সেখানে বসে এই ঘটনার সাক্ষী সাবুদ কয়েকদিন ধরে সংগ্রহ করি।

আমার আর এক কাজ হল মৃতদেহ দুটোর খোঁজ লাগানো। কাজটা খুবই জরুরি ছিল কারণ সে দুটো না পাওয়া গেলে আমি জানতাম আমাদের সব পরিশ্রমই পণ্ড হবে। সেই খোঁজে আমার লোকেদের আমি চতুর্দিকে পাঠাই। ফলে যে সব খবর আমি প্রথমদিকে পেলাম তাতে আমার মাথা গুলিয়ে যাবার উপক্রম। কেউ বলে গরুর গাড়িখানা উত্তর দিকে যেতে দেখা গেছে, কেউ বলে দক্ষিণ দিকে। এইভাবে দিন তিনেক বিফলে কেটে যাওয়ার পর একজন সঠিক খবর দেয় যে সেটাকে ঘটনাস্থল থেকে মাইল দশেক দূরে গঙ্গার তীরে এক জায়গায় দেখা গেছে। আমি সেখানে গিয়ে লক্ষ্য করি গাড়ির চাকার চিহ্ন বালির ওপর তখনও স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। মৃতদেহ দুটোকে যে নিঃসন্দেহে ওই চিহ্নের কাছাকাছি জলে ফেলা হয়েছে সেটা আমি ধরে নিই ও স্থানীয় দারোগাকে আবশ্যকীয় নির্দেশ দিয়ে সদরে ফিরে যাই।

তিন দিন ধরে বহু লোক লাগিয়েও যখন মৃতদেহ দুটোর পাত্তা পাওয়া গেল না তখন আমি পরের রবিবার দিন সে দুটোর খোঁজ করবার ব্যবস্থা করি। এমনিতেই গঙ্গার জলে হাতড়ালেই মৃত মানুষের হাড়গোড় পাওয়া স্বাভাবিক। তাই আমি পাড়ে বসে সমানে দেখছি কেউ বা মানুষের ঠ্যাং কেউ বা হাত আর কেউ বা মাথার এক খুলি তুলে ধরছে। দৃশ্যটা বীভৎস লাগবার কথা, কিন্তু সেদিকে আমার তখন মোটেই খেয়াল ছিল না।

ঘণ্টা দুয়েক ধরে এমনি করে বিফল চেষ্টার পর আমাদের দলের একজন জলের ধারে একটা কলসির ভেলা দেখতে পায়। খোঁজ নিয়ে জানা গেল ভেলা নিকটবর্তী গ্রামের কয়েকজন লোকের। তারা সেটা চড়ে মাঝ গঙ্গায় চড়ার ওপরকার তাদের ক্ষেত দেখতে যায়। তখন তাদের ডেকে পাঠানো হয় যদি বা তারা আমাদের ইপ্সিত শবদেহের সম্বন্ধে কোন পাকা খবর দিতে পারে। আমাদের প্রশ্নের উত্তরে তারা কিন্তু সাফ জবাব দেয়। তা দেখে এক মুসলমান দারোগার বুদ্ধিতে তাদের গঙ্গার জলে দাঁড় করিয়ে শপথ নিতে বলা হয়। প্রথমটা তারা হাঁ না কিছুই বলে না। তারপর যখন তাদের চেপে ধরা হয় তখন তারা যা কিছু দেখেছিল তা স্বীকার করে।

লোকগুলো বলে একদিন যখন তারা নদীর অপর পারে তাদের ক্ষেতের দেখাশোনা করছিল তখন একখানা গরুর গাড়ি নদীর এপারে এসে দাঁড়ায়। আগন্তুকরা গাড়ির ভেতর থেকে এক শবদেহ বার করে। একজন তার দুটো হাত ধরে আর একজন দুটো পা। তারপর সেটাকে তারা বার কয়েক শূন্যে দোলা দিয়ে তীর থেকে কয়েক হাত দূরে জলে ছুঁড়ে ফেলে। সেই মত তারা আর একটা শবদেহও জলে নিক্ষেপ করে। ওই দুটো দেহের মধ্যে থেকে একটাকে আবার তারা জলে নেমে লাঠি দিয়ে ঠেলে দেয় যাতে সেটা সহজে জলে ভেসে চলে যায়। যখন আগন্তুকরা সেখান থেকে চলে যায় তখন এরা সেখানে গিয়ে দেখে তীরের খানিকটা জল রক্তাক্ত হয়ে আছে। সেটা দেখে এদের মনে ভয় ঢোকে ও এরা স্থির করে এই ঘটনার ব্যাপারে কোন উচ্চবাচ্য না করাই শ্রেয়।

ঘটনার বৃত্তান্ত শুনে আমাদের লোকেরা দ্বিগুণ উৎসাহে সন্ধানের কাজে লেগে যায়। ফলে তারা প্রথমে রামলালের ও পরে সুখরামের মৃতদেহের কাঠামো জল থেকে হাতড়ে উদ্ধার করতে সমর্থ হয়। রামলালের মাথার খুলিতে এক ফুটো ছিল। তার কোমরের ঘুন্সিতে বাঁধা তার কুঠুরির একটা চাবিও পাওয়া যায়। সুখরামের কঙ্কালের সঙ্গে জড়ানো একখানি ধতি পাওয়া যায় যেটা ঘটনার সময় তার পরনে ছিল।

কথায় বলে সবুরে মেওয়া ফলে। এক্ষেত্রেও ঠিক তাই ঘটে। শব দুটো পোষ্টমর্টেম পরীক্ষার জন্য পাঠানো হয়। পরদিন পরীক্ষার সময় আমি সেখানে উপস্থিত থাকি। পোষ্টমর্টেম ব্যাপারে ওই আমার প্রথম ও শেষ অভিজ্ঞতা। ওয়ার্ড বয় রামলালের খুলি করাত দিয়ে কাটে ও তার মস্তিষ্কের ভেতর হাতড়ে কয়েকটা শিসের টুকরো বার করলে আমার আনন্দের সীমা থাকে না। যদিও যে পচা গন্ধ তখন বেরুচ্ছিল সেটা প্রায় অসহ্য। এমন কি সেই দুর্গন্ধ আমার নাকে কয়েকদিন পর্যন্ত লেগে ছিল।

মোটকথা মামলা আদালতে গেলে পুলিশের দিক থেকে সাক্ষ্যের কোন অভাব হয়নি। লখনউ চিফ কোর্টের বিচারে লল্লু ও হরিরামের ফাঁসির এবং অন্যান্য আসামীদের সশ্রম কারাদণ্ডের শাস্তি হয়। এ সূত্রে স্থানীয় পুলিশের যে বিপুল জয়ধ্বনি করা হয় তা সাধারণতঃ দেখা যায় না। লল্লু কিরূপ দুর্দান্ত প্রকৃতির লোক ছিল ও তার অত্যাচারে তার প্রতিবেশীরা কতদূর অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল তা এই স্বতঃস্ফূর্ত জয়ধ্বনি থেকে স্পষ্ট বোঝা যায়।

মহাত্মা গান্ধীকে মাল্যদান নিয়ে বিভ্রাট

১৯৩৩ সালের গান্ধী-আরউইন প্যাক্ট ও ১৯৪২ সালের কুইট ইণ্ডিয়া আন্দোলনের মধ্যে বছর দশেকের যে ব্যবধান সে সময়ে আমাদের দেশে ভারত সরকারের বিরুদ্ধে প্রায় সব রকম রাজনৈতিক আন্দোলন চাপা পড়ে। তার এক প্রধান কারণ ছিল কংগ্রেসীদের মধ্যে মতভেদ, যেজন্য তারা এক দোটানায় পড়েছিল। তাদের এক দলকে নরমপন্থী ও অন্য দলকে চরমপন্থী বলা চলে।

নরমপন্থী দলের লোকেরা এক শান্তিময় নিষ্পত্তির স্বপক্ষে ছিল। চরমপন্থী দলের লোকদের মত তার ঠিক উল্টো ছিল। তাদের মধ্যে আবার অনেকে গা ঢাকা দিয়ে তলে তলে দেশজোড়া এক বিদ্রোহের ফিকিরে ছিল। আবার তাদেরই অনুপ্রেরণায় এখানে সেখানে এক আধটা বিপ্লবসূচক ধ্বংনার অবতারণা হয়। যেমন একদিন কানপুর রেলওয়ে স্টেশনে হাওড়া কালকা মেল আসার ঠিক পরেই এক টাইম বম্ব ফাটে, যার দরুন এক রেল যাত্রী ও এক স্থানীয় ফেরিওয়ালা প্রাণ হারায়। সেইমত আর এক টাইম বম্ব আলিগড় স্টেশনে ফাটে যার ফলে এক রেলওয়ে কর্মচারী নিহত হয়। সেইসময় আবার উত্তর প্রদেশে রেলওয়ে মেল ভ্যান লুট হয় যাতে বিপ্লবীদের হাত ছিল।

আমাদের দেশের ওই পরিস্থিতির মধ্যে মহাত্মা গান্ধী কখনওবা জেলের ভিতর আবার কখনওবা জেলের বাইরে। আবার অবসর মত তিনি তাঁর কাজে এখানে সেখানে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। যদিও তিনি সে সময় সরকারের সুনজরে ছিলেন না তবু এ দেশের লোকেদের মধ্যে তাঁর প্রতি এমন প্রগাঢ়

শ্রদ্ধা ছিল ও তাঁর খ্যাতি এতটা ছড়িয়ে পড়েছিল যে, তাঁকে দর্শন করতে বা তাঁর বক্তৃতা শুনতে হাজার হাজার লোক বহু দূর থেকে এসে জুটতো। কেউ বা পায়ে হেঁটে আবার কেউ বা যানবাহনের সাহায্যে। সুতরাং সে সময় শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য যথোচিত বন্দোবস্ত করার দরকার হত।

একবার মহাত্মা রেলে করে কানপুর থেকে লখনউ যান। পথে তাঁর গাড়ি অজগয়ন স্টেশনে দাঁড়ায়। আমি তখন উন্নাও-এর পুলিশ সুপার। আমার নির্দেশমত অজগয়ন স্টেশনে পুলিশ মোতায়েন করানো হয়। গাড়িখানা নির্বিঘ্নে চলে যাবার কয়েকদিন বাদে আমি প্রাদেশিক সি-আই-ডির বড়কর্তা মিঃ আর. এ. হর্টনের কাছ থেকে এক চিঠি পাই। তাতে লেখা ছিল অজগয়ন স্টেশনে মহাত্মার গাড়িখানা যখন থামে তখন সেখানকার দারোগাকে গান্ধীজীর গলায় ফুলের মালা পরিয়ে দিতে দেখা গেছে। সুতরাং আমি যেন উক্ত দারোগার বিরুদ্ধে যথোচিত ব্যবস্থা গ্রহণ করি।

চিঠিখানা পেয়ে আমি ত অবাক। প্রথমত অজগয়নের দারোগার কাজে আমি বিশেষ সন্তুষ্ট ছিলাম। দ্বিতীয়ত গান্ধীজীকে মালা পরানো আমার চোখে কোন দোষের মধ্যে গণ্য ছিল না। অন্যদিকে আমি দেখি যদি তার বিরুদ্ধে এক্ষেত্রে আমি কোন শাস্তির ব্যবস্থা না করি তাহলে আমি নিজে তৎকালীন শাসকদের কুনজরে পড়বো ও ভবিষ্যতে আমার সমূহ ক্ষতি হতে পারে। আমি ভেবে চিন্তে ঠিক করি একবার অজগয়ন স্টেশনে গিয়ে দেখেই আসি না কেন ব্যাপারটা আসলে কি ঘটেছিল। তাই আমি সেইদিনই নিজের গাড়ি হাঁকিয়ে অজগয়ন স্টেশনে যাই ও স্থানীয় রেলকর্মচারীদের একে একে উক্ত ঘটনার বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করি।

জিজ্ঞাসাবাদে প্রকাশ পায় মহাত্মা যেদিন অজগয়ন হয়ে যান সেদিন বহু সংখ্যক লোক তাঁকে দর্শনের জন্য সেখানে উপস্থিত ছিল। গান্ধীজী তাঁর নিয়ম-মত তৃতীয় শ্রেণীর এক কামরায় প্ল্যাটফর্মের দিককার জানলার সামনে বসে দর্শকদের অভিনন্দন গ্রহণ করছিলেন। তাঁর হাতে যে এক ঝোলা ছিল সেটা ধরে তাদের কাছ থেকে তাঁর দরিদ্র নারায়ণের সেবার জন্য ভিক্ষা চাইছিলেন। দর্শকদের মধ্যে সকলেই তাঁর কাছে গিয়ে তাদের যৎকিঞ্চিৎ ভিক্ষা তাঁরই হাতে তুলে দিতে বা কাছ থেকে তাঁর দর্শনের জন্য বিশেষ উৎসুক ছিল। তারা এমন করে তাঁর গাড়ির ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ছিল যে তাতে তাঁর বিশেষ অস্বস্তির কারণ ঘটে। তাই দেখে স্থানীয় দারোগা সূরজনারায়ণ তেওয়ারি মহাত্মার সম্মুখবর্তী জানলার দু পাশের দু খুঁটি নিজের দুই হাত দিয়ে শক্ত করে ধরে

দাঁড়ায়। দর্শকরা তখন বাধ্য হয়ে তাদের ফুলের মালা বা ভেট গান্ধীজীকে লক্ষ্য করে ছুঁড়ে দিতে থাকে। মালাগুলোর মধ্যে কয়েকটা সুরজনারায়ণের ঘাড়ে বা মাথায় গিয়ে পড়ে। সে সেগুলোকে গান্ধীজীর হাতে তুলে দেয়। সে যে নিজের হাতে মহাত্মাকে মালা পরিয়েছে সেকথা কিন্তু আমায় কেউ বলল না।

আমি তখন ওই সব লোকেদের জবানবন্দি লিখে আমার মন্তব্যের সঙ্গে হর্টন সাহেবকে পাঠিয়ে দিই। সাহেব নিশ্চয় তাতে খুশী হন নি। তিনি আমার চিঠির উত্তরে লিখে পাঠান তাঁর ঘটনা সম্বন্ধে প্রাপ্ত খবর কোনমতেই ভুল হতে পারে না। তবে তিনি বেশ বুঝছেন আমি ওই দারোগার স্বপক্ষে। হর্টন সাহেবের ইঙ্গিত আমার ভাল লাগেনি তবে মামলার যে ওইখানেই ইতি হয়ে যায় তাতে খুশী হই। বলাই বাহুল্য সে যুগ অন্য ধরনের ছিল। ভারত সরকারের চোখে তখন দেশভক্তি ছিল বিরাট অপরাধ।

ব্রহ্মদৈত্যের দৌরাত্ম্য

উন্নাও থাকতে শুভকরণ সিং নামের এক ছোকরা সেপাই আমার অধীনে কাজ করত। একদিন বিকেল ৩টে নাগাদ আমার বাসার বাইরে আমি এক কোলাহল শুনে ব্যাপারটা জানতে বাইরে বেরিয়ে এসে দেখি এক ব্যক্তি আমার বাসার লাগোয়া পাকা রাস্তা দিয়ে ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটে চলেছে। তার হাতে একগাছি লাঠি ও পরনে ধুতি যার খানিকটা মাটিতে লুটোচ্ছে। তার মুখ থেকে সমানে এক গোঙানি বেরুচ্ছে ও তাকে ধরতে কয়েকজন সেপাই তার পেছনে ছুটছে। লোকটা যখন ধরা পড়ে তখন তারা সকলে মিলে তাকে পুলিশ লাইনে নিয়ে যায় ও তার মাথায় খুব করে জল ঢালে। তার ফলে সে যদিও কিছুটা শান্ত হয় তবু তার হতজ্ঞান ভাবটা যায় না।

আমি পুলিশ লাইনে গিয়ে দেখি লোকটা শুভকরণ সিং। কেন যে তার ওই রকম অবস্থা হল কেউ বলতে পারে না। তার চিকিৎসা অবিলম্বে দরকার মনে করে আমি স্থানীয় সিভিল সার্জন ডাক্তার ব্রহ্মস্বরূপকে ডেকে পাঠাই। তিনি এসে তাকে একটি ইন্‌জেকৃশন দেন। সে ঘুমিয়ে পড়ে। সেই অবসরে তাকে পুলিশ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। আমি আমার বাসায় ফিরে আসি।

তারপর রাত ৮টা নাগাদ যখন আমি শুভকরণকে দেখতে পুলিশ হাসপাতালে যাই তখনও তার অবস্থার কোন পরিবর্তন ঘটে নি। আমি দেখি তার চোখ কপালে উঠে গেছে ও মুখ থেকে ফেনা বেরুচ্ছে। পরদিন সকালে যখন আমি

তাকে আবার দেখতে যাই তখন শুনি তার মাঝে মাঝে ওই রকম ফিট হচ্ছে ও কিছুতেই কিছু হচ্ছে না। তার অসুখের খবর পেয়ে তার বাড়ির কয়েকজন লোক এসে পড়ে ও বলে নিশ্চয় তার মাথায় কোন ভূত ভর করেছে। তার চিকিৎসা একমাত্র ওঝার ঝাড়ফুঁক করা দরকার। তাদের পরিচিত এক ওঝাকে তারা ডেকেও আনে। লোকটার নাম ছিল জানকি।

সেদিন রাত ৮টা নাগাদ আমি পুলিশ হাসপাতালে গিয়ে দেখি শুভকরণ অজ্ঞান অবস্থায় পড়ে ও তার সর্বাঙ্গ কাঠের মত শক্ত হয়ে আছে। জানকি তার পাশে বসে অনেককিছু মন্ত্র আওড়াচ্ছে কিন্তু কিছুমাত্র ফল হচ্ছে না। এইভাবে বেশ খানিকক্ষণ কাটবার পর মনে হল যেন শুভকরণ জানকির প্রশ্নের উত্তরে কিছু বলবার চেষ্টা করছে। কিন্তু সেটা যে কি তা মোটেই বোঝা যাচ্ছে না। ক্রমশঃ তার কথাগুলো একটু একটু করে স্পষ্ট হওয়ায় মনে হল যেন কোন প্রেতাত্মা ভারি গলায় শুভকরণের মুখ দিয়ে সেগুলো বলছে। শুনে আমার গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠলো। তারপর থেকে কিছুক্ষণ ধরে জানকি ও সেই প্রেতাত্মার মধ্যে যা কথাবার্তা হয় তার মর্ম অনেকটা এরকম :

জানকি : আমি আপনার কাছে অনেকক্ষণ ধরে অনুনয় বিনয় করছি। আপনি কে সেটা স্পষ্ট করে বলুন ও এই বেচারাকে রেহাই দিন।

প্রেতাত্মা : আমি কে তা কিছুতেই বলবো না। তোমার যা ইচ্ছে কর। আমি যে সে লোক নই। আমি শুনেছি তুমি নাকি বড় গুণিন। দেখি তোমার কতটা গুণ আছে।

জানকি : আপনি মিছিমিছি আমার ওপর রাগ করছেন। আমি এক অতি সাধারণ ব্যক্তি। আপনি যে-কেউ হন হিন্দু বা মুসলমান আমার সেলাম গ্রহণ করুন।

প্রেতাত্মা : তুমি নিজেকে মস্ত এক জহুরি মনে কর। দেখিই না তোমার কতটা বহর? আমি তোমায় কিছুতেই বলবো না আমি কে।

জানকি : আপনাকে কে বলেছে আমি মস্ত জহুরি। আমি আপনার কাছে হাত জোড় করে বলছি, আপনি নিজেকে ব্যক্ত করুন যাতে আমরা আপনার কাছে পূজার সামগ্রী পৌঁছে দিতে পারি।

প্রেতাত্মা : আমি ব্রহ্মা (ব্রাহ্মণের প্রেতাত্মা)।

জানকি : নিন্ তাহলে আমি আপনার পা ছুঁচ্ছি। এখন বলুন আপনি কি চান। এই লোকটাই বা আপনার কাছে কি দোষ করেছে যার জন্য আপনি তার ওপর নারাজ হয়ে আছেন?

প্রেতাত্মা : ও বেটা আমায় গালি দিত। আমি ওকে ছেড়ে কোন মতেই যাবো না।

জানকি : তাও কি হয়? ওর ওপর দয়া করুন। ও অনেক কর্মফল ভোগ করেছে। আপনাকে খুশি করতে আমরা কি দিতে পারি?

প্রেতাত্মা : আমি কিছুই চাই না।

জানকি : অমন কথা বলবেন না। এই দেখুন আমরা সকলে মিলে এমনকি পুলিশ সাহেব ও সিভিল সার্জন সাহেব পর্যন্ত আপনার ইচ্ছা জানবার জন্য কেমন উৎসুক হয়ে আছি। আপনাকে বলতেই হবে আপনি কি চান।

প্রেতাত্মা : বেশ তাহলে তুমি আমায় চাল কলা দুধ জল চন্দন ও একটা খাটিয়া দিও।

জানকি : বেশ। তাই দেবো। এই লোকটাই ওই সব সামগ্রী আপনার কাছে পৌঁছে দেবে। কিন্তু তার আগে আপনার নাম ও ধাম জানা দরকার।

প্রেতাত্মা : আমায় লোকে ভারি বাবা বলে।

জানকি : আপনি থাকেন কোথায়?

প্রেতাত্মা : তাও তুমি জানো না?

জানকি : আমি কি করে জানবো? আমি যে অকাট মূর্খ। আপনি কি এই লোকটার বাড়ির কাছাকাছি কোথাও থাকেন?

প্রশ্নের উত্তরে প্রেতাত্মাকে যেন বলতে শোনা গেল—

এই লোকটার বাড়ির তিন ক্রোশ পুবে। জানকি তার পুনরাবৃত্তি করাতে সে বিরক্তভাবে বলে উঠল, না-না-তিন ক্ষেত পুবে। তারপর ওই দুজনের মধ্যে আবার যা কথাবার্তা হয় সেটা এরকম :

জানকি : বেশ এই লোকটাই সেখানে গিয়ে আপনার ফরমাইসি সামগ্রী পৌঁছে দেবে।

প্রেতাত্মা : বেশ। তাহলে আসছে শনিবার দিন জিনিসগুলো এই লোকটা দিয়ে আসুক। তখন আমি এর ঘাড় থেকে নামবো।

জানকি : আমি আপনাকে অনুরোধ করছি আপনি বেচারার ওপর দয়া করুন। আপনার বলা জিনিসগুলো নিশ্চয় আপনার কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হবে। সেটা আমি এইসব গণ্যমান্য লোকেদের সামনে আপনাকে শপথ করে বলছি।

প্রেতাত্মা : বেশ।

জানকি : আপনাকে সেটা তিনবার বলতে হবে।

প্রেতাত্মা : কেন ? তুমি কি আমার কথার ওপর বিশ্বাস কর না ?

জানকি : না তা নয়। আপনি আমায় ভুল বুঝবেন না।

প্রেতাত্মা : এই নাও আমি বলছি, ছাড়লাম ছাড়লাম ছাড়লাম।

জানকি : আপনি তাহলে এই লোকটাকে তার পায়ের ওপর দাঁড় করিয়ে দিন।

(কথাটা বলার সঙ্গে সঙ্গে জানকি শুভকরণ সিং-এর মাথায় এক হাল্কা টোকা মারে ও তাকে উঠে দাঁড়াতে বলে। সেটা বলামাত্র শুভকরণ সিং ধড়্‌ফড়্‌ করে উঠে দাঁড়ায় ও ফ্যাল্‌ ফ্যাল্‌ করে সকলের দিয়ে চায়। এখানে বলা দরকার জানকিকে একই প্রশ্ন বার বার করতে হয় তার কোন জবাব পেতে—।

উপরোক্ত বার্তালাপের সঙ্গে সঙ্গে শুভকরণ সিং-এর শারীরিক অবস্থার পরিবর্তন ঘটতে দেখা গেল। গোড়ার দিকে সে সংজ্ঞাহীন ছিল ও তার সমস্ত শরীরে মোচড় দিচ্ছিল। তারপর থেকে ক্রমশঃ সে ভাবটা যায় ও তার জ্ঞান ফিরে আসে। সে যখন উঠে দাঁড়ায় তখন তার ভাবগতিক দেখে মনে হল সে যেন ঘুম থেকে এই মাত্র উঠেছে।

এই ঘটনার দু-একদিনের মধ্যেই ভারি বাবাকে আমাদের প্রতিশ্রুতিমত তিনি যা যা চেয়েছিলেন সে সব বস্তু পাঠিয়ে দেওয়া হয়। আমি যত দূর জানি তারপর থেকে শুভকরণ সিং-এর আর কোন ফিট্‌ হয়নি। সে কিন্তু তার চাকরিতে আর ফেরেনি।

যদিও এই ঘটনার পর বহু দিন কেটে গেছে এর কোন হদিশ আমি আজ পর্যন্ত পাইনি। অনেকে হয়ত বলতে পারেন এর মূলে অটোসজেসান্‌ ভিন্ন আর কিছুই ছিল না। আমার কাছে কিন্তু তা বিশ্বাসযোগ্য নয়। কারণ যেসব কথা শুভকরণ সিং-এর মুখ থেকে বেরুচ্ছিল সে তার সম্পূর্ণ অযোগ্য ছিল। তাছাড়া তার গলার স্বরই বা কি করে অমন বিকৃত ধরনের হয় ? এইসব দেখেশুনে কেবল মনে হয় ভৌতিক জগৎ সম্বন্ধে আমরা কিই বা জানি ?

সাধো সিং-এর পঞ্চত্ব প্রাপ্তি

উত্তর প্রদেশের ডাকাতদের মধ্যে মানসিং, গিরন্দ সিং ও সুলতান এককালে সবচেয়ে কুখ্যাত ছিল। তাদের নামে লোকে তখন ভয়ে কাঁপত। মানসিং-এর পেশা ছিল পয়সাওয়ালা লোকেদের বা তাদের উত্তরাধিকারিদের ধরে নিয়ে যাওয়া ও তাদের রেহাই দেবার বিনিময়ে দশ বিশ হাজার টাকা আদায় করা। তবে তার এক গুণ ছিল। সে গরীব লোকেদের টাকা বা জামা কাপড় দিয়ে সাহায্য করত। সেজন্য সাধারণ লোকে তাকে রাজা মানসিং বলে জানত।

গিরন্দ সিং বা সুলতান কিন্তু নির্মম প্রকৃতির লোক ছিল। তারা ডাকাতির সঙ্গে সঙ্গে অনেক খুনখারাপিও করত। একবার ত গিরন্দ সিং এক গ্রামে ঢুকেই সাতচল্লিশটি অসহায় ও নিরপরাধ লোককে গুলি করে মারে। প্রায় তাদেরই মত আর এক ডাকাত গোঁডা জেলায় জন্মায় যার নাম ছিল অম্বিত। তার বিশেষত্ব ছিল যখনই সে কোথাও গিয়ে পৌছাত তখন বুক ঠুকে হুঙ্কার দিয়ে বলত "ময় অম্বিত হুঁ" যাতে লোকে ভয় পেয়ে যায়।

আমি উপস্থিত যার কথা বলতে যাচ্ছি তার হাতেখড়ি অম্বিতের কাছেই হয়। তার নাম ছিল সাধো সিং ওরফে অযোধ্যা সিং। সেও তার ওস্তাদের অনুকরণে কোথাও ডাকাতি করার জন্য পৌছানো মাত্র বুক ঠুকে বলত "ময় সাধো সিং হুঁ"। অল্পদিনের মধ্যেই সে তার নাম-ডাকে অম্বিতকেও ছাড়িয়ে যায়। সে যে শুধু ডাকাতিই করত তা নয়। মাঝে মাঝে সে লোকেদের কাছ থেকে মোটা টাকা নিয়ে তাদের শত্রুদের হত্যা করত।

যখন আমি ফয়জাবাদে ছিলাম তখন প্রথমবার সাধো সিং-এর সংস্পর্শে

আসি। তার কার্যক্ষেত্র বেশীর ভাগ সরযূ নদীর উত্তরে বস্তী গোঁডা ও বহরাইচ জেলায় ছিল। তবে কখন কখন সে সরযূ নদীর দক্ষিণে ফয়জাবাদ জেলাতেও দেখা দিত। আমি একদিন আমার অফিসে বসে কাজ করছি এমন সময় স্থানীয় ছাউনির দারোগা আমায় এসে খবর দেয় সাধো সিংকে নাকি সেইদিনই সকালের দিকে অযোধ্যার উত্তরে সরযূ নদীর চড়ার ওপরকার এক কুঁড়ে ঘরে বসে থাকতে দেখা গেছে। আমি সেই রাতেই সেখানে হানা দেওয়া ঠিক করি। সেই উদ্দেশ্যে রাত ১২টার সময় ২০।২৫ জন পুলিশ কর্মচারী মিলে গুপ্তার পার্কে জড়ো হই। পার্কটা সরযূ নদীর গুপ্তারঘাটের পাশে যেখান থেকে নাকি শ্রীরামচন্দ্র অন্তর্ধান হন।

সরযূ নদীতে তখন বন্যার জল এসে গেছে। তাতে ওই অবস্থায় মাঝরাতে পার হওয়া সোজা কথা ছিল না। আমাদের কপালগুণে আমরা একখানা বড় নৌকা পার্কের পাশেই বাঁধা দেখতে পাই।

আমাদের নৌকা যখন ছেড়ে দেয় তখন চাঁদের আলো চারধারে ছড়িয়ে পড়েছে। আমাদের মুখে চমৎকার ঝিরঝিরে বাতাস এসে লাগছে। তাই আমাদের ভয় কেটে গিয়ে মনে হচ্ছিল আমরা যেন এক স্বপ্নরাজ্যের মধ্যে দিয়ে ভেসে চলেছি। আমরা স্রোতের অনুকূলে যাচ্ছিলাম বলে আমাদের নৌকা ওপারের তীরে গিয়ে ভিড়তে দেখি আমাদের গন্তব্য স্থান থেকে আমরা অনেক নীচের দিকে চলে এসেছি। আমরা তখন সেখানেই নেমে পড়ি ও উল্টোদিকে হাঁটা শুরু করি।

আমাদের প্রায় মাইলখানেক পথ যাওয়ার ছিল। কিন্তু রাতের অন্ধকারে ওই পথটুকু পেরিয়ে যেতে আমাদের অনেক বেগ পেতে হয়েছিল। পথটা সামনে ঝাউবন দিয়ে ঢাকা ছিল। তাছাড়া বর্ষার সূত্রপাত হয়ে যাওয়ায় পথে অনেক ছোট বড নালার সৃষ্টি হয়ে গেছিল। আমরা যখন বন বাদাড় বা কোথাও কোথাও জলের মধ্যে দিয়ে ছপ্ ছপ্ করতে করতে চলেছি তখন আমার কেবলই ভয় লাগছিল এই বুঝি আমাদের কাউকে সাপে ছোবল মারল। এক আধবার ত আমাদের চোখের সামনে একাধিক সাপ ঝাউ গাছের ডগা থেকে সপাৎ করে জলে ঝাঁপিয়ে পড়ছিল। আমাদের ওই রাতের যাত্রা শুধু ওই কারণে ভোলবার নয়।

যখন আমাদের গন্তব্য স্থানের কাছাকাছি আমরা এসে পৌঁছাই তখন আর এক বিভ্রাট ঘটে। আমাদের সঙ্গে যে পথপ্রদর্শক ছিল সে হঠাৎ বেঁকে বসল। বলল সে আর এক পাও এগোবে না। তার ভয় ছিল যদি সাধো সিং তাকে

দেখে ফেলে তাহলে নিশ্চয় বন্দুকের গুলিতে তাকে হত্যা করবে। অথচ সে আমাদের সঙ্গে না থাকলে নয়। তাই আমাদের দলের দুই জোয়ান সেপাই তাকে চ্যাং দোলা করে নিয়ে চলল।

হা আমাদের কপাল! আমরা যেখানে সাধো সিংকে দেখতে পাবো বলে আশা করেছিলাম সেখানে দেখি সব ভোঁ ভাঁ। পরে জানা গেল সে ওই রাতে নিকটবর্তী এক গ্রামে ডাকাতি করতে গেছিল। অগত্যা আমরা মনের দুঃখে বাড়িমুখো হই। রাত তখন ৩টে।

আমাদের হানা দেবার ফলে সাধো সিং তার ঠাঁই ছেড়ে ফয়জাবাদের সীমানায় পালিয়ে আসে। তারই দিন তিনেকের মধ্যে ফয়জাবাদ শহরের কাছাকাছি এক গ্রামে ভীষণ এক হত্যাকাণ্ড হয়। তাতে দুজন লোক পর পর বন্দুকের গুলিতে নিহত হয়। একজন ছিল রাজা অযোধ্যার জিলেদার যে তার খাজনা আদায় করত। অন্য জন ছিল তাঁরই এক পেয়াদা। তারা দুজনে রাজারই কাজে এসেছিল ও তাঁর স্থানীয় কাছারি বাড়িতে উঠেছিল।

কাছারি বাড়ির পেছনদিককার দেয়ালে এক ঘুলঘুলি ছিল। দেখা গেল হত্যাকারী সেখান থেকে কিছু ইঁট সরিয়ে সেটাকে বেশ বড় করেছে। তারপর সেই ইটগুলোর ওপর দাঁড়িয়ে ঘুলঘুলির ফাঁক দিয়ে তাক্ করে তার বন্দুক চালিয়েছে। সে সময় জিলেদার সবে তার আহার শেষ করে শুতে যাচ্ছিল। তার পেয়াদা উনুনের সামনে বসে রুটি সেঁকছিল। রাত তখন ৯টা। হঠাৎ এক বন্দুকের গুলি এসে পেয়াদার মাথার খুলিতে লাগে। সে যখন বাপ্ বাপ্ করে চিৎকার করে ওঠে তখন জিলেদার লণ্ঠন হাতে তাকে দেখতে আসে ও সেও বন্দুকের আর এক গুলিতে নিহত হয়।

ঘটনা যে কোন পাকা হাতের কাজ সেটা হত্যার ধরন দেখেই বোঝা যায়। তাছাড়া ঘটনা যে রাজা অযোধ্যার সঙ্গে শত্রুতার ফলে হয়েছে তাতেও বিন্দুমাত্র সন্দেহ রইল না।

তদন্ত করে জানা গেল খুব সম্ভব এই হত্যাকাণ্ডের পেছনে জংবাহাদুর সিং নামের এক লোক আছে যার রাজা অযোধ্যার সঙ্গে জমিজমা নিয়ে কিছুদিন ধরে মামলা মোকদ্দমা চলছিল। জংবাহাদুর সিংকে সন্দেহ করার আর এক কারণ তলে তলে সাধো সিং-এর সঙ্গে তার যোগ ছিল।

এই ঘটনা সম্বন্ধে যখন জংবাহাদুর সিং-এর ওপর চাপ দেওয়া হয় তখন প্রথমটা সে কিছু গুঁইগাঁই করে। কিন্তু যখন সে দেখে তার পুলিশের হাত থেকে আর কোনমতে রেহাই নেই তখন সে সাধো সিংকে ধরিয়ে দেবার

প্রতিশ্রুতি দেয়। সে বলে যদি আমরা তার সঙ্গে আমাদের কোন বিশ্বস্ত লোক দিই তাহলে সেই লোকের সঙ্গে সে সাধো সিং-এর পরিচয় করিয়ে দিতে পারে। তারপর সেই লোকের কাজ হবে সাধো সিংকে ধরিয়ে দেওয়া। আমরা তখন শের বাহাদুর সিং নামের এক সেপাইকে ছদ্মবেশে জংবাহাদুর সিং-এর সঙ্গে পাঠাই।

ফয়জাবাদ শহর থেকে মাইল চারেক দূরে এক বিরাট আম বাগান ছিল। সেটা অনেকদিন ধরে যত্নের অভাবে বন-বাদাড় হয়ে দাঁড়িয়েছিল। সেইখানেই এক পোড়ো ঘরের মধ্যে সাধো সিং তখন লুকিয়ে বাস করত। একদিন সন্ধ্যার পর শের বাহাদুরকে সঙ্গে নিয়ে জংবাহাদুর সেখানে যায়। তারপর সে এক সাঙ্কেতিক শিস্ দেয়। সেটা শুনে সাধো সিং বন্দুক হাতে অন্ধকার ভেদ করে বেরিয়ে আসে। শের বাহাদুরকে দেখামাত্র সে চমকে ওঠে ও জানতে চায় লোকটা কে। তখন জংবাহাদুর তাকে বুঝিয়ে বলে তোমারই মত এ আর এক পলাতক। যদি তুমি একে তোমার সঙ্গে রাখো ত তোমারও সুবিধে হবে এরও হবে। তারপর জংবাহাদুর সিং শের বাহাদুরকে খুব করে জেরা করে। শের বাহাদুর তার জন্য আগে থেকেই প্রস্তুত ছিল। তাই সে কোনরকম দ্বিধা না করে তার প্রশ্নের ফটাফট উত্তর দেয়। ফলে তাকে সাধো সিং নিজের আশ্রয়ে রেখে দেয়।

এ ক্ষেত্রে শের বাহাদুর তার সাহসের য পরিচয় দেয় তার তুলনা হয় না। যদি সাধো সিং ঘুণাক্ষরেও টের পেত সে পুলিশের লোক তাহলে তাকে নিঃসন্দেহে কুকুরের মত গুলি করে মেরে ফেলত।

শের বাহাদুরের সঙ্গে আমাদের কথা ছিল নির্দিষ্ট দিনে বেলা টা নাগাদ সাধো সিং যখন তার মধ্যাহ্ন ভোজন শেষ করে ঘুম দেবে তখন সে সেই খবরটা আমাদের এনে দেয়। আমরা কাছেই আর এক আমবাগানে লুকিয়ে তার জন্য অপেক্ষা করবো। তাকে আরও বলা ছিল যদি পারে ত সে যেন সাধো সিংকে কিছু ধেনো মদ খাইয়ে রাখে যাতে সে সহজেই ঘুমিয়ে পড়ে।

সেইমত নির্দিষ্ট দিনে সাধো সিং যেখানে তার অজ্ঞাতবাস করছিল আমরা ক'জন ছদ্মবেশে তারই কাছাকাছি আর এক আমবাগানে গিয়ে শের বাহাদুরের অপেক্ষায় বসে থাকি। প্রথমটাতে আমাদের মন্দ লাগছিল না। তারপর যেমন যেমন সময় যেতে লাগে—আমাদের চিন্তাও বাড়তে থাকে।

বেলা ১টার কিছু পরেই শের বাহাদুর খালি গায়ে ও ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে আমাদের সামনে এসে হাজির হয়। সে বলে, সাধো সিং বিশেষ সন্ত্রস্ত হয়ে

আছে। মদ খেতে সে মোটেই রাজী নয়। বলছে আমি আজ ওসব ছোঁবো না। আমার বাম চোখ নাচছে। আমার জন্য আজকের দিনটা ভাল নয়। তুমি এখন যাও তবে যাবার আগে তোমার কুর্তাটা এখানে ছেড়ে যাও। আমি আমার বাপকে বিশ্বাস করি না। তুমি কোন্ ছার। আমি তাহলে নিশ্চিন্ত থাকবো তোমার কুর্তার পকেটে কোন অস্ত্রশস্ত্র আনছ না। তোমার যাবার পর আমি এই বনের মধ্যে কোথাও গিয়ে শুয়ে পড়বো। সেটা আগে থেকে আমি তোমায় জানাতে চাই না।

শের বাহাদুরের মুখে এইসব কথা শুনে আমি ত প্রমাদ গণি। কিন্তু তার পরমুহূর্তেই আমার মাথায় এক বুদ্ধি খেলে। সেই মত আমি তাকে বলি, তুমি যাও, সাধো সিংকে গিয়ে বল চল আজই রাতের গাড়িতে আমরা বম্বে পালিয়ে যাই। আমার বিশ্বাস আমাদের পেছনে পুলিশ লেগেছে। তাই আমাদের আর এখানে থাকা মোটেই নিরাপদ নয়। যদি তোমার কথায় সে রাজী হয় তবে স্টেশনে যাবার অছিলায় তুমি একখানা টাঙ্গা জোগাড় করে রেখো। ইতিমধ্যে আমরা তোমাদের স্টেশনে যাবার পথে এক পোলের আশে-পাশে লুকিয়ে থাকবো। তারপর যখন তোমাদের টাঙ্গা সেখানে এসে পৌছবে তখন আমরা তাকে ঘিরে ফেলবো যাতে সাধো সিং আর পালাবার পথ না পায়।

যেখানে সাধো সিং লুকিয়ে ছিল সেটা ঘেরাও করতে বহু লোকের দরকার হত। তাছাড়া তার পক্ষে আমাদের গণ্ডী ভেদ করে আমাদের অলক্ষ্যে উধাও হয়ে যাওয়া মোটেই শক্ত ছিল না। আরও একটা সম্ভাবনা ছিল। আমাদের তাকে দেখার আগেই সে নিশ্চয় আমাদের দেখে ফেলত ও সেক্ষেত্রে সে ছেড়ে কথা কইবার মত লোকই ছিল না। এই সব ভেবেচিন্তে আমি ঠিক করি সে যেখানে ছিল তাকে সেখানে ঘেরাও না করাই ভাল।

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হবার পর আমরা সাধো সিং-এর স্টেশনে যাবার পথে যে পোল ছিল তারই আশে-পাশে ঘাপটি মেরে বসে থাকি। তার প্রায় ঘণ্টাখানেক বাদে যখন রাত ৯টার কাছাকাছি, তখন দেখি আমাদের অপেক্ষিত টাঙ্গা মন্থর গতিতে আমাদের দিকে এগিয়ে আসছে। আমার উত্তেজনার তখন আর সীমা ছিল না। টাঙ্গাটা পোলের ওপর এসে পড়লে আমি ধড়্‌মড়্‌ করে উঠে মাঝ রাস্তায় দাঁড়িয়ে তাকে আটক করি। সেই সঙ্গে আমার টর্চের আলো তার ওপর ফেলি। ওই আলো ফেলামাত্র আমি টাঙ্গার পেছনের দিকে এক অগ্নিরেখা দেখি ও সেই সঙ্গে এক বন্দুকের আওয়াজ শুনতে পাই। আমি তৎক্ষণাৎ আমার টর্চের আলো নিবিয়ে দিই পাছে সেই আলো লক্ষ্য করে

আমায় কেউ গুলি করে। তারপর বন্দুকের আরো দুটো আওয়াজ পর পর হয়।

অন্ধকারে আমি তখন কিছুই বুঝতে পারছি না কি হল বা না হল। কে মরল বা কে বাঁচল। মিনিট খানেকের জন্য সব চুপচাপ মেরে যায়। ওই সময়টুকু কেটে যাবার পর আমি যখন ঘটনাস্থলে যাই তখন দেখি একজন সম্পূর্ণ অচেনা লোক পাকা রাস্তার মাঝে চিৎ হয়ে পড়ে খাবি খাচ্ছে। কয়েক সেকেণ্ড যেতে না যেতেই তার প্রাণবায়ু বেরিয়ে যায়। তখন আমার দলের সকলে এসে তাকে ঘিরে দাঁড়ায়। দেখা গেল লোকটা লম্বা ছিপছিপে, রং কালো, দাঁত উঁচু, গাল তোবড়ানো। তার সমস্ত শরীরে বসন্তের দাগ। গলায় এক কার্টিজের বেল্ট ঝোলানো, পাশে একটা দোনলা বন্দুক ও পাঁচ সেলের টর্চ পড়ে। তার ডান হাতের কব্জির নীচে উল্কি দিয়ে ইংরাজিতে বড় বড় অক্ষরে লেখা সাধো সিং। লোকটার আকৃতি থেকে তার প্রকৃতির অনেকটা পরিচয় পাওয়া যাচ্ছিল।

পরে ঘটনার সম্বন্ধে তদন্ত করে জানা যায় লোকটা যখন দেখতে পায় পুলিশ চারিদিক থেকে ঘিরে ফেলেছে তখন টাঙ্গা থেকে তড়াক করে লাফিয়ে গুলি চালায়। সৌভাগ্যক্রমে গুলি বিফল যায়। সেই সঙ্গে সাব ইন্সপেক্টর যমুনাপ্রসাদ ও কনস্টেবল গুলমহম্মদ তাকে গুলি করে ও সে তৎক্ষণাৎ ধরাশায়ী হয়।

সাধো সিং যে মানুষের আকারে এক জন্তুবিশেষ ছিল তাতে সন্দেহ নেই। তার মৃত্যুতে অনেকেই হাঁফ ছেড়ে বাঁচে।

শের বাহাদুর তার বীরত্বের জন্য পুরস্কারস্বরূপ কিংস পুলিশ মেডেল পায়। আমিও সেই সঙ্গে ইণ্ডিয়ান পুলিশ মেডেল পাই।

বশীরের অধঃপতন

আমি যে-সাধো সিং-এর কথা লিখলাম সে অনেকটা বাপে খেদানো মায়ে তাড়ানো গোছের ছিল। বশীর ঠিক তার উল্টো ছিল। তার জন্ম হয় শাহজাহানপুরের এক অবস্থাপন্ন পাঠান পরিবারে। সে তার বাপ মায়ের একমাত্র সন্তান। বাল্যকালেই বশীরের বাপ মারা যাওয়ায় সে কুসঙ্গে পড়ে। তা ছাড়া সে রোহিল্লা বংশজাত ছিল বলে তার পূর্বপুরুষদের মত অল্প বয়স থেকে তারও কাজ হল লুটপাট করা। রোহিল্লারাই মোগল সাম্রাজ্য ধ্বংস হবার পর উত্তর প্রদেশের পশ্চিমাংশে ছোট ছোট রাজ্যের অধিকারী হয়ে বসে।

১৯৪৯ সালে বশীর তার গ্রামের একটি মেয়েকে বিবাহ করতে চায়। তার নাম ছিল সবিরা। সেই সূত্রে সে মেয়েটির বাপ জল্লু খাঁর সঙ্গে দেখা করে। বশীর দেখতে সুপুরুষ ও অন্য সব দিক থেকেও সুপাত্র, তাই জল্লু সহজেই এ বিবাহে তার সম্মতি দেয়। কথায় বলে স্বভাব যায় না মলে, বশীরও তেমনই তার বিবাহ হওয়া সত্ত্বেও তার চুরি ডাকাতির অভ্যাস ছাড়তে পারে নি। এক ডাকাতির মামলায় ধরা পড়ে তার সাত বছরের কারাদণ্ড হয়। ডাকাতি করে সে শাহজাহানপুরের এক নহরের বাঙলোয়। লক্ষ্মীনারায়ণ নামে এক ওভরসিয়ার সেই ডাকাতিতে তার বিরুদ্ধে আদালতে সাক্ষ্য দেয়।

বশীর কিন্তু সে পাত্রই ছিল না যে অতদিন ধরে জেলের গণ্ডির ভেতর চুপ করে বসে থাকবে। কিছুদিন যেতে না যেতেই সে জেলের কর্মচারীদের কিছু

টাকা খাইয়ে সেখান থেকে পালিয়ে যায় ও লুকিয়ে বেড়ায়। তাই মধ্যে সে একদিন জল্লু খাঁর সঙ্গে দেখা করে ও বলে তুমি সবিরাকে আমার হাতে তুলে দাও। জল্লু খাঁ কিন্তু ইতিমধ্যে টাকার লোভে সবিরার বিবাহ আর এক পাত্রের সঙ্গে ঠিক করে রেখেছিল। সে লোকটার নাম ছিল ছোটে শা। তাই জল্লু খাঁ কিছু গুঁইগাঁই করে। বশীর তার মতলবটা বুঝতে পেরে তাকে গুলি করতে যায়। সে তখন ভয়ে বশীরের কথায় রাজী হয়। সবিরাও তাতে খুশী হয় ও তার পর থেকে বশীরের জীবদ্দশায় তাদের কখনও ছাড়াছড়ি হয় না।

সবিরাকে ফিরে পাওয়া সত্ত্বেও ছোটে শাহের ওপর বশীরের রাগ কিন্তু যায় না। তাই একদিন রাতের অন্ধকারে সে ছোটে শাহের বাড়ির বাইরে ঘাপ্‌টি মেরে বসে থাকে ও তাকে দেখতে পাওয়া মাত্র গুলি করে হত্যা করে।

এই হত্যাকাণ্ডের পর বশীর দেখে ভবিষ্যতে তার অজ্ঞাতবাস ভিন্ন উপায় নেই। তাই সে সস্ত্রীক তরাই-এর জঙ্গলে আশ্রয় নেয়। সে দেখল সেখানে তার ধরা পড়বার সম্ভাবনা খুবই কম অথচ তার পক্ষে মাঝে মাঝে আশে পাশের গ্রামে গিয়ে লুটতরাজ করা সহজ।

বশীরের দলে তার স্ত্রী ছাড়া আরও চারজন লোক ছিল। সে লোকগুলো তার কথায় উঠত বসত। সব ডাকাতিতে সবিরাও পুরোদস্তুর অংশ নিত। উত্তরপ্রদেশে পুরুষ ডাকাত অনেক দেখা গেছে বটে কিন্তু সবিরার মত মেয়ে ডাকাত খুব কমই দেখা গেছে। সে তার স্বামীর সঙ্গে সমানে ঘুরে বেড়াত। কখনো হেঁটে কখনো বাই সাইকিলে আবার কখনো বা এক টাট্টু ঘোড়ার পিঠে বসে। তার সম্বন্ধে সে সময় অনেক আজগুবি গুজব রটে। একবার ত লখনউ-এর এক কাগজে বেরিয়েছিল তাকে নাকি মেমসাহেব সেজে লখনউ-এর হজরতগঞ্জে সিগরেট ফুঁকতে দেখা গেছিল। আসলে কিন্তু সে ছিল সাধারণ গ্রাম্য মেয়ের মতই যদিও তাদের তুলনায় চটক্ ছিল একটু বেশি।

জেল থেকে পালাবার পর বশীর সমানে লক্ষ্মীনারায়ণ ওভরসিয়ারের ওপর শোধ তোলবার ফিকিরে ছিল। একদিন সে দলবল সহ আবার সেই নহরের বাঙলোয় যায় যেখানে এককালে লক্ষ্মীনারায়ণ থাকত। কিন্তু ইতিমধ্যে সে বদলি হয়ে অন্যত্র চলে গেছিল বলে বশীর বিফল মনোরথ হয়ে ফিরে আসে। পরে লক্ষ্মীনারায়ণের খোঁজ পেয়ে তার বাড়িতে ঢুকে তার এক পাঁচ বছরের ছেলেকে গুলি করতে উদ্যত হয়। ছেলেটির মা তখন তাকে আড়াল করে দাঁড়ালে সবিরা কোন গতিকে বশীরকে নিরস্ত করতে সক্ষম হয়।

একদিন বশীর ও তার স্ত্রী জঙ্গলের মধ্যে এক রেললাইন ধরে যাচ্ছিল। পথে একদল কুলি মজুরদের সঙ্গে তাদের দেখা হয়। তাদের মধ্যে থেকে একজন আধজন সবিরাকে লক্ষ্য করে রসিকতা করে। বশীর তাতে তাদের ওপর বেজায় খাপ্পা হয় ও শাস্তিস্বরূপ তাদের কাছ থেকে মোট ৩৫০ টাকা আদায় করে। এই ঘটনা থেকে বশীরের নির্ভীকতার যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়।

আর একদিনের কথা। জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে যেতে যেতে বশীরের এক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির সঙ্গে দেখা হয়। লোকটির নাম ছিল ভারত সিং। বশীর তাকে জোর করে নিজের আড্ডায় নিয়ে যায় ও তাকে দিয়ে তার পিতা রায়বাহাদুর দর্শন সিংকে চিঠি লেখায় যাতে তিনি পত্রপাঠ ৩০০০ টাকা পাঠিয়ে দেন। দর্শন সিং সেই টাকা লোক মারফত পাঠিয়ে দেবার পর ভারত সিং ছাড়া পায়।

বশীর সম্বন্ধে আর এক ঘটনা: পিলিভিত জেলার জঙ্গলের মধ্যে মিসেস্ আলেকজাণ্ডার নামে এক মহিলা চাষবাস করতেন। তাঁর এক পুত্র সৈন্য-বিভাগে কাজ করত। একদিন সে তার ব্যারিস্টার বন্ধুর সঙ্গে বাড়ি আসে। ওই সময় বশীর একদিন মাঝ রাতে সেখানে উপস্থিত হয় ও বলে দরজা খোল। মিসেস্ আলেকজাণ্ডার তাতে আপত্তি করায় সে বলে ব্যারিস্টার সাহেবের সঙ্গে তার কিছু কথা আছে। ভদ্রলোক বাড়ির বাইরে এলে বশীরের সঙ্গীরা তাঁকে ধরে জঙ্গলের মধ্যে নিয়ে যায়। মিসেস্ আলেকজাণ্ডার তাই দেখে বাড়ির সদর দরজা খুলে দিতে বাধ্য হন। বশীর ও তার সাথীরা বাড়ির ভেতর ঢুকে তাদের মনের সাধে লুঠপাট করে ও অনেক কিছু মায় কয়েকটা অস্ত্রশস্ত্রও হাতিয়ে নেয়।

বশীর যখন এই উপদ্রব করে বেড়াচ্ছিল তখন পুলিশ যে হাত গুটিয়ে বসেছিল তা নয়। যেসব অঞ্চলে তার উপস্থিতির সম্ভাবনা, সেই সব অঞ্চলে বিস্তর সশস্ত্র পুলিশ তার খোঁজে ব্যস্ত ছিল। এক আধবার ত সে নিজের কপালগুণে ধরা পড়তে পড়তে বেঁচে যায়। জঙ্গলের মধ্যে সে আজ এখানে কাল সেখানে, তাই তাকে ধরা সহজ ছিল না। একবার খবর পেয়ে একদল পুলিশ রাতারাতি জঙ্গলের ভেতর দিয়ে মাইল দশেক যাওয়ার পর দেখে যে, সেইমাত্র সমস্ত মাল পত্তর ফেলে সে পালিয়েছে, এমনকি রাঁধা ভাত পর্যন্ত। ওই সব মাল পত্তরের মধ্যে চার বোঝা শুধু চোরাই মাল। তা ছাড়া ছিল একটি বন্দুক ও একটি টাট্টু ঘোড়া, যার পিঠে স্বয়ং সবিরা ঘুরে বেড়াতো।

আর একবার পুলিশের এক সশস্ত্র গার্ড গ্রামের মধ্য দিয়ে যেতে যেতে

দেখতে পায় এক ব্যক্তি গ্রামের পুকুর পাড়ে বসে স্নানের উদ্যোগ করছে। তাকে উজ্জ্বল গৌরবর্ণ দেখে সন্দেহক্রমে তার নাম ধাম জানতে চায়। বশীর তৎক্ষণাৎ উঠে তার সঙ্গী সাথীসহ এক আখের ক্ষেতের মধ্যে ঢুকে পড়ে। গার্ডের সঙ্গী এক সাহসী ছোকরা সেপাই তখন এগিয়ে গিয়ে তাকে ধরতে যায়। তাই দেখে সবিরা বশীরের হাত থেকে তার বন্দুক ছিনিয়ে নিয়ে সেই ছোকরা সেপাইকে গুলি করে। বেচারা সেইখানেই মারা যায়। তার সঙ্গীদের তখন ভয়ে হাত পা অসাড় হয়ে যায়। সেই অবসরে বশীর ও তার সঙ্গীরা ছুটে পালায়। পুলিশের পক্ষে এটা নিশ্চয় এক বিশেষ লজ্জাকর ঘটনা।

এই সব ঘটনা সত্ত্বেও বশীর একটার পর একটা লুঠপাট বা ডাকাতি করেই চলেছিল। একবার সে ডাকাতি করার পর সেই বাড়িতে আগুন লাগিয়ে দেয়। ফলে সমস্ত গ্রামখানাই পুড়ে ছাই হয়ে যায়।

আর একবার সে এক মহাজনের বাড়ি লুঠ করে। সে লক্ষ্য করেছিল বাড়ির দারোয়ানেরা সবাই ভোর হতেই তাদের নিত্যকর্ম সারতে এধার ওধার চলে যায়। তাই সে সময় বুঝে সেখানে গিয়ে উপস্থিত হয় ও বিস্তর জিনিস লুঠ করে।

বশীরের উপদ্রবের বিষয় নিয়ে কাগজে অনেক লেখালিখি হয়েছিল। তাকে ধরার ব্যাপারটা এতই জরুরি হয়ে দাঁড়ায় যে, একজন ডি আই জি পুলিশের অধীনে সহস্রাধিক পুলিশ ওই কাজে লাগে। বশীরও বেশ বুঝতে পেরেছিল তার দিন ঘনিয়ে এসেছে। তাই সে তার পুরাতন সব আড্ডা ছেড়ে সরযূ নদীর উত্তরে নেপালের সীমানায় এক জায়গায় গিয়ে আশ্রয় নেয়। সেই খবরটা পাওয়া মাত্র ইন্সপেক্টর অজহর হুসেন মুষ্টিমেয় সেপাই সঙ্গে নিয়ে যাত্রা করেন ও সমস্ত রাত জঙ্গলের ভেতর দিয়ে যাবার পরের দিন ভোরে সেখানে উপস্থিত হন। বশীর তখন সবে ঘুম থেকে উঠেছে। সে যে মুহূর্তে তার বন্দুক চালাতে উদ্যত হয়, সেই মুহূর্তে ইন্সপেক্টর হুসেনের গুলি তাকে বিদ্ধ করে ও তৎক্ষণাৎ সে মারা যায়।

বশীরের সাথীদের মধ্যে দুলারেও নিহত হয়। সবিরা ও আরো দুজন পালিয়ে যায়। ধরা পড়ার পর তাদের প্রত্যেকের সাত বছর করে কারাদণ্ড হয়।

১৯১২ সালের ২০শে মার্চ বশীরের মৃত্যু হয়। অর্থাৎ তাকে কুপোকাৎ করতে প্রায় তিন বছর লেগে যায়।

চতুর রামদাস

এক-আধটা লোক সমানেই জেল বা নজরবন্দী থেকে পালাতে থাকে। কিন্তু তার বড় একটা আলোচনা শোনা যায় না যদি না সে কোন বিখ্যাত ব্যক্তি হয়। সকলেরই জানা আছে কবে ও কি করে ছত্রপতি শিবাজী তার রক্ষকদের চোখে ধুলো দিয়ে কারাগার থেকে পালান। যেখানে মোগল বাদশাহ তাঁকে বন্দী করে রেখেছিল। তেমনি কে না জানে কিভাবে সুভাষচন্দ্র বসু গত মহাযুদ্ধের সময় তাঁর এলগিন রোডের বাসভবন থেকে (যেখানে তিনি নজরবন্দী ছিলেন) পালিয়ে জার্মানি যান। ওই ওদেরই আর এক ব্যক্তি যিনি পালিয়ে করাচি যান ও যা নিয়ে আমাদের দেশে এক হুলুস্থুল লেগে যায় তিনি ছিলেন হায়দরাবাদের প্রধান মন্ত্রী লায়েক আলি। জনসাধারণের মধ্যে কিন্তু কারুরই জানা নেই কী কৌশলে টাণ্ডাবাসী রামদাস ফয়জাবাদ জেল থেকে পালায়! যদিও লোকটা তার বুদ্ধিমত্তার যা পরিচয় দেয় তাতে অন্যদের তুলনায় সে কিছু কম যায় না।

রামদাসকে একদিন টাণ্ডার দারোগা আমার সামনে এনে হাজির করেন। সে গা ঢাকা দিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছিল বলে ১০৯ ধারায় তাকে চালান দেওয়া হয়। আমার সামনে তাকে আনার কিন্তু অন্য এক কারণ ছিল। সে কথা দিয়েছিল যদি তাকে টাণ্ডা নিয়ে যাওয়া হয় তবে সে তার ভাগের কিছু চোরাই মাল দাখিল করতে প্রস্তুত। তার কথামত আমি তাকে টাণ্ডা নিয়ে যাই। কিন্তু সেখানে পৌঁছে সে আমাদের ভাওতা দেবার চেষ্টা করে। অবশেষে তার ১০৯ ধারায় এক বছরের কারাদণ্ড হয় ও আমি তার কথা ভুলে যাই।

কিছুদিন যাবার পর আমি খবর পাই সে নাকি সত্যাগ্রহ করে জেলের ভেতরকার এক আমগাছের মাথায় চড়ে বসে আছে, কিছুতেই নামছে না। তার বক্তব্য জেলর সাহেব নাকি তাকে বিনা দোষে চড় মেরেছেন। সে কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে সুবিচার চায়। সে তার গলায় এক ফাঁস লাগিয়ে শাসিয়ে রেখেছে যদি কেউ গায়ের জোরে তাকে ধরে নামাবার চেষ্টা করে তবে সে ফাঁস-সুদ্ধ গাছ থেকে ঝুলে আত্মহত্যা করবে। কাজেকাজেই অনেক সাধ্য-সাধনা করা সত্ত্বেও সে যখন তার উচ্চাসন থেকে নামতে রাজী হল না তখন তাকে ওই ভাবেই ছেড়ে দেওয়া যুক্তিসঙ্গত মনে করে যে যার কাজে লেগে যায়। ফলে সে নিশ্চিন্ত মনে পুরো একটি দিন ও একটি রাত হঠযোগী সন্ন্যাসীর মত ওই গাছের মাথার ওপরেই কাটায়। তারপর নেমে এলে জেলর সাহেব তাকে শাস্তিস্বরূপ রাতে এক কুঠরীতে একা বন্ধ রাখার ব্যবস্থা করেন।

কিছুদিন বাদে আমি খবর পাই রামদাস জেল থেকে পালিয়েছে। খবরটা পেয়ে আমি সেখানে যাই ও দেখি তার কুঠরির বাইরের দিককার এক দেয়ালে ফুট দেড়েক প্রশস্ত এক গর্ত হাঁ হয়ে রয়েছে। সেই গর্ত থেকে যা ইট বেরিয়েছে সেগুলো সে তার শোবার জায়গাটিতে সাজিয়ে রেখেছে। সেই ইটের ওপর আবার তার পরনের ধুতিখানা এমনভাবে ঢেকে রেখেছে যে দূর থেকে দেখলে মনে হয় লোকটা যেন সেখানে শুয়ে ঘুম দিচ্ছে।

রামদাস যে কুঠরিতে রাতে থাকত তার একদিক ছিল ফাঁকা। অন্যদিকে সার সার আরও পাঁচখানা কুঠরি ছিল। প্রত্যেক কুঠরিতে সামনের দিকে একটা করে লোহার গরাদ দেওয়া দরজা ছিল। গরাদের ফাক দিয়ে কুঠরির ভেতরটা স্পষ্ট দেখা যেত। ওই ক'টা কুঠরির বাইরে এক টুকরো খোলা জমি ছিল ও সবকিছু ঘিরে ফুট সাতেক উঁচু এক পাঁচিল ছিল। ওইরকম একাধিক ঘেরা জেলের ভেতর ছিল, যাতে এক ঘেরা থেকে অন্য এক ঘেরায় কেউ সহজে যেতে না পারে। আবার সমস্ত জেল ঘিরে ছিল এক বিরাট ফুট বারো উঁচু পাঁচিল।

রামদাস তার কুঠরি থেকে বেরিয়ে তার পাশের কুঠরিতে যে এক বন্দী শুয়ে ঘুম দিচ্ছিল তার মাথার তলা থেকে হাত গলিয়ে এক খণ্ড কাপড়ের টুকরো টেনে বার করে। সেই কাপড়ের টুকরো দিয়ে তার নিজের ধুতির অভাব পূরণ করে। তারপর সে কিছু ইট তার কুঠরির বাইরে যে এক পাঁচিল ছিল তার তলায় সাজিয়ে রাখে ও তারই সাহায্যে সেই পাঁচিল টপকে পার হয়। এইভাবে সে আর এক ঘেরার মধ্যে এসে পড়ে যেখানে এক গুদোম ঘর

ছিল। তারপর সেই গুদোম ঘরের ছাদের ওপর ওঠে এবং সেখান থেকে কয়েকটা টাইল সরিয়ে সে তার ভেতর ঢোকে। ঢুকে সে দুটো মাঝারি সাইজের লগি ও কিছু শনের দড়ি যোগাড় করে। সেই লগি দুটো জুড়ে সে এক ১২।১৩ ফুট লম্বা লগি তৈরি করে ও তারই সাহায্যে অনায়াসে জেলের বড় পাঁচিল টপকে পার হয়। লগিটা সে এক ড্রেনের ভেতর লুকিয়ে ফেলে।

এই সব আবিষ্কার হবার পর কারুর আর বুঝতে বাকি রইল না যে রামদাসের সত্যাগ্রহ এক ছুতো মাত্র ছিল। সে যে জেলের ভেতরকার আম গাছের মাথার ওপর বসে একটি দিন ও একটি রাত কাটায় তাতে সে অনেক কিছু তথ্য আবিষ্কার করে। সেই সময়টিতে সে ভাল করে দেখে নেয় কোথায় কি আছে ও কি ভাবে সে জেলের প্রহরীদের এড়িয়ে পালাতে পারে। আসলে সে নিজের সমস্ত প্ল্যানিং ওই সময়ের মধ্যে করে।

রামদাস তার বুদ্ধির আর এক পরিচয় দেয় যখন সে বলে কয়ে জেলের কারখানায় তার কাজ বাগিয়ে নেয়। সেখান থেকে একদিন সে ইঞ্চিছয়েক লম্বা এক লোহার গজাল সকলের অলক্ষ্যে সরায় ও তারই সাহায্যে রাতের পর রাত তার কুঠরির ইট খসায়। রাত শেষ হবার আগে সেই খসানো ইটগুলোকে সে আবার তাদের স্বস্থানে রেখে দেয়।

রামদাসের জেল থেকে পালাবার পন্থা যেমন অভিনব, তার গ্রেপ্তারও তেমনি মজার ছিল। তার জেল থেকে পালাবার পর আমি স্থির করি সে খুব সম্ভব একবারটি তার গ্রামে ফিরে যাবে। সেখানে দু চার দিন গা ঢাকা দিয়ে থাকার পর এক লম্বা পাড়ি মারবে। তার গ্রামের কাছে সরযূ নদীর এক খেয়াঘাট ছিল। তার পক্ষে সেই ঘাট থেকে নৌকা করে পালানো স্বাভাবিক এই মনে করে দুজন ছদ্মবেশধারী সেপাইকে সেই খেয়াঘাটে লুকিয়ে রাখবার ব্যবস্থা করি।

যেমনটি আমি আশা করেছিলাম হলও ঠিক তেমনটি। রামদাস একদিন সেই খেয়া নৌকায় বসে নদী পার হবার চেষ্টা করে। কিন্তু ঘাট থেকে কিছু দূর যেতে না যেতেই সে পুলিশের হাতে বন্দী হয়। ফলে তার তিন বছরের কারাদণ্ড হয়।

এমনিতে রামদাস দেখতে খুব ভাল মানুষটির মত ছিল। তাই কে বলতে পারত তার পেটে এত বুদ্ধি থাকতে পারে?

এক অন্ধ ফকির

১৯৩৯ সালে একদিন যখন আমি আমার ফয়জাবাদের বাড়িতে বসে তখন আমাদের রিজার্ভ ইন্সপেক্টর মহম্মদ সিদ্দীক আমায় এসে খবর দেন যে আমাদের পুলিশ অস্ত্রাগার থেকে একটি ৩০৩ নম্বর রাইফেল্ চুরি গেছে বলে মনে হচ্ছে। অনেক খোঁজাখুঁজি সত্ত্বেও সেই রাইফেল পাওয়া গেল না। আমি তাকে বলি, আমার তাহলে এ সম্বন্ধে একটি স্পেশাল রিপোর্ট আই জি, ডি আই জি-কে পাঠানো দরকার। মহম্মদ সিদ্দীকের ভয় ছিল হারানো রাইফেল না পাওয়া গেলে তাকে শাস্তি ভোগ করতে হবে। তাই তিনি আমায় আম্তা আম্তা করে বলেন-আপনি যদি আমায় আরো দুদিন সময় দেন ত বড় ভালো হয়। আমি শুনেছি লখনউ-এ এক শাহজী থাকেন যিনি সিদ্ধপুরুষ। আমি একবার তাঁর কাছে আমার ভাগ্য পরীক্ষা করে দেখতাম।

মহম্মদ সিদ্দীকের কথা তেমন কাজের বলে আমার মনে হল না। তবু দুদিন সময় তাঁকে দিলাম। তার দু-একদিন বাদে যখন তিনি শাহজীকে সঙ্গে করে আমার বাসায় এসে সেই হারানো রাইফেল আমার সামনে তুলে ধরলেন তখন আমি অবাক্। আমি দেখি তখনও তাতে কাদা-মাটি লেগে।

ইন্সপেক্টর সিদ্দীকের মুখে শুনি শাহজী লখনউ থেকে আসার পর তাঁর জন্য দশ আনা পয়সার মিষ্টি আনিয়ে দিতে ও এক লোক মারফত তাঁকে কোন জলাশয়ের ধারে পাঠিয়ে দেবার ব্যবস্থা করতে বলেন। মহম্মদ সিদ্দীক সেইমত শাহজীকে গুপ্তার ঘাটে পাঠান। সেখানে পৌছে শাহজী এক ছুরি দিয়ে নিজের

কপাল থেকে কয়েক ফোঁটা রক্ত বার করেন। তারপর সেই রক্ত ও মিষ্টি জলে ফেলে বলেন, "নে তোর জন্যে আমি সবকিছু করলাম। তুই এখন আমার মুখ রক্ষা কর্"। গুপ্তার ঘাট থেকে ফিরে যখন শাহজী লখনউ যাবার উদ্যোগ করছেন, তখন একজন লোক এসে খবর দেয়, হারানো রাইফেল পুলিশ লাইনের সামনে এক পোলের তলায় পাওয়া গেছে।

আমি ভেবে দেখলাম খুব সম্ভব যে লোক রাইফেলটাকে মাটিতে পুঁতে রেখেছিল সে শাহজীর দ্বারা কোন তুক্‌তাকের ভয়ে সেটাকে বার করে দিয়েছে। রাইফেল ফিরে পাওয়াতেই আমি যথেষ্ট সন্তুষ্ট ছিলাম। তাই এ বিষয়ে আর বেশী ঘাঁটাঘাঁটি না করে চুপ করে যাই।

শাহজী এ॰ অন্ধ নিরীহ প্রকৃতির লোক ছিলেন ও তাঁর বয়স ৭০-এর কাছাকাছি। খুব সম্ভব তাঁর সঙ্গে আমার পুনর্বার করে দেখা হত না যদি না স্থানীয় ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ দরের স্ত্রী উপরোক্ত ঘটনার কিছুদিন বাদে তাঁর মুক্তার মালা হারাতেন। মালাটা বেশ দামী ছিল ও সেটা পরে তিনি মহিলা ক্লাবে গিয়েছিলেন। অনেক চেষ্টার পরও সেটা পাওয়া গেল না, আমি সে সম্বন্ধে হাল ছেড়ে দিলাম।

তারপর একদিন আমার ডেপুটি অবদুল রশীদ খাঁ আমায় বলেন এই মামলায় একবারটি শাহজীর সাহায্য নিলে হয় না? কথাটা আমি হেসেই উড়িয়ে দেবার চেষ্টা করি কিন্তু তাতে কোন ফল হয় না। অবদুল রশীদ শাহজীকে আনতে একজন লোক লখনউ পাঠান ও পরদিন দেখি তিনি সশরীরে এসে হাজির।

শাহজীকে হাত ধরে মিঃ দরের বৈঠকখানা ঘরে নিয়ে যাওয়া হলে তিনি সমীহ করে চেয়ারে না বসে মেঝের ওপর বসতে চাইলেন। মেঝে অবশ্য গালিচা দিয়ে মোড়া ছিল। ঘটনার ইতিবৃত্তান্ত তাঁকে বলা হলে তিনি বিনয় করে বলেন সবই খোদাতালার ইচ্ছার ওপর নির্ভর করে। তিনি শুধু তাঁর আবেদন খোদাকে জানাতে পারেন। এই বলে তিনি তাঁর ডান হাতের চেটো মেঝের ওপর পেতে মিসেস্ দরকে তার ওপর তাঁর বাঁ পা রাখতে বলেন। মিসেস্ দর সেই মত তাঁর বাঁ পা শাহজীর চেটোর ওপর রাখার পর শাহজী বলেন, রাণীসাহেবার নাম? মিসেস্ দর বলেন, কমলা। শাহজী তারপর মিনিট খানেকের মত কি যেন চিন্তা করেন ও বলেন আচ্ছা ঘটনার দিন রাণীসাহেবার সঙ্গে মহিলা ক্লাবে যাঁদের সাক্ষাৎ হয় তাঁদের মধ্যে কেহ কি ফালসা রং-এর শাড়ী পরে ছিলেন? মিসেস্ দর একটু চিন্তা করার পর বলেন হাঁ যতদূর আমার মনে পড়ে একটি মহিলা ফালসা রং-এর এক শাড়ী পরেছিলেন।

শাহজী তখন বলেন, "বেশ, রাণীসাহেবা এখন তাঁর পা তুলে নিতে পারেন। তবে আমার অনুরোধ তিনি যেন আমায় তাঁর পরণের একটা জামা বা কাপড় দেন। আমি সেটা নিজের সঙ্গে কোন বিশেষ কাজের জন্য নিয়ে যাবো। তাছাড়া আমায় ১৩ দিন ধরে আমার বাড়ি থেকে গোমতী নদীর পাড় পর্যন্ত কিছু ক্রিয়া-কর্মের জন্য যেতে হবে। সেই সূত্রে গাড়ি ভাড়া বাবদ আমার ১৩ টাকা লাগবে। সেই টাকাটাও আমি চাই।

এই বলে শাহজী লখনউ ফিরে যাবার অনুমতি চাইলেন। তিনি আরও বললেন, রাণীসাহেবা এর পর যদি কোন স্বপ্ন দেখেন ত তার মর্ম যেন আমায় লিখে জানানো হয়, কাজটা অবদুল রশীদ খাঁ করতে রাজী হন।

তারপর কিছুদিন যখন এমনি কেটে যায় তখন আমি এই মুক্তার মালা উদ্ধারের আশা-ভরসা একেবারেই ছেড়েছি। মালা হারিয়েছিল অক্টোবর মাসের কোন এক তারিখে। তার পরের বছর ফেব্রুয়ারি মাসে আমরা ক'জনে মিলে সন্ধ্যার দিকে টেনিস খেলার পর মিঃ দরের বাগানে বসে গল্প-গুজব করছি। মিসেস্ দর তখন আমারই পাশে বসে। আমি তাঁকে রগড় করে জিজ্ঞাসা করি, "আপনি কি ইতিমধ্যে আরও কোন স্বপ্ন-টপ্ন দেখলেন?" তার উত্তরে তিনি বলেন, "হ্যাঁ মিঃ লাহিড়ী আজই বিকেলে আমি যখন বিশ্রাম করছি ও আমার একটু তন্দ্রা এসেছে তখন ঘুমের ঘোরে আমি যেন দেখছি আমার মালী আমার হারানো মুক্তার মালা হাতে ধরে মিল গয়া মিল গয়া বলতে বলতে সোজা আমার দিকে চলে আসছে। আমি আনন্দের চোটে দুই হাত তুলে নাচছি।"

মিসেস্ দরের কথা শেষ হতে না হতে আমার কানে এক মিলিত কণ্ঠের মিল গয়া মিল গয়া রব যায়। সেটা টেনিস কোর্টের অপর পার থেকে আসছিল। আমি সেদিকে চেয়ে দেখি একপাল লোক সোজা আমাদের দিকে চলে আসছে। তাদের মধ্যে যে অগ্রগামী সে একছড়া মালা তার দুহাতে উঁচু করে তুলে ধরে আছে। লোকটা ছিল মিসেস্ দরেরই মালী। আমাদের কাছে পৌঁছান মাত্র সে মালাটি এক ছোট টেবিলের ওপর রেখে দেয়। সেটা যে মিসেস্ দরেরই মালা তাতে কোন সন্দেহ ছিল না। আমি ত কাণ্ড দেখে হতভম্ব হয়ে যাই।

জানা গেল মালাটা মহিলা ক্লাবের মালী, ফুলের এক কিয়ারি পরিষ্কার করতে করতে সেখানে কুড়িয়ে পায়। কি করে যে সেটা সেখানে এসে পৌঁছাল তা আজ পর্যন্ত এক হেঁয়ালিই রয়ে গেছে।

আমার কাছে এই ঘটনার যোগাযোগই বিশেষ করে দ্রষ্টব্য। ওই যে একদিকে মিসেস্ দর তাঁর স্বপ্নের কথা আমায় বলেছেন ও অন্যদিকে তাঁর মালী মালা হাতে সশরীরে আমাদের সামনে এসে হাজির হয় অমন যোগাযোগ ক'টা লোকই বা দেখেছে? ভগবানই জানেন এ বিষয়ে শাহজীরই বা কতদূর হাত ছিল!

ঘরের চোর

লখনউ শহরে এক সম্ভ্রান্ত মহিলা তার এ পি সেন রোডের এক বাড়িতে থাকতেন। মহিলাটি তাঁর এক কন্যার বিবাহ উপলক্ষে কিছু গহনা গড়াচ্ছিলেন। সেই সূত্রে তাঁর বাড়িতে একাধিক স্বর্ণকারের যাওয়া আসা লেগে ছিল। তারই মধ্যে একদিন এক অজানা লোক এসে তাঁকে জিজ্ঞাসা করে তার কোন চাকরের দরকার আছে কি না। তিনি তাকে সেইদিন থেকে রেখে দেন এবং সেও তাঁর বাড়ি এসে সংসারের যাবতীয় কাজ করতে থাকে লোকটা বলে তার নাম তুলসী ও সে লখনউ শহরের ডালিমগঞ্জে থাকে। সকাল হতেই সে নিজের কাজে আসত ও রাত ১০টা নাগাদ বাড়ি ফিরত।

মহিলাটি রাতে তাদের বাড়ির উঠানের লাগোয়া এক ঘরে একা শুতেন ও সেই ঘরেই তার মালপত্তর থাকত। রাতে বাড়ির বাহির মহলের সঙ্গে তাঁর কোন যোগ থাকত না। যে রাতে তিনি খুন হন সে রাতে তাঁর স্বামী এক বিকট চিৎকার শুনতে পান। ঘুমের ঘোরে কিন্তু তিনি সেটাকে অগ্রাহ্য করেন। পরে যখন তিনি এক অবিশ্রান্ত গোঙানি শুনতে পান তখন তিনি উঠে পড়েন ও অন্দরমহলে যাবার দরজা খোলেন। তিনি দেখেন তাঁর স্ত্রী অবসন্নপ্রায় হয়ে থাপ্‌টি মেরে সেই দরজার ওপর ঠেসান দিয়ে বসে আছেন ও তাঁর সর্বাঙ্গ থেকে রক্ত গড়িয়ে পড়ছে। ভদ্রলোক তাঁকে তৎক্ষণাৎ হাসপাতালে নিয়ে যান কিন্তু মাঝ পথেই মহিলার মৃত্যু ঘটে। তিনি সম্পূর্ণ অজ্ঞান ছিলেন বলে তাঁর মুখ থেকে কোন কথা বেরোয় না। এই ঘটনা ঘটে ৮ই জুলাই ১৯৪৩ সালে।

ঘটনার পরদিন সকালে দেখা গেল কয়েকটা অর্ধভুক্ত বিড়ির টুকরো, কতকগুলো পোড়া দেশলাই কাঠি, চাবির একটা গোছা ও শালপাতার এক শূন্য দোনা বাড়ির ছাদের ওপর পড়ে। মহিলা যে ঘরে শুতেন সেই ঘরের ভেন্‌টিলেটর থেকে একখণ্ড দড়ি ঝুলছে। বাড়ির বাইরে এক ড্রেনপাইপের নীচে এক জোড়া কালো শূ জুতো পড়ে ও সেই ড্রেনপাইপের গায়ে কোথাও কোথাও কোন ব্যক্তির হাতের ছাপ আছে। আরো দেখা গেল বাড়ির এক জোড়া পোষা কুকুর অন্দরমহলের উঠানে মরে পড়ে আছে। তাছাড়া গৃহ-স্বামীর এক নেপালি ভোজালি যা তার ঘরে রাখা থাকত সেটাও অদৃশ্য হয়ে গেছে।

তুলসী সেই থেকে তার কাজে আসা বন্ধ করে দেয়। ডালিমগঞ্জে খোঁজ নিয়ে দেখা গেল, ওই নামের কোন লোক সেখানে আদপেই থাকে না। তখন আর কোন সন্দেহ রইল না ঘটনার জন্য সে-ই দায়ী।

সব কিছু দেখে শুনে বোঝা গেল ঘটনার রাতে তুলসী সুযোগ বুঝে ড্রেন-পাইপের সাহায্যে বাড়ির ছাদের ওপর ওঠে ও সেখানে কিছুকাল লুকিয়ে বসে থাকে। তার পর যখন দেখে মহিলা ঘুমে অকাতর তখন এক দড়ির সাহায্যে ছাদ থেকে নেমে তার ঘরে ঢোকে। পরে তাঁকে গৃহস্বামীর ভোজালি দিয়ে খুব করে জখম করে। মহিলা যখন অজ্ঞানের মত হয়ে যান তখন তার বাক্স পেঁটরা হাতড়ে তাতে যত গহনা গাঁটি ছিল সেগুলো হাতায়। বাড়ির কুকুর দুটোকে সে আগে থেকে বিষ খাইয়ে রাখে। তার কাজ হাসিল হবার পর সে খিড়কির দরজা দিয়ে নিঃশব্দে বেরিয়ে পড়ে ও তার যে ক'জন সঙ্গী সাথী বাড়ির বাইরে উপস্থিত ছিল তাদের মধ্যে চোরাই মালের ভাগ বাটরা করে।

মহিলার ঘরের দেয়ালের ওপর তাঁর হাতের রক্তাক্ত ছাপ দেখে স্পষ্ট বোঝা গেল, হত্যাকারী চলে যাবার পর তিনি কোনমতে উঠে দেওয়াল ধরে হাতড়াতে হাতড়াতে সেই ঘরের বাতির সুইচ পর্যন্ত যান ও ঘরের বাতি জ্বালান। তার পর ঘর থেকে বেরিয়ে বাড়ির মাঝ দরজা পর্যন্ত কোন গতিকে টলতে টলতে গিয়ে সেখানে অবসন্নপ্রায় হয়ে বসে পড়েন।

এই মামলার তদন্ত সি আই ডির হাতে তুলে দেওয়া হয়। কিন্তু তারাও কিছুদিন পর্যন্ত এর হদিস্ পায় না। এইভাবে আরও কিছু দিন যাবার পর লখনউ শহরেই অন্য এক পাড়ায় অনেকটা এই ধরনেরই আর এক ঘটনা ঘটে। গৃহস্বামীর মেয়ের বিবাহ সূত্রে তাঁর বাড়িতে যেসব অতিথি এসেছিল তাদের কয়েক হাজার টাকা মূল্যের গহনা চুরি যায়। তিনি বলেন ঘটনার কিছুদিন পূর্বে তাঁর কাছে এক অপরিচিত লোক চাকরির খোঁজে আসে ও তিনি তাকে

রেখে দেন। সে তার পরিচয় রাম ভরোসে বলে ও জানায় লখনউ শহরের নখাসকোণায় সে থাকে। লোকটা তাঁর বাড়িতে ভাল ভাবেই কাজ করত। তার পর একদিন সুবিধে বুঝে সে তাঁর মেয়েদের গহনাপত্তর হাতিয়ে সটকান্ দেয় তুলসীরই মত রাম ভরোসেরও কোন খোঁজখবর পাওয়া যায় না। সেও তার এক জোড়া জুতা ঘটনাস্থলে ফেলে যায় যার সাইজ তুলসীর জুতোর সাইজের সঙ্গে মিলে যায়।

এই দুই মামলার তদন্ত সি আই ডি ইন্সপেক্টর ইন্দ্রকুমার করেন। তিনি অনেক কাগজপত্তর হাঁতড়ে আবিষ্কার করেন ১৯৩৮ সালে লখনউ শহরে এক রাণীর বাড়িতে ঠিক এই ধরণের এক চুরি হয়। তাতে প্রায় লাখ খানেক টাকা মূল্যের গহনা পত্তর চুরি যায়। সেই সূত্রে যে ক'জন লোক ধরা পড়ে তারাও এমনি ধাপ্পা দিয়ে তাদের কাজ হাসিল করায় অভ্যস্ত ছিল। দলের পাণ্ডা ছিল বারাবঙ্কি জেলার রাম সমুঝ মাঝি, যে ১৯৪১ সালের ডিসেম্বর মাসে জেল থেকে ছাড়া পাবার পর নিরুদ্দেশ হয়ে যায়।

আরো কিছুদিন যেতে না যেতে ঠিক এই ধরণের আরো দুটি ঘটনা হয়। একটি মে মাসে কানপুর শহরে ও অন্যটি জুন মাসে লখনউ শহরে। আসামী প্রথমটিতে তার নাম রাম ভরোসে কাহার ও দ্বিতীয়টাতে দেবী কাহার বলে জানায়।

রাম সমুঝের ছাড়পত্রে তার ফটোর যে কপি সংলগ্ন ছিল সেটা দেখা-মাত্র উপরোক্ত ঘটনাগুলির ফরিয়াদিদের বুঝতে বাকি রইলো না যে সেই লোকটাই তার নাম ভাড়িয়ে তাদের বাড়ি এসে জুটেছিল।

এ. পি সেন রোডের ঘটনায় সেখানকার ড্রেনপাইপের ওপর যে সব হাতের ছাপ পাওয়া যায় সেগুলো রাম সমুঝের হাতের ছাপের সঙ্গে (যা সি আই ডি দপ্তরে রক্ষিত ছিল) মিলে যায়।

তারপর থেকে রাম সমুঝের খোঁজ চলে। তাতে ছুটবন কাহার নামের এক ব্যক্তির সাহায্য নেওয়া হয়। তার সঙ্গে এককালে রাম সমুঝের গাঢ় বন্ধুত্ব ছিল। সেই খবর আনে যে রাম সমুঝ লখনউ শহর থেকে কিছু দূরে গোমতী নদীর ওপর এক নৌকায় অজ্ঞাতবাস করছে। নৌকাটি তারই এক জাত ভাই-এর। রাতের অন্ধকারে সে শহরে এসে যেখানে সেখানে তার হাত সাফাই করে।

খবরটা পেয়ে ইন্সপেক্টর ইন্দ্রকুমার একদিন রাতের অন্ধকারে সেখানে গিয়ে হানা দেন ও রাম সমুঝকে বন্দী করেন।

রাম সমুঝ নিজের দোষ স্বীকার করে এক জবানবন্দি দেয়। জবানবন্দিতে তার ছয় জন সঙ্গীর নাম করে, যাদের সঙ্গে তার উপরোক্ত ঘটনাগুলিতে যোগ ছিল।

পুলিশ রাম ভরোসের জবানবন্দির ওপর ভিত্তি করে কিছু চোরাই মাল উদ্ধার করে যার মধ্যে সেই ভোজালিটি ছিল যা দিয়ে সে এ. পি. সেন রোডের গৃহকর্ত্রীকে খুন করে। তাছাড়া তার বাড়ি থেকে এক কালো কোট পাওয়া যায় যাতে কিছু রক্তের ছাপ ছিল। পরীক্ষার ফলে সেই রক্তের গ্রুপিং মৃতা মহিলার রক্তের গ্রুপিং-এর সঙ্গে মিলে যায়। অবশেষে কোর্ট থেকে রাম ভরোসের ফাঁসির ও অন্য ছয় জনের (যাদের বাড়ি থেকে অল্প-বিস্তর চোরাই মাল পাওয়া যায়) ছয় বছর করে সশ্রম কারাদণ্ডের হুকুম হয়।

সময়ের হেল ফের

একদিন রাত সাড়ে আটটা নাগাদ বি এন ডবলু .রলের আপ্ মেল শহজনওয়া রেল স্টেশন থেকে মাইল তিনেক যাবার পর হঠাৎ থেমে যায়। সেটা ছিল ১৯৮২ সালের ২৪শে মাচ। লাইনের দুধার তখন ঘন অন্ধকারে আচ্ছন্ন। ব্যাপারটা যে কি তা যাত্রীরা কিছুক্ষণ পযন্ত বুঝে উঠতে পারে না। তারপর বন্দুকের কয়েকটা আওয়াজ ও সেই সঙ্গে বন্দেমাতরম্, ইনকিলাব জিন্দাবাদ, মহাত্মা গান্ধী কী জয়, সুভাষ বসু কী জয় এই সব নানা রকমের ধ্বনি তাদের কানে যায়। তখন তাদের আর বুঝতে বাকি থাকে না যে তাদের ট্রেনে ডাকাত পড়ছে। তারা দেখল মাথায় সোলার হ্যাট পরা একজন লোক বন্দুক হাতে টে.নর এক সীমানা থেকে অন্য সীমানা পযন্ত যাতায়াত করছে। অন্য একজন হিন্দুস্থান সোসালিষ্ট রিপাব্লিকান আর্মির তরফ থেকে ছাপানো এক কাগজ বিলি করছে। কয়েকজন আবার যাত্রীদের শাসিয়ে বেড়াচ্ছে যদি তাদের মধ্যে থেকে কেউ কোনরকম গোল বাধিয়েছে তাহলে তাকে যমালয়ে পাঠানো হবে।

আক্রমণকারীরা তাদের পরিচয় ক্রান্তিকারি বলে দেয় ও বলে তাদের একমাত্র উদ্দেশ্য গভনমেন্টের টাকা লুঠ করা, যেহেতু গভর্নমেণ্ট দেশের গরীব কিষাণ ও মজুরদের টাকা দুহাতে লুঠ করছে। জনসাধারণের কর্তব্য এক জোট হয়ে গভনমেন্টের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করা। সেনা বাহিনী ও পুলিশ তাদের সঙ্গে যোগ দিতে প্রস্তুত।

ট্রেনে যদিও খুব ভীড় ছিল তবু যাত্রীদের মধ্যে থেকে কারুর সাহস হল না যে টুঁ শব্দ করে। ইতিমধ্যে আক্রমণকারীরা ট্রেনের এঞ্জিন ড্রাইভার ও গার্ডকে

ধরে এনে এক প্রথম শ্রেণীর কামরায় বসিয়ে রাখে ও মেল ভ্যান লুঠ করতে উদ্যত হয়। তাদের কার্যসিদ্ধি হয়ে যাওয়ার পর তারা সকলে দলবদ্ধ হয়ে অন্ধকারে মিলিয়ে যায়। এই ডাকাতির ফলে তাদের মোট ১০,০০০ টাকা লাভ হয়। ডাকাতি ঘটতে বড জোর আধঘণ্টা বা পঁয়তাল্লিশ মিনিট লেগে থাকবে।

ঘটনার সংবাদ নিকটবর্তী গ্রামের এক চৌকিদার শহজনওয়া থানায় গিয়ে দেয়। সেখানকার দারোগা সেটা গোরক্ষপুরের পুলিশ সাহেব মিঃ লক্‌কে তারযোগে জানায়। মিঃ লক্ সংবাদ পাওয়া মাত্র তাঁর গাডি হাঁকিয়ে ঘটনাস্থলে এসে পৌছান। ইতিমধ্যে ট্রেন সেখান থেকে এগিয়ে মগহর স্টেশনে গিয়ে দাঁড়ায়। মিঃ লক্ মগহরে পৌছে ডাকাতি সম্বন্ধে কিছু জিজ্ঞাসাবাদ করার পর মেল ভ্যানখানা ট্রেন থেকে কাটিয়ে গোরক্ষপুর স্টেশনে ফেরৎ পাঠানোর ব্যবস্থা করেন।

আক্রমণকারীরা স্কুল কলেজের ছাত্রদের মত দেখতে ছিল। তাদের মধ্যে কারুর মাথায় হ্যাট ও কারুর মাথায় পাগড়ী ছিল। কেউ বা ধুতি আবার কেউ বা পাজামা কিম্বা প্যাণ্ট পরে ছিল। প্রায় সকলেই তাদের মুখ রুমাল দিয়ে আংশিক ঢেকে রেখেছিল। ঘটনাস্থলে কয়েকটা পটকা ছাড়া আর কিছুই পাওয়া যায় নি।

এই ডাকাতির এক উদ্দেশ্য ছিল তৎকালীন শাসককে জানিয়ে দেওয়া যে যতদিন না দেশ স্বাধীন হয় ততদিন বিপ্লবকারীরা এই রকম গোল বাধাতে থাকবে। অন্য এক উদ্দেশ্য ছিল তাদের পার্টির কাজের জন্য টাকা সংগ্রহ করা। এই ধরণের যে ক'টা ডাকাতি আমার চোখে পড়ে সব ক'টারই সঙ্গে কংগ্রেসের চরমপন্থী দলের তলে তলে যোগ ছিল।

মামলার তদন্তের ভার প্রাদেশিক সি আই ডি-কে দেওয়া হয়। সেই সূত্রে আমি ও আমার এক ডেপুটি রায় বাহাদুর টিকারাম মোটরে লখনউ থেকে গোরখপুর যাই। সেখানে পৌছে আমাদের প্রথম কাজ হল মেল ভ্যানখানা খুঁটিয়ে দেখা। আমরা তার মেঝের ওপর বিস্তর ছেঁড়া ছেঁড়া ইনস্যুয়রেন্সের খাম দেখতে পাই। তাদের মধ্যে থেকে কয়েকটার ওপর আঙ্গুলের স্পষ্ট রক্তাক্ত ছাপ ছিল। ঠিক সেই রকমের ছাপ গাডির এক ভাঙ্গা শার্সির ওপরও ছিল। সেটা দেখে স্পষ্ট বোঝা গেল যে আক্রমণকারিদের মধ্যে অন্ততঃ একজনের আঙ্গুল কাঁচ ভাঙতে গিয়ে কেটে গেছে। তার থেকে যে রক্ত বেরিয়েছে সেটা মুছতে গিয়ে সে তার আঙ্গুলের ছাপ রেখে গেছে। যে ক'টা খামের ওপর

আঙ্গুলের ছাপ ছিল সেগুলো আমরা রেখে দিই ও পরে ফিঙ্গার প্রিণ্ট ব্যুরোতে পাঠিয়ে দিই।

আধুনিক কালে আঙ্গুলের ছাপ সম্বন্ধে বিজ্ঞান এত উন্নতি করেছে যে ব্যুরোর লোকেরা অনায়াসে বলে দিতে পারে কোনটা কার আঙ্গুলের ছাপ। ব্যুরোতে বহু সংখ্যক শাস্তি প্রাপ্ত লোকের আঙ্গুলের ছাপ রক্ষিত আছে। কোন ব্যক্তির নতুন ছাপ সেখানে পাঠিয়ে দিলে সেখানকার লোকেরা সেটা রক্ষিত ছাপ-গুলোর সঙ্গে মিলিয়ে দেখে। যদি কোনটার সঙ্গে মিলে যায় ত কথাই নেই। আর যদি বা নাই মেলে ত সেটা রেখে দেয় ও পরে যখন সেই ব্যক্তি ধরা পড়ে তখন তার আঙ্গুলের ছাপের সঙ্গে মিলিয়ে দেখে।

এ ক্ষেত্রে যে খামগুলোর ওপর আঙ্গুলের ছাপ ছিল সেগুলো যত্ন সহকারে রাখার পর প্রশ্ন উঠল ওই অঞ্চলের মার্কামারা বিপ্লবীদের মধ্যে কে এমন যার আঙ্গুলে কাটা ঘায়ের দাগ আছে। এ সম্বন্ধে তলে তলে যাচাই করে জানা গেল খুব সম্ভব লোকটা অবোধবাজ তেওয়ারি যে কিছুদিন থেকে নিরুদ্দেশ। আমরা তখন তার বাড়ি ও অন্যান্য যে সব জায়গায় তার উপস্থিতি সম্ভব সে সব জায়গায় খানাতল্লাসি চালাই। কিন্তু তাতে কোন ফল হয় না। অগত্যা তার গতিবিধি সম্বন্ধে যা কিছু খবর পাই তারই ওপর নিভর করে তক্কে তক্কে থাকি। কাজটা যথেষ্ট কষ্টসাধ্য ছিল। একবার ত রায় বাহাদুর টিকারাম ও আমি ছদ্মবেশে এক বিশ্রী গলির মধ্যে লোকটার অপেক্ষায় নিরর্থক বসে একটা গোটা দিন কাটিয়ে দিই। পরে এক সময় খবর পাই যে সে সন্ধ্যার অন্ধকারে এক ছোট্ট চায়ের দোকানে বসে লুকিয়ে চা খেতে অভ্যস্ত। তাই একদিন সন্ধ্যার পর যখন সে দোকানে বসে চা খাচ্ছিল তখন আমরা তার ওপর হানা দিই। কিন্তু তার গায়ে এমন শক্তি ছিল যে আমাদের দলের যে লোক তাকে ধরতে যায় তাকে সে এমন এক ঝট্‌কা দেয় যে সে দশ হাত দূরে ছিটকে পড়ে। হাজার হোক্ সে ছিল একা আমরা ছিলাম কয়েকজন। তাই অবশেষে তাকে আমাদের কাছে হার মানতে হয়।

অবোধরাজ তেওয়ারিকে আমরা অবিলম্বে কোতোয়ালি নিয়ে যাই। সেখানে পৌছানো মাত্র আমরা তার দুই হাতের আঙুল পরীক্ষা করে দেখি। যদিও ঘটনার পর থেকে তখন দুই তিন মাস কেটে গেছিল তবু তার ডান হাতের বুড়ো আঙ্গুলে আমরা এক সন্দেহজনক ক্ষতচিহ্ন দেখতে পাই। তাকে আমরা অনেক করে বুঝিয়ে বলি সে যদি নিজের ভাল চায় তাহলে তার দোষ যেন স্বীকার করে। কিন্তু সে ছিল পাকা ছেলে। কোন মতেই তা করতে

রাজী হয় না। তার আঙুলের কাটা ঘা সম্বন্ধেও সে কোন যুক্তিসঙ্গত কৈফিয়ৎ দিতে পারে না। আমরা তার আঙুলের ছাপ নিয়ে সেটা ফিঙ্গার প্রিণ্ট ব্যুরোয় পাঠাই। পরে যখন সেখান থেকে রিপোর্ট আসে যে মেল ভ্যান থেকে পাওয়া ছাপ ও এই ছাপ একই লোকের তখন অবোধরাজের দোষ সম্বন্ধে আর কোন সংশয় থাকে না। শুধু বাকি রইল অবোধরাজের সঙ্গীসাথীদের নাম ধাম জানা ও তাদের আটক করা।

তারপর কয়েক সপ্তাহ কেটে যায় তবু মামলার কোন সুরাহা দেখতে পাওয়া যায় না। এক সময় আমরা সম্পূর্ণ নিরাশ হয়ে যাই। পরে একদিন জানা যায় যে গোরখপুর শহরে এক ভাড়াটে বাড়িতে কতকগুলি স্কুল কলেজের ছেলে মিলে কিছুদিন আগে লুকিয়ে বোমা তৈরীর পদ্ধতি শিখছিল। তাদের মধ্যে দুটি ছেলের নাম হরিপ্রসাদ তেওয়ারি ও ইন্দ্রপ্রসাদ। এই খবর পেয়ে আমরা সেই ছাত্রাবাসে গিয়ে হাজির হই। কিন্তু সেখানে তখন ভো ভা। সব ছেলেরা গ্রীষ্মের ছুটিতে যে যার বাড়ি চলে গেছে। তাদের প্রতিবেশীদের মুখে জানা যায় যখন ওই ছেলেরা তাদের বোমা তৈরী করছিল তখন একটা বোমা নাকি ফেটে যায়। তার টুকরোগুলো ছাত্রাবাসের সংলগ্ন এক আবর্জনার স্তূপে ফেলে দেওয়া হয়েছে। সেই স্তূপ হাতড়ে আমরা সেগুলো পেয়েও যাই।

ইতিমধ্যে আজমগড়ে একজন লোক ধরা পড়ে, যার জবানবন্দি থেকে হিন্দুস্থান সোসালিষ্ট রিপাবলিকান আর্মির অন্তর্গত অনেকের কাযকলাপ সম্বন্ধে জানা যায়। তাদের বাড়ি থেকে কিছু বোমা তৈরীর মাল মসলাও পাওয়া যায়।

আবার কয়েক সপ্তাহ কেটে যাওয়ার পর আর এক ব্যক্তি ধরা পড়ে, যার নাম ছিল বামাধর। তার কাছ থেকে তার সঙ্গীসাথীদের এক তালিকা পাওয়া যায়। সেই তালিকাতে অন্যান্য নামের মধ্যে জনৈক রাজারাম পাসির নামও ছিল। রাজারাম তখন ফেরার।

ঠিক সেই সময় আর এক খবর পাওয়া যায় যে, বেনারস কুইন্স কলেজের দুটি ছাত্রের এই মামলার সঙ্গে যোগ আছে। রায় বাহাদুর টিকারাম তখন বেনারস যান। দৈবক্রমে তিনি যখন ওই দুটি ছাত্রের ব্যাপারে খানাতল্লাসি করছেন তখন গোরখপুরের হরিপ্রসাদ তেওয়ারি, বারাবঙ্কির ব্রিজ বাহাদুর ও গাজিপুরের রামজিরাম বৈশ্য সেখানে আচমকা এসে পড়ে। তারা ওই বাড়িতেই তখনকার মত আস্তানা গেড়েছিল। নিশ্চয় তারা স্বপ্নেও ভাবেনি যে অমন করে তারা পুলিশের মুখে পাকা আমটির মত টুপ্ করে পড়বে। হরিপ্রসাদ তেওয়ারি ও

ব্রিজবাহাদুরের কাছ থেকে একটা করে রিভলবার পাওয়া যায়। সেদিনের ফলাফল পুলিশের দিক থেকে অপ্রত্যাশিত।

এ পর্যন্ত মোট ৩০ জনকে ধরা হয়। তাদের মধ্যে কয়েকজন গোরখপুরে টাউন হল্-এ মহারাণী ভিক্টোরিয়ার ধাতু নির্মিত মূর্তির মুখে আলকাতরা লাগানোর ব্যাপারে জড়িত ছিল।

আরও কিছুদিন পর যে দুজন ধরা পড়ে তাদের মধ্যে একজন ছিল কৈলাস-পতি ও অন্যজন ছিল রাজারাম পাসি।

কৈলাসপতি গোরখপুরে তার এক বন্ধুর বাড়ি আসে। বন্ধুটির অবর্তমানে সে তারই বাড়ি রাত কাটাবার ব্যবস্থা করে। খবরটা পাড়ার এক সিভিক গার্ডের কানে যায়। তার মনে কিছু সন্দেহ জাগাতে সে তাকে থানায় ধরে নিয়ে যায়। লোকটা এই ডাকাতি ছাড়া বেনারসের লঙ্কা পোষ্ট অফিসের এক লুঠের মামলায় জড়িত ছিল।

রাজারাম পাসির উল্লেখ রামাধার সিং-এর কাছ থেকে যে এক নামের তালিকা পাওয়া যায় তাতে ছিল। সে ধরা পড়ার পর এক বিস্তারিত জবানবন্দি দেয়। সেই জবানবন্দি থেকে জানা যায় সব সুদ্ধ ১৪জন মিলে এই ডাকাতি করে। যে ট্রেনখানা আটক করা হয় তাতে করেই রাজারাম ও রামরূপ গোরখপুর থেকে রওনা হয়। পরের স্টেশন ডোমিগডে তাদের দলের আরও চারজন এসে তাদের সঙ্গে যোগ দেয়। বাকি ক'জন ঘটনাস্থলে আগে থেকেই উপস্থিত ছিল। ট্রেনখানা সেখানে পৌছানো মাত্র রাজারাম তার চেন টানে। সেটা যখন দাঁড়িয়ে পড়ে তখন রামরূপ কিছু হ্যাণ্ডবিল যাত্রীদের মধ্যে বিলি করে। সমস্ত কাজ ভগবানপ্রসাদ শুক্লের তত্ত্বাবধানে হয়। সে-ই বন্দুকের কয়েকটা ফাঁকা আওয়াজ করে। এক আধ জন আবার কয়েকটা পটকা ফাটায়। বৈজনাথ সিং, রামরূপ ও উমাশঙ্করের হাতে একটা করে রিভলবার ছিল। বৈজনাথ সিং ও প্রবোধরাজ তেওয়ারি মেল ভ্যানে ঢোকে ও সেটাকে লুঠ করে করে। ডাকাতি শেষ হবার পর যে যার বাড়ি চলে যায়।

ঘটনার কয়েক সপ্তাহ বাদে কৈলাসপতি, উমাশঙ্কর রামরূপ ও রাজারাম নিজে নেপাল যায়। সেখানে তাদের বৈজনাথ সিং, রাজনাথ সিং ও ভগবান-প্রসাদ শুক্লের সঙ্গে দেখা হয়। পরদিন উমাশঙ্কর ও রাজারাম ৬০০ টাকা হাতে নিয়ে রিভলবার কিনতে রেওয়া যায়। কিন্তু সেখানে কোন সুবিধে করতে না পারায় তারা গোয়ালিয়র যায়। গোয়ালিয়রে গিয়ে তারা একখানা

ঘর ভাড়া করে। ছুটকুন মিশ্র, হরিপ্রসাদ তেওয়ারি, বৈজনাথ সিং ও রামরূপ পরে সেখানে এসে তাদের সঙ্গে যোগ দেয়।

রাজারাম পাসির জবানবন্দির পর রায়বাহাদুর, টিকারাম ও ইন্সপেক্টর ফৈজাহুল্লা গোয়ালিয়র যান। সেখানে তাঁরা উমাশঙ্কর, বৈজনাথ সিং ও রামরূপকে দুই রিভলবার সহ বন্দী করেন। এই ভাবে যে ক'জন ডাকাতিতে জড়িত ছিল তাদের মধ্যে শুধু দুজন ছাড়া সকলেই পর পর ধরা পড়ে। রাজারামকে রাজসাক্ষী করা হয়। মামলার বিচারের ফলে ১১ জনের লখনউ-এর দায়রা আদালত থেকে ছয় বছর করে কারাদণ্ড হয়।

আসামীদের মধ্যে অনেকেই দেশের জন্য সব কিছু ত্যাগ করতে প্রস্তুত ছিল তার নমুনা হরিপ্রসাদ কর্তৃক তার নববিবাহিতা স্ত্রীকে লেখা এক চিঠিতে পাওয়া যায়। চিঠিখানার সারাংশ এইরকম :

—তুমি আমার জন্য মোটেই চিন্তিত হয়ো না বা দুঃখ করো না। আমার হয়ত লম্বা কারাদণ্ড হতে পারে। আমি চাই তুমি আমার স্মৃতি তোমার মন থেকে একেবারে মুছে ফেল ও আমাদের দেশের পদ্মিনীর মত পুরাকালের নারীরা যা দৃষ্টান্ত রেখে গেছেন তারই অনুসরণ কর—

সময়ের হের ফেরে কিন্তু সেকালে যাদের বিদ্রোহী বলে ধরা হত এখন তারা দেশপ্রেমীদের মধ্যে গণ্য। উপরোক্ত ঘটনার প্রায় ২০।২৫ বছর পরে আমার একবার নৈনিতাল জেলার রুদ্রপুর নামের এক জায়গায় যাবার সুযোগ ঘটে। আমার সঙ্গে সে সময় দুজন লোক দেখা করতে আসে। তাদের মুখ দাড়ি গোঁফে যেভাবে আচ্ছাদিত ছিল তাতে আমার পক্ষে তাদের চেনা সম্ভব ছিল না। তারা যখন নিজেদের পরিচয় আমায় দেয় তখন জানলাম তাদের মধ্যে একজন ছিল রামরূপ ও অন্যজন ছিল উমাশঙ্কর। তাদের দুজনেরই উপরোক্ত ডাকাতিতে কারাদণ্ড হয়। জেল থেকে ছাড়া পাবার পর তারা পুরস্কার স্বরূপ রুদ্রপুরে সরকারের তরফ থেকে কিছু জমিজমা পায় ও তারই চাষ বাস করে এখন মনের সুখে আছে। তাদের যে আমার প্রতি কোন বিদ্বেষ নেই দেখে আমার বেশ ভাল লাগলো।

পুড়ে হল ছাই

মহাত্মা গান্ধীর অসহযোগ আন্দোলনের সঙ্গে সঙ্গে ভারতবর্ষ থেকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের তিরোধানের প্রথম লক্ষণ দেখা যায়। তারপর থেকে ১৯৪২ পর্যন্ত সেই লক্ষণ সমানে বাড়তে থাকে। তাঁর ভারত-ছাড়ো আন্দোলনের ফলে দেশময় যে অরাজকতা ছড়িয়ে পড়ে সেই সূত্রে উত্তর-প্রদেশের বালিয়া জেলা ও সেখানকার কংগ্রেস নেতা চিত্তু পাণ্ডের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

বালিয়া শহরের মধ্যে দিয়ে যে রেল লাইন গেছে সেটা শহরকে দুভাগে ভাগ করেছে। একভাগ যেখানে সাধারণ লোকেদের ঘর বাড়ি ও বাজার হাট। অন্যভাগ যেখানে সরকারি কাছারি ও উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের বাড়ি ঘর দোর। লোকে যাকে সিভিল লাইন্স বলে। আমি যে সময়ের কথা বলছি সে সময় পুলিশের যে ক'টা লোক শহরের দিকে রয়ে গেছিল তাদের সকলকে সিভিল-লাইন্সে কেন্দ্রীভূত করা হয়। তারা যাতে বিদ্রোহীদের হাত থেকে অন্ততঃ সরকারি বাড়ি ঘর দোর, বিশেষ করে সরকারি খাজনা রক্ষা করতে পারে। ফলে শহরের দিক থেকে সরকারি শাসন একরকম লোপ পেয়ে যায়। তাতে বিদ্রোহীদের খুব সুবিধাই হয়। একদিন ত তাঁরা দলে দলে দিন দুপুরে সেখানে যে ক'জন বিশিষ্ট সরকারি কর্মচারী থাকত তাদের বাড়িতে ঢুকে তাদের যতসব আসবাব-পত্তর এমনকি ভারি ভারি আলমারি টেবিল চেয়ার পর্যন্ত লুঠ করে ও মাথায় চাপিয়ে নিজেদের বাড়ি নিয়ে যায়। এরকম কাণ্ড যে সকলের চোখের সামনে কখনও ঘটতে পারে কেউ স্বপ্নেও ভাবেনি। যাদের ওপর দিয়ে এই বিপদ

যায় তারা অগত্যা তাদের প্রাণ ও মান রক্ষার জন্য তাদের স্ত্রী পুত্র কন্যা সহ সিভিল লাইন্সে গিয়ে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়।

শহরের দিককার শাসন বস্তুতঃ স্থানীয় কংগ্রেস নেতা চিত্তু পাণ্ডের হাতে চলে যায়। সেই থেকে লোকে তাকে বালিয়া কেশরী বলতে শুরু করে দেয়। লোক সে মন্দ ছিল না। তার সঙ্গে তৎকালীন ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট মিস্টার নিগমের একরকম চুক্তি হয়। তার ফলে সিভিল লাইন্সের দিকটা বিদ্রোহীদের আক্রমণ থেকে রক্ষা পায়। তবু সেখানে এমন এক আতঙ্ক ছেয়ে যায় যা বলবার নয়।

ইতিমধ্যে বালিয়া জেলার টেলিগ্রাফ ও রেল লাইন তছনছ হয়ে যায় ও তার বহির্জগতের সঙ্গে যোগসূত্র সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। বিদ্রোহীরা বহু রেলওয়ে স্টেশন ও ডাকঘর পুড়িয়ে দেয় ও একাধিক মালগাড়ি লুঠ করে। এইসব দাঙ্গা হাঙ্গামায় ও লুঠপাটে গ্রামের লোকেদের যথেষ্ট হাত ছিল। তারা তাদের কাজের জিনিস রেখে দিয়ে বাকি সব রেল লাইনের ধারে ফেলে ছুঁড়ে দেয়। সেগুলো অনেক দিন ধরে সেখানে স্তূপীকৃত হয়ে পড়ে থাকে। এ হেন অবস্থায় মিঃ নিগমের পক্ষে হাত গুটিয়ে ভবিষ্যতের জন্য অপেক্ষা করা ছাড়া কোন উপায়ও ছিল না। ২৫শে আগষ্ট নাগাদ তাঁর বিবেচনায় পরিস্থিতি এতই খারাপ হয়ে দাঁড়িয়েছিল যে তিনি র‍্যালিইং পোস্ট স্কীম কাজে আনতে বাধ্য হন।

এই স্কীমের এক ইতিহাস আছে। সিপাহী বিদ্রোহের পর থেকে আমাদের বিদেশী শাসনকর্তাদের প্রাণে ভয় ঢোকে যদি বা সেই রকম আর এক বিদ্রোহ খাড়া হয়ে ওঠে। সেই থেকে কোনরকম অবস্থা বিপর্যয়ের সঙ্গে সঙ্গে কি করা দরকার তার এক খসড়া প্রত্যেক জেলা অধিকারীর দ্বারা প্রস্তুত রাখার নিয়ম চলে আসছিল। এরই অন্তর্গত এক নিয়ম অনুসারে মিঃ নিগম স্থানীয় খাজনার সমস্ত কারেন্সি নোটের তাডা পুড়িয়ে ফেলার আদেশ দেন।

এই নোট পোড়াবার কথায় মনে পড়ে গেল, এককালে নাকি রথ্‌চাইল্ড যিনি পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ধনী লোকদের মধ্যে গণ্য ছিলেন, মহারাণী ভিক্টোরিয়াকে তাঁর সম্মানার্থে কয়েক লক্ষ পাউণ্ডের নোট পুড়িয়ে চা খাইয়েছিলেন। হতে পারে এটা সম্পূর্ণ প্রবাদই।

উপস্থিত ক্ষেত্রে নোট পোড়াবার কাজ শ্রীকক্কড়, শ্রীজগদম্বা প্রসাদ ও শ্রীমিশ্র এই তিনজন উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারীদের দ্বারা সম্পন্ন হয়। তাঁরা প্রথমতঃ খাজনার ডবল লকের ভিতর এক মোমবাতি জ্বালান। সব খাজনা-বাড়ি দুভাগে

বিভক্ত থাকে। যে ভাগকে ডবল লক্ বলা হয় সেখানে খাজনার অধিকাংশ টাকাকড়ি সুরক্ষিত থাকে। যে ভাগকে সিংগল্ লক্ বলা হয় সেখানে অল্পসংখ্যক রোকড়ের টাকা ছাড়া হিসেবের খাতা পত্তর রাখার নিয়ম।

মোমবাতি জ্বালানোর পর প্রথমে একখানা দশ হাজার টাকার নোট ও পরে কয়েকখানা হাজার টাকার নোট তারই অগ্নিশিখায় এক এক করে তুলে ধরা হয় ও সেগুলো দেখতে দেখতে পুড়ে ছাই হয়ে যায়। কাজ আরম্ভ করার কিছুক্ষণ পরেই স্থির হয় সেটা সিংগল্ লকেই করা যুক্তিসঙ্গত। সেইমত ৩৮খানা হাজার টাকার নোটের মধ্যে যে ক'টা বাকি রয়ে গেছিল ও কয়েক বাণ্ডিল একশ টাকার নোট সেখানে পোড়ানো হয়। বেলা ১২টা নাগাদ এক বন্দুকের আওয়াজ ও কিছু কোলাহল শোনা যায়। তখন সকলে টপাটপ্ খাজনার দরজা-জানলা বন্ধ করে মিঃ নিগমের কাছে যান। পরে যখন উপরোক্ত কোলাহল মিথ্যা বলে সাব্যস্ত হয় তখন স্থির হয় কাজটা আবার বিকেল ৩টের সময় শ্রীজগদম্বাপ্রসাদের তত্ত্বাবধানে করা হবে।

শ্রীজগদম্বাপ্রসাদ কিন্তু কাজটা খাজনা-বাড়ির ভেতরে না করে তারই সামনেকার এক মাঠে করা স্থির করেন। তাঁর বিবেচনায় যদি একবার রাষ্ট্র হয়ে যায় যে খাজনার সমস্ত নোট পোড়ানো হয়ে গেছে তাহলে বিদ্রোহীদের দ্বারা আক্রমণের আর কোন সম্ভাবনা থাকবে না। সেই মত খাজনা-বাড়ির সম্মুখবর্তী এক মাঠে কিছু কাঠের আগুন জ্বালানো হয় ও বাকি নোটের তাড়াগুলো ট্রেজারির ভেতর থেকে আনা মাত্র তাতে নিক্ষেপ করা হয়। সেই আগুন ঘিরে শ্রীজগদম্বাপ্রসাদ ছাড়া ট্রেজরি গার্ডের গোটা ১৫ সেপাই ও তহশীলের কয়েকজন চাপরাশি সেখানে তখন উপস্থিত।

প্রথম দিকে কাজটা বেশ ভালভাবেই চলছিল। কিন্তু কিছুক্ষণ বাদে সেপাইদের মধ্যে কিছু চাঞ্চল্য দেখা যায় যা ক্রমেই বাড়তে থাকে। তাদের বিবেচনায় অমন করকরে নোট নিরর্থক পুড়িয়ে ফেলার চেয়ে বড়ো বোকামি আর হতে পারে না। সেগুলো তাদের মধ্যে বিলি করে দিলেই ত হয়? তারা পরস্পরের মধ্যে বলাবলি করে সব নোটগুলো নষ্ট হয়ে গেলে তাদের মাহিনার টাকাই বা কোত্থেকে আসবে? তখন তারা আর হাত গুটিয়ে থাকতে না পেরে তাদের বেয়নেটের ডগা দিয়ে আগুনটাকে খোঁচাতে থাকে। ব্যাপার দেখে শ্রীজগদম্বাপ্রসাদ ঘাবড়ে যান ও তখনকার মত নোট পোড়াবার কাজ স্থগিত রাখেন। আসলে কিন্তু ওইখানেই ঐ কাজের সমাপ্তি হয়।

ঘটনার কয়েকদিন বাদে শ্রীজগদম্বাপ্রসাদ, শ্রীকক্কড় ও শ্রীমিশ্র মিলে পোড়া

নোটের ফর্দের ওপর তাঁদের এক সার্টিফিকেট লিখে দেন যে ফর্দে কোন ভুলচুক নেই। নোট পোড়াবার কাজ তাদের তত্ত্বাবধানে করা হয়। যাতে পোড়া নোটগুলোর চিহ্নমাত্র না থেকে যায় সেজন্য সেগুলির ছাই পর্যন্ত ঝেঁটিয়ে সাফ করে দেওয়া হয়।

এই ঘটনার সমাপ্তি এইখানেই হতে পারত যদি না ঘটনাচক্রে ফর্দের ভেতরকার কয়েকখানা আধপোড়া ও কয়েকখানা আপোড়া নোট নজরে পড়ত। আধপোড়া নোটগুলো লোকে ট্রেজারিতে বদলাতে এনেছিল। এই নিয়ে মহা গোল বেধে যায়। ফলে শাসকদের পক্ষ থেকে এ সম্বন্ধে এক তদন্ত করার আদেশ হয়।

তদন্ত আমিই করি। আমার মতে ঘটনাকালে কিছু নোট হাতছাড়া হয়ে যায়। সেজন্য গারদের সেপাই ও তহশীলের চাপরাশীরা দায়ী ছিল। পোড়া নোটের ফর্দ এমন তাড়াহুড়োতে তৈরী করা হয় যে তাতে কোথাও কোথাও ভুল থেকে যায়। আসলে কর্তাদের তখন মাথার ঠিক ছিল না। শ্রীজগদম্বা-প্রসাদ, শ্রীকক্কড় ও শ্রীমিশ্র জেনেশুনে ভুল সার্টিফিকেট দেন। সেই দোষে তাঁদের পদচ্যুত করা হয়।

ঘটনা আজ বহুদিন হয়ে গেছে। তবু ওই যে একদিন দিনদুপুরে বালিয়া শহরে চার লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজার টাকার নোট ইচ্ছে করে পুড়িয়ে নষ্ট করা হয় সে কথা আজও সেখানকার লোকেদের কাছে তাজা হয়ে আছে।

উত্তর প্রদেশের পূর্বাঞ্চলে বিশেষ করে বালিয়া জেলায় অরাজকতা দেখা দেয় সেটা দমন করার জন্য তৎকালীন শাসনকর্তারা ছেড়ে কথা কননি। অনেক নিরপরাধ ব্যক্তি সে সময় পুলিশের গুলিতে তাদের প্রাণ হারায়। পুলিশের লোকেরা কিছু কিছু লুঠপাটও করে। ওই রকম এক ঘটনা গাজিপুরে হয়। একদিন স্থানীয় পুলিশ সাহেব হাতীর পিঠে চেপে তাঁর সশস্ত্র পুলিশের দলবল নিয়ে গ্রামে গ্রামে ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন। সেই সময় তাঁর নজরে এক পাকা বাড়ি পড়ে। বাড়িখানা দেখেই তিনি বুঝে যান সেটা নিশ্চয় কোন অবস্থাপন্ন লোকের। তখন তিনি তাঁর অনুচরদের তার ওপর লেলিয়ে দেন। তারাও মনের সুখে অনেক মূল্যবান সামগ্রী সেখান থেকে লুঠ করে। ইত্যবসরে হঠাৎ তাদের চোখে পড়ে এক তলোয়ার। তার হাতলের ওপর গৃহস্বামীর নাম খোদাই করা ছিল। সেই নামের নীচে আবার লেখা ছিল তলোয়ার বড়লাটের

তরফ থেকে তাঁকে পুরস্কার স্বরূপ দেওয়া হয়েছে। লেখাটা পড়ে সকলে হকচকিয়ে যায় ও সেখান থেকে পলায়ন করে।

বাড়িখানা এক অবকাশপ্রাপ্ত সুবেদার মেজরের ছিল। তিনি কিছুকালের জন্য বড়লাটের পার্শ্বচর হিসেবে কাজ করেন। ঘটনার পর তিনি অভিমান করে বড়লাট সাহেবকে তাঁর দুঃখ কাহিনী জানান ও সেইসঙ্গে তলোয়ারখানা ফেরৎ দেন। বড়লাট সাহেব সেই চিঠিখানা উত্তর প্রদেশের লাটসাহেবের কাছে তদন্তের জন্য পাঠান। তদন্ত স্থানীয় ডি আই জি পুলিশ করেন।

ফলে সেই পুলিশ সাহেবকে যিনি ঘটনার জন্য আংশিকভাবে দোষী ছিলেন স্থানান্তরিত করা হয় ও তাঁর কাছ থেকে ৩০০০ টাকা আদায় করে ক্ষতিপূরণ-স্বরূপ সুবেদার সাহেবকে দেওয়া হয়। তার অল্পদিন বাদেই সাহেব মনের দুঃখে অত্যধিক মদ্যপান করার দরুন মৃত্যুমুখে পতিত হন।

এক ইতালিয়ান সৈনিক আমি

যে কালে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ চলছিল সেকালে একদিন রাত ৯টা নাগাদ যখন আমি ও আমার স্ত্রী আমাদের ড্রইংরুমে বসে গল্পগুজব করছি তখন দেখি এক সম্পূর্ণ অপরিচিত লোক সেই ঘরের প্রবেশদ্বারে দাঁড়িয়ে। লোকটা দেখতে খাঁটী সাহেবের মত। তার পরনে এক সাদা হাতকাটা কামিজ ও এক সাদা হাফ্ প্যান্ট। তার হাত পা যেখানে সেখানে ছড়ে গেছে ও সে বেজায় হাঁপাচ্ছে। তাকে দেখা মাত্র আমি ঠিক করি সে নিশ্চয় স্থানীয় গোরা পল্টনের সৈনিক ও মদের ঝোঁকে আমাদের বাড়িতে ভুল করে ঢুকে পড়েছে। তাই আমি তাকে ধমক্ দিয়ে তৎক্ষণাৎ বাড়ি থেকে বেরিয়ে যেতে বলি। সে কিন্তু তা না করে আমায় অতিশয় নম্রভাবে ভাঙ্গা ভাঙ্গা ইংরাজিতে বলে, আই—আই—ইটালিয়ান প্রিজনার অব্ ওয়ার—ইউ ইণ্ডিয়ান? ইউ নোবল্ম্যান? আই রান এ্যাওয়ে প্রিজন—আই নো হোম থ্রি ইয়ারস্ ইউ নোবল্ম্যান? লোকটার কথায় ও ভাব ভঙ্গিতে আমার বুঝতে বাকি রইল না সে কোন কারাগার থেকে পালিয়ে আমার কাছে তার আশ্রয় ভিক্ষা করছে।

আমি তখন মহা ফাঁপরে পড়ি একদিকে লোকটাকে দেখে ও তার অবস্থা বুঝে তার প্রতি আমার সহানুভূতি হয়। অন্যদিকে আমি ভেবে দেখি তাকে আশ্রয় দেওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়। যেহেতু আমি সরকারি চাকরি করি তাও আবার পুলিশ বিভাগে। মুহূর্তের মত চিন্তা করে আমার কর্তব্য আমি ঠিক করে ফেলি। প্রথমতঃ আমি তাকে একটা চেয়ার দেখিয়ে তাতে বসতে বলি। তার পর তাকে জিজ্ঞাসা করি, তার তেষ্টা পেয়েছে কি? সে যখন

উৎসাহের সঙ্গে বলে, য়া-য়া—আমি তখন আমাদের খাবার ঘর থেকে দু বোতল ভরমুথ নিয়ে আসি। একটা ছিল ফ্রেঞ্চ ভরমুথ অন্যটা ছিল ইটালিয়ন। বোতল দুটো আমি যখন সামনে তুলে ধরি তখন নিজের দেশের তৈরী ভরমুথ দেখে যেন আকাশের চাঁদ হাতে পায় ও জোর গলায় বলে—দিস—দিস মাই কান্ট্রি। তার দেশ ভক্তির বহর দেখে আমি ত অবাক্। সে তখন আমার হাত থেকে ইটালিয়ন ভরমুথের বোতল প্রায় ছিনিয়ে নিয়ে তার থেকে বেশ খানিকটা পানীয় ঢেলে নেয়। তার পর সেটাকে এক নিঃশ্বাসে শেষ করে ফেলে।

এইভাবে আমার যখন লোকটার সঙ্গে যথেষ্ট হৃদ্যতা হয়ে যায় তখন আমি তাকে আমার সঙ্গে যেতে বলি। সেও আমার কথায় পোষা কুকুরের মত আমার পিছু পিছু যায়। তার পর আমরা যখন আমার গাড়ির কাছে পৌছাই তখন সে হাত নেড়ে আমায় বোঝাবার চেষ্টা করে সে চাদর জাতীয় কোন এক বস্ত্র চায়। তার মতলব ছিল সেটা দিয়ে নিজেকে আগাগোড়া ঢেকে ফেলতে—যাতে পথে তাকে কেউ দেখে না ফেলে। তার অনুরোধ যখন আমি অগ্রাহ্য করি তখন সে বেগতিক দেখে গাড়িতে উঠে পড়ে। তবে গাড়ির সীটের ওপর না বসে তা[illegible] ওপর গুটি সুটি মেরে শুয়ে পড়ে। বেচারার ভাবগতিক দেখে আমার তার প্রতি যথেষ্ট মায়া হয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও আমি হজরৎগঞ্জ থানার দিকে বেরিয়ে পড়ি।

থানা পৌছতে আমার বড় জোর ৫।৭ মিনিট লেগে থাকবে। থানার সামনে যখন আমার গাড়িখানা দাঁড়ায় তখন লোকটা ধড়্ মড়্ করে উঠে বসে। তার পর যখন সে দেখে গুচ্ছের লাল পাগড়ি মাথায় সেপাই শান্ত্রী সেখানে উপস্থিত তখন প্রথমটা সে ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে যায়। কিন্তু পর মুহূর্তে তার আর বুঝতে বাকি থাকে না সে কোথায় এসে পৌচেছে। তখনকার তার মুখের অবস্থা দেখবার মত ছিল।

আমাদের থানায় পৌছানো মাত্র সেখানকার দারোগা ও সেপাইরা আমাদের ঘিরে দাঁড়ায়। তারা আমার কাছ থেকে জানতে চায় আমি লোকটাকে কোথায় ও কিভাবে পাই। আমার কথা শোনবার পর তারা আমায় বলে দুজন সেপাই তাকে টাঙ্গা করে লখনউ-এর চারবাগ স্টেশন থেকে হজরৎগঞ্জ থানায় নিয়ে যাচ্ছিল তখন রাত ৯টা। যখন তারা কাউন্সিল হাউসের সামনে এসে পৌছায় তখন সে গাড়ি থেকে লাফিয়ে পড়ে ও অন্ধকারে ঝোপঝাড়ের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে যায়।

ইতিমধ্যে লোকটা চুপটি করে মন দিয়ে আমাদের কথাবার্তা শুনছিল।

হঠাৎ তার মনে সন্দেহ হয় আমি সম্ভবতঃ পুলিশেরই কোন বড় কর্মচারী। সন্দেহটা জাগা মাত্র সে আমায় জিজ্ঞাসা করে—ইউ পুলিশ চীফ? তার প্রশ্নের উত্তরে আমি তাকে হাঁ বলতে সে মাথা চাপড়ে হেসে ওঠে ও বলে—ওঃ! মাই ফরচুন! পুলিশের হাত থেকে পালিয়ে আমি আবার অন্য এক পুলিশের বাড়ি গিয়ে ঢুকেছিলাম।

আমি তখন তার কাছে আমার বিশ্বাসঘাতকতার জন্য ক্ষমা চাই ও সেও তার মাথা নেড়ে ইঙ্গিতে জানায় আমার প্রতি তার কোন বিদ্বেষ নেই। ফলে আমারও মন অনেকটা হাল্কা হয়ে যায়।

এদেশে হিন্দু মুসলমানদের মধ্যে ধর্ম নিয়ে যে গণ্ডগোল বহুকাল ধরে চলে আসছিল সেটা ব্রিটিশ শাসনের ধর্ম সম্বন্ধে নিষ্ক্রিয় নীতির ফলে বাড়ে বই কমে না। সুতরাং সেকালে পুলিশকে তাদের পুজো পরবের সময় বিশেষ সতর্ক থাকতে হত। এক এক সময় ত এমন অবস্থা হত সামান্য সামান্য ব্যাপার নিয়ে তারা বিরাট গোল বাধাবার উপক্রম করতো। উদাহরণস্বরূপ নিম্নোক্ত দুটি ঘটনা উল্লেখযোগ্য।

প্রথম ঘটনা ফয়জাবাদের। ১৯২৪ সালের মাঝামাঝি আমি যখন সেখানে কাজ করি তখন কতকগুলি স্থানীয় মুসলমান আমার সঙ্গে দেখা করতে আসে। তাদের মধ্যে অনেককেই আমি চিনতাম ও নিরীহ প্রকৃতির লোক বলেই জানতাম। তারা আমায় বলে—হুজুর, আমরা আপনার কাছে আমাদের এক অভিযোগ নিয়ে এসেছি। আমি বলি—বেশ আমি তা শুনতে রাজী। তারা তখন বলে—হুজুর নিশ্চয় জানেন স্থানীয় হিন্দুরা তাদের রামলীলা উপলক্ষে ক'দিন থেকে প্রত্যহ এক মিছিল বার করছে? আমি বলি তার সঙ্গে তোমাদের কি সম্বন্ধ? উত্তরে তারা বলে ওরা যে আমাদের মোহরমের বাজনার অনুকরণ করছে। কথাটা আমি বুঝতে না পেরে বলি, তাতে দোষটা কি হয়েছে? তখন তারা মুখ ভার করে বলে, আমাদের কি হুজুরকে খুলে বলতে হবে আমাদের মোহরমের বাজনা শোকের তাই সেটা কানে গেলেই আমাদের প্রাণে আঘাত লাগে। কথাটা শুনে আমার হাসি পায়। তা কোনরকমে চেপে আমি তাদের বলি, আচ্ছা আমি ভেবে দেখবো এ বিষয়ে কি করতে পারি।

দ্বিতীয় ঘটনাটা প্রতাপগড় জেলার। একদিন সেখানকার জনৈক মুসলমানের এক বাছুর হারিয়ে যায়। অনেক খোঁজাখুঁজির পর সেটাকে উদ্ধার করে ও টানতে টানতে বাড়ি নিয়ে যায়। ব্যাপারটা স্থানীয় হিন্দুদের চোখে পড়ে। দৈবচক্রে সেই দিনই বকৃরিদের পর্ব ছিল। তারা মনে মনে ঠিক করে লোকটা নিশ্চয় ওই বাছুরকে জবাই করার উদ্দেশ্যে বাড়ি নিয়ে যাচ্ছে। কথাটা দেখতে দেখতে ছড়িয়ে পড়ে ও প্রায় হাজার খানেক হিন্দু তাদের লাঠিসোটা হাতে সেখানে এসে হাজির হয়। তখন সেই বেচারা লোকটা তাদের ভুল ভাঙ্গাবার অনেক চেষ্টা করে কিন্তু তাতে কোন ফল হয় না। ক্রমেই তাদের মেজাজ উত্তরোত্তর গরম হতে থাকে।

এমন সময় স্থানীয় থানার এক সেপাই টইল দিতে দিতে সেখানে এসে পড়ে। ব্যাপারটা যে কি তা সে সহজেই ধরে ফেলে। কিন্তু তার পক্ষে একা আগন্তুকদের সামলানো সম্ভব ছিল না। সে তখন বুদ্ধি করে তাদের নাম ঠিকানা লিখতে শুরু করে দেয়। তাই দেখে তারা পরস্পরের মুখ চাওয়াচাওয়ি করে ও একে একে সেখান থেকে চলে যায়। ফলে মিনিট কয়েকের মধ্যে তাদের আর চিহ্ন মাত্র দেখা যায় না।

আর এক ব্যাপার যা নিয়ে সেকালে হিন্দু মুসলমানদেব মধ্যে প্রায়ই গোলমাল বাধত সেটা ছিল মিউজিক বিফোর এ মস্ক। ওই রকম এক ব্যাপার নিয়ে সাহারণপুরে থাকতে আমায় একবার বিশেষ বেগ পেতে হয়।

ঘটনা সাহারণপুরের অন্তর্গত দেওবন্দের। সেখানে অনেক বছর ধরে জন্মাষ্টমীর দিনে হিন্দুরা শ্রীকৃষ্ণের রথেব সঙ্গে ধুমধাম কবে এক মিছিল বার করত। ১৯১৭ সালে তারা হাজার পাঁচেক টাকা ব্যয় করে রথটা নতুন করে গড়ে তোলে। সেখানকার মুসলমানদেব তাতে চোখ উল্টোয়। ওই ব্যাপার নিয়ে উভয় পক্ষের মধ্যে অনেক কথা কাটাকাটির পর এক বোঝাপড়া হয়। সেই অনুসারে স্থির হয় মিছিল যখন সাবুনগেরান ও দীনি মসজিদের পাশ দিয়ে যাবে তখন সব রকম বাজনা বন্ধ থাকবে। তার পর ১৯২৫ সাল পর্যন্ত এই নিয়ে কোন গোলমাল হয়নি।

তার পরের বছর দেওবন্দে এক মুসলমান দারোগা নিযুক্ত হয়। সে ছিল গোঁড়া ধরণের। সে ১৯১৭ সালের নিষ্পত্তি অনুসারে উপরোক্ত দুই মসজিদের পাশে দুটো করে পতাকা পুঁতে দেয়, যাতে বাজনা-বাদ্যি বন্ধ করার সীমানা সম্বন্ধে কোন সন্দেহ না থেকে যায়। হিন্দুরা তখন বেঁকে

বসে ও বলে তাদের চিরকালের অধিকারের ওপর কেউ হস্তক্ষেপ করতে পারে না।

মামলা তখন আদালতে যায় ও অবশেষে ১৯৪৩ সালে এলাহাবাদ হাইকোর্ট থেকে এক রায় বেরোয়। তাঁরা বলেন আইন অনুসারে যদিও হিন্দুদের বক্তব্য ন্যায্য তবু শান্তি রক্ষার জন্য পুলিশ ও ম্যাজিস্ট্রেটের দিক থেকে যদি তাদের ওপর কোন প্রতিবন্ধক লাগান হয় ত সেটা ন্যায় সঙ্গত হবে। ফলে মামলা যেখানকার সেইখানেই রয়ে যায়। কারণ শান্তি বজায় রাখতে হলে হিন্দুদের ওপর প্রতিবন্ধক না লাগালেই নয়।

হাইকোর্টের উপরোক্ত রায় বেরোবার পর আমি উঠে পড়ে লাগি যদি দুদিক বজায় রেখে কোন এক সুরাহা করতে পারা যায়। তার এক মাত্র উপায় ছিল মিছিলের পূর্বের পথ বদলে অন্য এক পথ নির্ধারিত করা যাতে উপরোক্ত দুই মসজিদ বাদ পড়ে যায়। তাই করাও হয়।

মিছিলের দিন পুলিশের বিরাট আয়োজন হয় ও মিছিলের গতিবিধির সময় এমন করে বেঁধে দেওয়া হয় যাতে নমাজের সময় মিছিল পথের কোন মসজিদের ধারেকাছেও না গিয়ে পৌঁছয়। বহুকাল পরে মিছিলের পুনরুত্থান হিন্দুদের পক্ষে যে পরিমাণে উল্লাসের মুসলমানদের পক্ষে ততটাই নৈরাশ্যের কারণ হয়। সুতরাং পরের বছরের উৎসবের সম্বন্ধে এক আশঙ্কা থেকে যায়।

পরের বছর যেদিন মিছিল বেরোবার কথা তার অনতিপূর্বে হিন্দুদের মধ্যে এক গুজব রটে যে মুসলমানরা মিছিল আক্রমণ করবে বলে বদ্ধপরিকর হয়ে আছে। সেই কারণে বহুসংখ্যক হিন্দু দূর দূর থেকে এসে মিছিলে যোগ দেয়। শুধু তাই নয়। তারা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়ে কেবল বন্দুক ছাড়া যতরকম অস্ত্র-শস্ত্র সম্ভব সঙ্গে নিয়ে আসে। তাদের হাতের লাঠিসোঁটাই এক নরাজির মত দেখায় ও তাদের কোলাহল সমুদ্রের গর্জনের মত শোনায়।

একসূত্রে বাঁধা অতগুলো লোক একত্র হলে যা হয় এক্ষেত্রেও তাই হয়েছিল। তাঁরা যখন তাদের লাঠি সোঁটা আস্ফালন করতে করতে ও বজরঙ্গ-বলী কী জয় বলতে বলতে এগিয়ে চলেছিল তখন তাদের দেখে মনে হচ্ছিল তারা যেন এক মহা অভিযানে চলেছে।

অন্যদিকে স্থানীয় মুসলমানেরা জায়গায় জায়গায় বিশেষ করে পথের ধারের মসজিদগুলোতে দলবদ্ধ হয়ে বিপক্ষ দলের লোকেদের ওপর তাদের চোখ থেকে যেন অগ্নিবাণ ছাড়ছিল। মোটের ওপর দুই দলের মধ্যে তথা যুদ্ধ বাধাবার সব লক্ষণই উপস্থিত।

মিছিল যখন অর্ধেক পথ অতিক্রম করে এক চৌমাথায় গিয়ে পৌছায় তখন একদল লোক যাদের বাড়ি যাবার তাড়া ছিল মিছিল থেকে কেটে পড়বার চেষ্টা করে। তাই দেখে কতকগুলি মুসলমান অনর্থক তাঁদের বাধা দিতে উদ্যত হয়। তখন সেই লোকেরা খাপ্পা হয়ে তাদের অবরোধকারীদের মাথায় লাঠি দিয়ে দু-চার ঘা বসিয়ে দেয়। ফলে অন্ততঃ একজনের মাথা থেকে রক্ত গড়িয়ে পড়ে। একেই ত স্থানীয় মুসলমানেরা রেগে টং হয়েছিল, তারপর এই ঘটনা কাটা ঘায়ে নুনের ছিটের মত কাজ করে। তাদের ক্রোধের আর সীমা থাকে না ও তাদের মধ্যে বিদ্যুৎগতিতে যেন এক সাড়া পড়ে যায়।

মিছিলের গতিপথ শেষের দিকে এক সঙ্কীর্ণ গলির মধ্যে দিয়ে গেছিল। সেটা আবার ষোল আনা মুসলমানদের বস্তি। যখন মিছিল ওই গলির মুখে এসে দাঁড়ায় তখন রাত ৯টা হবে। একে ত কৃষ্ণপক্ষের রাত তার ওপর আকাশ মেঘাচ্ছন্ন। এই দুই কারণে চারিদিক গাঢ় অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন।

মিছিল গলির ভেতর ঢুকতেই দুধার থেকে ইঁট-পাটকেলের বর্ষণ শুরু হয়ে যায়। একটা ইঁট আমার ঘোড়ার পায়ে এসে লাগে। তাতে সে অত্যন্ত অস্থির হয়ে ওঠে। আমি তখন বাধ্য হয়ে তার পিঠ থেকে নেমে পড়ি ও রথের পেছন পেছন হেঁটে চলতে শুরু করি। সুবিধা বুঝে মুসলমানদের ছোট ছোট দল পাশের এ গলি সে গলি থেকে বেরিয়ে আমাদের যতদূর সম্ভব জব্দ করার চেষ্টা করে। তারা যেই তাড়া খায় অমনি অদৃশ্য হয়ে যায় কিন্তু পর মুহূর্তেই আবার দেখা দেয়। ক্রমেই ইঁটের প্রকোপ বাড়তে থাকে। ফলে মিছিলের লোকেদের মধ্যে এক উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। তাতে আমার পক্ষে তাদের সামলানো কঠিন হয়ে পড়ে। তারা বার বার আমায় উচ্চৈঃস্বরে অনুরোধ করে তাদের একটিবার ছেড়ে দিতে যাতে তারা নিজেদের অপমানের পুরোদস্তুর শোধ তুলতে পারে। আমার তখন একমাত্র চিন্তা যদি তারা একবার হাতছাড়া হয় ত খুনোখুনি অবশ্যম্ভাবী ও সেক্ষেত্রে পুলিশ দোষের ভাগী হবে। তাই আমি বার বার তাদের শান্ত হতে বলি ও সাহস দিই তাদের কোন ভয়ের কারণ নেই।

ওই বিভ্রাটের মধ্যে কোন গতিকে যখন আমরা এক তেমাথায় এসে পৌছাই তখন হঠাৎ রাস্তার পার্শ্ববর্তী এক বাড়ির ছাত থেকে দমাদম্ ইঁট আমাদের ওপর এসে পড়ে। ঠিক সেই সময় আমি দেখি একদল মুসলমান আমাদের বাঁ দিককার এক গলির মাথা থেকে আমাদের লক্ষ্য করে ঢিল ছুঁড়ছে। আমি তখন তাদের শায়েস্তা করার উদ্দেশ্যে সেই দিকে ছুটে যাই। ইত্যবসরে একদল সশস্ত্র পুলিশ হঠাৎ তাদের আশ্রয় থেকে বেরিয়ে আসে ও সেই লোকগুলোকে লক্ষ্য করে

গুলি চালায়। তারা নিশ্চয় অন্ধকারে আমায় দেখতে পায়নি। বিপদ দেখে আমি চট করে এক দেয়ালের আড়ালে আশ্রয় নিই ও চিৎকার করে তাদের গুলি চালাতে বারণ করি। আমার কপালগুণে সেদিন আমার প্রাণরক্ষা হয়। কিন্তু একজন কারুর মরবার ছিল বলে দেখা গেল এক অজানা ভিখারী জাতীয় লোক গুলির ঘায়ে মরে পড়ে আছে।

যেমন সাধারণতঃ হয়ে থাকে গুলি ছোঁড়ার সঙ্গে সঙ্গে দু পক্ষেরই সমস্ত লোক যে যার প্রাণ নিয়ে পালায়। মিনিট খানেকের মধ্যে পুলিশের লোক ছাড়া সেখানে একটি প্রাণীও দেখা যায় না। তাতে আমাদের সুবিধাই হয় ও ঠাকুরের রথকে যথাস্থানে পৌছে দিতে আর কোন বেগ পেতে হয় না। রাত তখন ১২টা। তারপর থেকে ২৪ ঘণ্টা পর্যন্ত কারফিউ জারি করা হয় ও তারই মধ্যে শহরের অবস্থা অনেকটা শুধরে যায়।

ঘটনার পরদিন সকালে আমি যখন শহর প্রদক্ষিণ করে বেড়াচ্ছি তখন দেখি এক পুলিশ কনস্টেবল বিষণ্ন বদনে স্বস্থানে দাঁড়িয়ে পাহারা দিচ্ছে। তার পেটে কিছু পড়েছে কিনা জিজ্ঞেস করায় সে হাঁ না কিছু না বলে চুপ করে থাকে। কিন্তু তার চোখ দুটো যেন ছলছল্ করে ওঠে। আমি তাকে দ্বিতীয়বার প্রশ্ন করায় সে অতি ক্ষীণ স্বরে জানায় গত রাত্রির থেকে সে জলস্পর্শ পর্যন্ত করেনি। তার কথা শুনে তার কর্ত্তব্যপরায়ণতার জন্য আমি গর্ব অনুভব করি ও তার পিঠ চাপড়ে দিই। তাছাড়া যত সেপাই তাদের ডিউটিতে অভুক্ত অবস্থায় ছিল তাদের পানাহারের ব্যবস্থা করি।

উপরোক্ত ঘটনাটা ১৯৪৫ সালের। আজও তবু দেওবন্দের হিন্দুরা তাদের সাবেক মিছিলের পুনরুত্থানের জন্য কর্তৃপক্ষের কাছে নিজেদের ঋণী বোধ করে।

অতীত গৌরব

এক কালে রাজা মহারাজাদের যে এক প্রতিষ্ঠান ছিল সে আজ লোপ পেয়ে গেছে। কিন্তু এমন একদিন ছিল যখন প্রাচীন ভারতবর্ষ বলতে যা বোঝায় তার এক ঝলক শুধু ওই রাজা মহারাজাদের রাজ্যে দেখতে পাওয়া যেত।

একবার গাড়ি করে ঝাঁসি থেকে আগ্রা যাবার পথে আমার দতিয়া ও ধোলপুর এই দুই রাজওয়াড়া দেখার সুযোগ ঘটেছিল।

দতিয়া এক প্রকার ঘেরা পুরাতন শহর। সেই প্রাকার ভেদ করে শহরে ঢোকবার যে ক'টা রাস্তা গেছে তার প্রত্যেকটির প্রবেশ পথে একটি করে সিংহদ্বার আজও আছে যার আকার ও গঠন পদ্ধতি দেখলে তাক্ লেগে যায়।

শহরে ঢুকেই আমার মনে হল আমি যেন কোন এক স্বপ্ন রাজ্যে এসে পড়েছি যেখানকার বাড়ি ঘর দোর লোকজন সবই নতুন ধরণের। সেখানকার ছেলে বুড়ো পুরুষ ও স্ত্রী সকলেই যেন আমায় দেখতে উৎসুক। পরে আমি জানতে পারি তাদের শিক্ষা দীক্ষা এরূপ যে তাদের চোখে ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ার কর্মচারী মাত্র এক একটি মহারথী। রাস্তার দুধারেই ছোট বড় পাহাড়। কোনটা দূরে আবার কোনটা কাছে। প্রত্যেকটির চূড়ার ওপর একটি করে সৌধ। কোনটা দুর্গের আকারে আবার কোনটা বা মন্দিরের মত, যেজন্য চূড়াগুলির শোভা দ্বিগুণ হয়ে গেছে।

আমি মহারাজার বাগান বাড়িতে পৌঁছানো মাত্র বিউগ্‌ল বেজে ওঠে ও সেই সঙ্গে মহারাজার নিজস্ব গার্ড আমায় সেলাম জানায়। তাদের নিরীক্ষণ করার পর আমি যখন মহারাজার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে অগ্রসর হই তখন দেখি

মহারাজা স্বয়ং তাঁর সভাসদদের সঙ্গে ধড়া চূড়া পরে আমার অভ্যর্থনার জন্য তাঁর বাগান বাড়ির পোর্টিকোতে দাঁড়িয়ে। তিনি আমায় তাঁর বসবার ঘরে নিয়ে যান ও নিজের পাশে এক সোফার ওপর তাঁর সভাসদদের মুখোমুখি বসান। আমায় দেখে তাদের যেমন কুণ্ঠা লাগছিল আমারও তাদের দেখে তেমনি লাগছিল।

মহারাজার বসবার ঘরের দেয়ালের ওপর বিদেশী আর্টিষ্টদের আঁকা বহু ছবি টাঙান ছিল। তাদের মধ্যে একখানা পেন্টিং আমার দৃষ্টি বিশেষভাবে আকর্ষণ করে। সেটা ছিল মহারাজাকে কেন্দ্র করে তাঁরই দশহরা মিছিলের ছবি। আমার অনুমান ছবিখানা তৈরী করতে মহারাজার অনেক টাকা খরচ হয়েছে। শুধু দতিয়ার মহারাজা কেন সেকালে অধিকাংশ রাজা মহারাজাদের বিদেশী আর্টিষ্টদের আঁকা ছবির প্রতি এক মোহ ছিল।

মহারাজার বসবার ঘরখানা যে এককালে খুব জাঁকজমকের ছিল সেটা দেখেই বোঝা যাচ্ছিল। তার অবস্থা কিন্তু অনেক দিন ধরে ঝাড়াপোঁছা না করলে যা হয় তাই তখন হয়ে দাঁড়িয়েছিল। কিছুক্ষণ সেখানে বসবার পর আমি যখন মহারাজাকে বলি আমি তাঁর রাজধানী দেখতে উৎসুক তখন তিনি তাঁর এক অমাত্যকে আমার সঙ্গে দিয়ে দেন।

যেসব বিল্ডিং আমি দেখতে যাই তার মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য এক প্রাচীন দুর্গ যা একটা পাহাড়ের মাথায় অনেকটা জায়গা জুড়ে ছিল। সেটা অন্ততঃ পাঁচ-সাতশো বছরের পুরোনো হবে। বড় মহারাণী সেইখানেই তার সাঙ্গ পাঙ্গ নিয়ে বাস করছিলেন। দুর্গের ভিতর আমি এক অস্ত্রাগার দেখি যেখানে পুরাকালে বহু অস্ত্রশস্ত্র রক্ষিত ছিল। সেগুলো দেখে আমার কেবল মনে হচ্ছিল আধুনিক অস্ত্র-শস্ত্রের তুলনায় ওইসব অস্ত্র-শস্ত্র কী ভীষণ সেকেলে ও আজকের দিনে বিজ্ঞানের উন্নতির ফলে অস্ত্রবিদ্যার কী পরিমাণেই না উন্নতি হয়েছে।

দুর্গের আর এক দর্শনীয় স্থানে এক বিরাট দরবার কক্ষ ছিল। সেখানে এক সিংহাসনের ঠিক পেছনে এক চৌকাটের ওপর প্রচ্ছাদিত হলদে সিল্কের এক লেখপট্ট দেখি যাতে বড় বড় সোনালি অক্ষরে মহারাণী ভিক্টোরিয়ার দ্বারা মহারাজকে জি সি এস আই-এর খেতাব দেবার কথা লেখা ছিল। ওই দরবার কক্ষে যতসব মহামূল্য বস্তু রক্ষিত ছিল মায় সেই সোনালি অক্ষরে লেখা লেখাপট্ট সেই শূন্য সিংহাসন, সেই ছাদ থেকে ঝোলানো কাঁচের ঝাড়, সেই দেওয়ালের ওপর ধূলোর এমন এক পুরু আস্তরণ পড়ে ছিল যে সেগুলো যেন দর্শকের কাছে সেখানকার অতীত বৈভব উচ্চৈঃস্বরে প্রচার করছিল।

আমি যখন মহারাজার বাগান বাড়িতে তখন মধ্যাহ্নভোজের সময় হয়ে এসেছিল। আমাদের ভোজনের সামগ্রী স্বদেশী পদ্ধতিতে রূপোর থালা বাটিতে এক শ্বেত পাথরের টেবিলের ওপর সাজানো ছিল। ভোজনের পর আমরা আবার বসবার ঘরে যাই। সেখানে মহারাজা আমায় সসম্মানে এক পানের খিলি ভেট করেন। তারপর আমি যখন রওনা হবার জন্য উদ্যত তখন এক কোর্ট ফটোগ্রাফার এসে জানায় ফটো তোলার জন্য সব প্রস্তুত। আমি দেখি সেটাও যেন এক বাঁধা নিয়মের মত যা মহারাজার কোন অতিথি এলে পালন করা চাই। তেমনি ফটো তোলার ব্যবস্থারও এক ছাঁচ ছিল যা আরেক আমল থেকে চলে আসছিল। মহারাজা আমায় তাঁর ডান ধারে বসান। তারপর অন্যান্য সকলে যখন তাদের মর্যাদা অনুসারে পর পর বসে যায় তখন ফটোগ্রাফার আমাদের ফটো তুলে নেয়।

আমার ওই দতিয়ার ভ্রমণ যেন এক স্বপ্নের মত। তার স্মৃতি এখনও আমার মনের মধ্যে আঁকা। সেখানকার মহারাজা যদিও আমাদের উচ্চশিক্ষিত মহারাজাদের মধ্যে গণ্য ছিলেন না—তবু তাঁর এমন এক বৈশিষ্ট্য ছিল যা সাধারণ লোকেদের মধ্যে দেখা যায় না।

এবার আমি ধোলপুর মহারাজার কথা বলি। তাঁর সঙ্গে আমার দতিয়া যাওয়ার পরদিন দেখা হয়। যদিও তাঁর রাজ্য তেমন বড় ছিল না তবু তিনি চেম্বার অফ প্রিন্সেস-এর অধ্যক্ষ ছিলেন বলে তাঁর খাতির যথেষ্ট ছিল। বিলেতে যে প্রথম রাউণ্ড-টেবিল কনফারেন্স হয় তাতে তিনি মহারাজাদের প্রতিনিধি স্বরূপ গেছিলেন। আমি যেদিন ধোলপুর এসে পৌছাই তার পরদিন সকাল ১১টায় আমার মহারাজার সঙ্গে সাক্ষাতের সময় নির্ধারিত হয়। রাত্তিরে আমি স্টেট গেস্ট হাউসে কাটাই। পরদিন সকালে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে যাবার আগে আমি স্থানীয় পুলিশ সুপারের সঙ্গে গাড়ি করে একটু বেড়াতে বেরোই যে পথ দিয়ে আমরা যাই সেটা জঙ্গলের ভেতর দিয়ে গেছিল। তাই আমার সেই বেড়ানোটা খুব ভাল লাগে। আমাদের পথের দুধারে যে সব রং বেরং-এর গাছপালা শোভা পাচ্ছিল ও আমার মুখের ওপর যে এক সুগন্ধযুক্ত বাতাস এসে লাগছিল তাতে সেটা আরও উপভোগ্য করে তুলেছিল।

যেতে যেতে আমি পথের ধারে একাধিক প্রাসাদ দেখতে পাই। সেগুলো শুনলাম মহারাজা নাকি বিশেষ করে তৈরি করিয়েছিলেন। প্রাসাদের মধ্যে বসে যাতে লোকে বন্য জন্তুজানোয়ারের আসা যাওয়া ভাল করে ও নিশ্চিন্ত মনে

দেখতে পায়। প্রত্যেকটি প্রাসাদ ঘিরে এক ১২।১৪ ফুট উঁচু লৌহশলাকার বেড়া ছিল। বেড়ার বাইরের দিকে জন্তু-জানোয়ারদের আকৃষ্ট করবার জন্য কিছু জল ও লবণালেহের ব্যবস্থা ছিল। মহারাজা নিজে খাঁটি বৈষ্ণব ছিলেন বলে তাঁর রাজ্যের ভিতর কোন রকম পশু শিকার নিষেধ ছিল। এর সব প্রাসাদ তৈরি করাতে মহারাজার নিশ্চয় বহু অর্থ ব্যয় হয়ে থাকবে। কিন্তু তাঁর রাজ্যে ত সেকালে কোন পাবলিক্ একাউন্টস কমিটি ছিল না যারা তাঁর এই পথে বাধা দিতে পারত।

মহারাজ ধোলপুরের মত ওই রকম ছোটবড় প্রাসাদ তৈরি করানোর শখ অন্যান্য মহারাজাদেরও ছিল। সেগুলো আজ শুধু তাঁদের নির্বুদ্ধিতার পরিচায়ক স্বরূপ দাঁড়িয়ে। চিতোর কেল্লার ভেতর মহারাজা উদয়পুরের দ্বারা নির্মিত এক শ্বেতপাথরের অনিন্দ্য সুন্দর প্রাসাদ আছে যা আজ পুলিশ লাইনের কাজ দিচ্ছে যার দুর্দশার সীমা নেই। তেমনি রায়পুরের নবাবের তৈরি করা শহরের বাইরে এক প্রাসাদ আছে যা আজ শুধু জন্তু-জানোয়ারদের বাঁধার কাজে লাগছে। ঐ রকম মহীশূর হায়দ্রাবাদ বরোদা জয়পুর যোধপুর ইন্দোর ও গোয়ালিয়রে অনেক ছোট বড় প্রাসাদ দেখতে পাওয়া যায়।

জঙ্গলের পথ দিয়ে যেতে যেতে আমি একখানি বুইক্ গাড়ি দেখতে পাই। গাড়িখানা হুস করে আমাদের ছাড়িয়ে চলে যায়। তাতে লাল মাড়ওয়াড়ি ধরণের পাগড়ি মাথায় একটি মাত্র লোক বসেছিল। শুনলাম তিনি নাকি স্বয়ং মহারাজ এবং তিনি প্রত্যহ গাড়ি হাঁকিয়ে জঙ্গলের কোন না কোন নিভৃত স্থানে গিয়ে তাঁর পূজো অর্চনা করেন। পূজো শেষ হলে তিনি গাড়ির হর্ন বাজান। সেই শব্দ শুনে অনেক বন্য জন্তুজানোয়ার নির্ভয়ে তাঁর কাছে চলে আসে ও তিনি নিজের হাতে তাদের খাওয়ান।

আরও কিছু দূর যাবার পর আমি এক বিরাট লাল পাথরের মহল দেখতে পাই। সেটা শুনলাম জাহাঙ্গীর বাদশার সময়কার তৈরি। তিনি নাকি যখনই দিল্লির রাজোপচারে থেকে বিরক্ত বোধ করতেন তখন এখানে বিশ্রামের জন্য আসতেন ও সেই অবসরে বাঘ শিকারও করতেন। ১৯২১ সালে যখন প্রিন্স এডওয়ার্ড এদেশে আসেন তখন কয়েকদিনের জন্য এই প্রাসাদে থেকে তিনিও নাকি বাঘ শিকার করেন। তিনি যে ঘরে ছিলেন সেই ঘর এখনও সেই আগেকার মত সাজানো আছে।

এই প্রাসাদের নাম খাস তালাব। এর স্থাপত্য অনেকটা দিল্লীর বা আগ্রার মোগল আমলের মহলেরই মত। এর সামনে এক কৃত্রিম জলাশয় আজও

আছে যা দৈর্ঘে প্রাসারেই অনুরূপ। আমি যে এমন সর্বাঙ্গ সুন্দর হর্ম এমন অপ্রত্যাশিতভাবে দেখতে পাবো তা ভাবিও নি। আশপাশে কোন লোকালয় না থাকায় এটাকে এক স্বপ্নপুরীরই মত দেখতে লাগছিল। মনে হচ্ছিল যে এর প্রত্যেক প্রস্তর খণ্ডে সম্রাট জাহাঙ্গীরের সময়কার লোকেদের সেই পদধ্বনি। তাদেব হাসির হররা বা উচ্চ কোটির গান বাজনা জড়িত হয়ে রয়েছে।

খাস তালাব থেকে আমি সোজা মহারাজার বাসস্থানে যাই। সেটাও দেখলাম পাথরে তৈরী ও আকৃতিতে এক ছোটখাট প্রাসাদেরই মত। মহারাজার অন্যান্য সৌধেরই মত ঘন জঙ্গলের মধ্যে এর অবস্থিতি ও একে ঘিরে এক লৌহ-শলাকাব বেড়া আছে।

আমি মহারাজার ঘরের বাইরে আসতেই দেখি এক বামন ধড়াচূড়া পবে সেখানে প্রহরীর মত দাঁড়িয়ে। খুব সম্ভব লোকটাকে সেখানে বাখার একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল যাতে মহারাজার অতিথিরা তাকে দেখে মজা পান। ওই বকম আমি একবার মহীশূরের মহারাজার প্রাসাদের বাইরে এক সাড়ে সাত ফুট লম্বা লোককে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখি। সেও এক নতুনত্ব ছিল যা ভবিষ্যতে দেখার সম্ভাবনা নেই।

ধোলপুর মহারাজার ঘরে ঢুকে আমি দেখি তিনি তাঁর এক অমাত্যের সঙ্গে বসে দাবা খেলছেন। দাবার ঘুঁটিগুলো সোনার। মহারাজা আমায় জিজ্ঞাসা কবেন, আমি পুলিশের ফ্রেডিং ইয়ংকে জানি কিনা। তারপর তিনি ইয়ং সাহেবের ডাকাত ধরার অনেক কাহিনী আমায় শোনান।

পবে তিনি আব এক-নামজাদা পুলিশ সাহেবের কথা তোলেন যাঁর নাম ছিল ব্র্যামলি। ব্র্যামলি এককালে বেনাবসের পুলিশ সুপার ছিলেন। ১৯১১ সালে যখন সম্রাট পঞ্চম জর্জ ভারতবর্ষে আসেন তখন তাঁকে সম্রাটের পার্শ্বচর হিসেবে নিযুক্ত করা হয়। সম্রাটের বেনারসে অবস্থান কালে একদিন ব্র্যামলি সম্রাটকে বলেন আপনি যদি খাঁটি ভারতবর্ষ ও ভারতবর্ষের লোক দেখতে চান ত আমি আপনাকে যেখানে নিয়ে যেতে চাই সেখানে চলুন। সম্রাট তাতে রাজি হওয়ায় ব্র্যামলি তাঁকে রাতের অন্ধকারে স্বামী ভাস্করানন্দের বাসস্থানে নিয়ে যান। স্বামী ভাস্করানন্দ ব্র্যামলি সাহেবকে আগে থেকেই জানতেন। তাঁর পাশে তিনি এক অপরিচিত ব্যক্তিকে দেখে বলেন—বেটা তোমার সঙ্গে এ লোকটি কে? উত্তরে ব্র্যামলি সাহেব বলেন—বাবা ইনি শাহনশা বাদশাহ। স্বামী ভাস্করানন্দ তখন আর একবার সম্রাটের দিকে ভাল করে চেয়ে দেখেন। তার পর এক শ্লোক উচ্চারণ করতে করতে সম্রাটকে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করেন।

সম্রাট তা দেখে ব্র্যামলি সাহেবকে জিজ্ঞাসা করেন, ইনি কে ও কি বললেন? ব্র্যামলি সাহেব তখন সম্রাটকে বুঝিয়ে বলেন—ইনি আপনার মধ্যে স্বয়ং ভগবানকে দেখতে পেয়ে তাঁরই গুণগান করলেন। কথাটা শুনে সম্রাট যথেষ্ট প্রভাবিত হন ও এদেশের সাধুসন্তদের কথা বিশদভাবে জানবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন।

মহারাজা আর এক কাহিনী লর্ড কার্জনের সম্বন্ধে বললেন। লর্ড কার্জনের নাকি বলা ছিল তাঁর নামে যেসব সরকারি বিজ্ঞপ্তি বেরোয় সেগুলোর ভাষা যেন যতদূর সম্ভব তাঁরই লেখা নোটের ভাষার অনুরূপ হয়। একবার তিনি নাকি বর্মা পোনির সম্বন্ধে তাঁর এক মন্তব্যে লেখেন: আই কনসিডার বর্মা পোনিস টু বী ড্যামড গুড স্টাফ। পরে যখন সেই সম্বন্ধে এক বিজ্ঞপ্তি বেরোয় তাতে লেখা ছিল: হিজ এক্সেলেন্সী দ্য ভাইসরয় এ্যাণ্ড গভর্নর জেনারল ইন কাউন্সিল কনসিডারস্ বর্মা পোনিস টু বী ড্যামড গুড স্টাফ। লাট সাহেবের ত সেটা দেখে চক্ষুস্থির।

মহারাজ আরও কয়েকটা শ্রুতিরোচক কাহিনী আমায় শোনান। তার পর তিনি আমায় আবার আসতে নিমন্ত্রণ করেন ও বলেন আমি এলে তিনি আমায় তাঁর সঙ্গে জঙ্গলের মধ্যে নিয়ে গিয়ে দেখাবেন বন্যজন্তু তার কতদূর বাধ্য। আমার কিন্তু এ বিষয়ে চিরকালের জন্য অনুতাপ রয়ে গেছে যে মহারাজা ধোলপুরের সঙ্গে আমার সেই প্রথম ও শেষ দেখা।

সশরীরে স্বর্গারোহণ

আজ থেকে বছর পঁচিশেক আগে একদিন যখন বাবাণসীব গঙ্গাবক্ষে সাতটা মৃতদেহ একসঙ্গে ভাসতে দেখা যায় তখন সেখানকাব জনসাধাবণেব মধ্যে যে এক চাঞ্চল্যের ঢেউ খেলে যায় সেটা খুব স্বাভাবিক। অবশ্য এক আবটা মৃতদেহ গঙ্গার জলে ভেসে যেতে প্রায়ই দেখা যায়। কিন্তু এক সঙ্গে সাত সাতটা দেহ তাও আবাব পবস্পবেব সঙ্গে দড়ি দিয়ে বাধা অমন ভাবে ভাসতে কখনও দেখা যায়নি। স্থানীয় লোকেদেব মধ্যে এই ঘটনাব প্রথম প্রতিক্রিয়া হয়, নিশ্চয় পেছনে কোন গভীব বহস্য আছে। খুব সম্ভব স্থানায় পুলিশ সেই রহস্যেব সঙ্গে ঘনভাবে জড়িত।

মৃতদেহগুলিকে ঘাটেব ওপব পাশাপাশি সাজিয়ে বাখা হয়। তাদেব মধ্যে একটি বয়স্ক পুরুষের তিনটি সাবালক ও একটি নাবালক মেয়েব ও দুটি নাবালক ছেলের মৃতদেহ ছিল। সেগুলিকে জল থেকে তোলাব সময় দেখা যায় যে বালি দিয়ে ঠাসা কতকগুলি বাসনপত্তর তাদের সঙ্গে শক্ত কবে বাঁধা যাতে তাবা ভেসে না ওঠে। মৃতব্যক্তিদের আকৃতি ও বেশভূষা দেখে তাদেব দক্ষিণ ভারতের তীর্থযাত্রী বলে মনে হয়। দেহগুলিব কোনটাতেই আঘাতেব চিহ্নমাত্র ছিল না। যে ক'টি মেয়ে ছেলের দেহ ছিল তাদের গায়ের গহনা, যথা—গলার হার হাতের বালা বা চুড়ি যথাস্থানে ছিল। তাদের পরনেব কাপড় চোপড়ও সঠিক ছিল।

মৃত ব্যক্তিরা কে বা কোথা থেকে এসেছিল তা প্রথমে কেউ বলতে পারে না। অনেক চেষ্টার পর শুধু এইটুকু জানা যায় যে তারা খুব সম্ভব মীরঘাটে

উমাশঙ্কর পাণ্ডার বাড়ি উঠেছিল। কিন্তু উমাশঙ্করের খোঁজ নিয়ে দেখা যায় সে বাড়ি নেই। তখন তার বাড়ির তালা ভেঙ্গে খানা তল্লাসি করা হয়। ফলে সেখানে জনৈক ভালচন্দের লেখা দুখানা চিঠি পাওয়া যায়। একখানাতে লেখা ছিল :

সকলকে আমাদের নমস্কার। আমাদের কারণে কোন ব্যক্তিকে যেন পীড়িত না করা হয়। আমরা এক নিরুদ্দেশ যাত্রায় আমার কন্যা পুষ্পার খোঁজে চলেছি। ইতি ভালচন্দ বাপুরাও পটেল—১৭.৩.৫১।

আর একখানা চিঠিতে লেখা ছিল :

শনিবার ১৭. ৩. ৫১ কাশীধাম। এই পত্রের দ্বারা আমি ভালচন্দ বাপুরাও পটেল সকলকে জানাচ্ছি যে অদ্য শনিবার ১৭ই মার্চ ১৯৫১ সাল আমার স্বর্গীয় কন্যা পুষ্পার খোঁজে যে অদ্য দেহত্যাগ করেছে আমরা এক নিরুদ্দেশ যাত্রায় চলেছি। ইহা আমাদের নিজস্ব ব্যাপার। কেহ যেন আমাদের সৎ উদ্দেশ্যে বাধা না দেয়। ইহাতে অন্য কাহারও হাত নাই। আমাদের স্থান উমাশঙ্করের জানা নাই। তাহাকে যেন পীড়িত না করা হয়। আমাদের ঘরে যা কিছু সামগ্রী রহিল সেগুলো পণ্ডিত রামখণ্ডি মহারাজকে দান করিলাম।

ইতি—ভালচন্দ বাবুরাও পটেল ১৭.৩.৫১

চিঠিগুলোর সম্বন্ধে সন্দেহের কোন বিশেষ কারণ ছিল না। কিন্তু ঠিক সেই সময়ে এক গুজব রটে যে ভালচন্দ বেনারসে এক মন্দির নির্মাণ করাবার উদ্দেশ্যে তার সঙ্গে সাত লাখ টাকা নিয়ে আসে। টাকাগুলো হাতাবার জন্য খুব সম্ভব উমাশঙ্কর পাণ্ডা ও স্থানীয় পুলিশ মিলে এই হত্যাকাণ্ড করিয়েছে। সেই জন্য চিঠি দুখানা যে খাঁটি তাও চট্ করে ধরে নেওয়া ভুল।

ঘটনার ঘোষণা স্থানীয় ও অন্যান্য সংবাদপত্রে বড় বড় অক্ষরে কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করে প্রকাশিত হয়। ফলে সি আই ডির দ্বারা ইহার বিশদভাবে তদন্তের ব্যবস্থা করা হয়।

সৌভাগ্যক্রমে ভালচন্দের বাক্স-প্যাঁটরা থেকে যেসব কাগজপত্তর বেরোয় তার থেকে জানা যায় যে মৃত ব্যক্তিদের ঠিকানা নার্সারি গার্ডেন, ডাকঘর উভাল, জেলা নাগপুর। তাদের মধ্যে যে কর্তা তার নাম ভালচন্দ বাপুরাও পটেল। বয়স ৯২ বছর। তার স্ত্রীর নাম সীতাবাঈ, বয়স ৩৪ বছর। তার তিনটি কন্যার মধ্যে একটি গঙ্গাবাঈ বয়স ২০ বছর আর একটি সুমন বাঈ বয়স ১৮ বছর ও তৃতীয়টি রেবতী বয়স ১১ বছর। ছেলেদের মধ্যে একটি উদারাম বয়স ১৩ বছর ও অন্যটি শ্রীপাল বয়স ৭ বছর।

ঘটনার তদন্তের ফলে আরও জানা যায় ভালচন্দের একটি দু বছরের মেয়ে পুষ্পা ১৫ই মার্চ কলেরায় কাশীধামে মারা যায়। তার পর দিন ভালচন্দ তার স্ত্রী ও ছেলেমেয়েদের জন্য ৩৮৫ টাকা মূল্যের জামা কাপড় বাজার থেকে কেনে। সেইসব নূতন কাপড় চোপড় পরে তারা সকলে ১৭ই মাচ বিকেলের দিকে বাড়ি ছেড়ে বেরোয়। যাবার সময় ভালচন্দ সকলকে বলে তারা তীর্থ করতে ৩।৪ দিনের জন্য বিন্ধ্যাচল যাচ্ছে। কথাটা কিন্তু তাহা মিথ্যা। আসলে তারা এক ভাড়াটে বজরা করে তুলসী ঘাট থেকে কিছুদূরে মাঝগঙ্গায় এক চড়ার ওপর নেমে পড়ে। এই খবরটা বদ্দু মাঝির কাছে পাওয়া যায়।

বদ্দু মাঝি তার এক জবানবন্দিতে বলে তার বজরা যখন সেই চড়ায় গিয়ে লাগে তখন ভালচন্দ ও তার পরিবারের সকলে সেখানে নেমে পড়ে ও বালি দিয়ে শিবের এক মূর্তি গড়ে। তারপর ভালচন্দ তাকে বলে তুমি এখন যাও। আমার কাজ সারা হলে আমি তোমায় হাঁক দেবো। তুমি সেটা শুনেই চলে এস। তারপর যখন বদ্দু দেখে রাত অনেক হয়েছে অথচ ভালচন্দের কোন সাড়া-শব্দ নেই তখন সে তার ছিপ্ নৌকো বেয়ে সেই চড়া পর্যন্ত যায়। সেখানে গিয়ে সে দেখে তার বজরার ওপর ভালচন্দ ও তার স্ত্রী পুত্র কন্যা সার সার মরে পড়ে আছে। এই অবস্থায় তার কি করা উচিৎ স্থির করতে না পেরে সে সোজা উমাশঙ্কর পাণ্ডার বাড়ি তার পরামর্শ নিতে যায়। উমাশঙ্কর তার সঙ্গে নিজের দুজন লোক দিয়ে দেয়। তারা তিনজন মিলে তখন উজান বেয়ে বজরাটাকে রাতের অন্ধকারে গঙ্গার অপর পারে রামনগর ঘাট থেকে কিছুদূর নিয়ে যায়। সেখানে পৌঁছে তারা দেহ ক'টাকে একসঙ্গে দড়ি দিয়ে বেঁধে নিভৃতে গঙ্গার জলে ফেলে দেয়। কিন্তু তার আগে মৃত ব্যক্তিদের সঙ্গে যে ক'টা বাসনপত্তর ছিল সেগুলো তারা বালি ঠাসা করে দেহগুলোর সঙ্গে বেঁধে দেয় যাতে সেগুলো আবার ভেসে না ওঠে। বদ্দু মাঝি আরো বলে যে এই কাজটা সে নিজের প্রাণ বাঁচাতে করে।

দেহগুলির পোষ্ট মর্টমের ফলে তাদের পাকস্থলিতে কিছু মাত্রায় এক বিষাক্ত পদার্থের চিহ্ন পাওয়া যায়। কিন্তু সেই সঙ্গে দেখা যায় যে উপস্থিত ক্ষেত্রে মৃত্যু শ্বাসরোধের কারণে ঘটে। তার থেকে বোঝা যায় যখন দেহগুলিকে জলে নিক্ষেপ করা হয় তখন সেগুলি প্রাণবন্ত অথচ সংজ্ঞাহীন ছিল।

বদ্দু মাঝি যখন ভালচন্দ ও তার পরিবারের অন্যান্য সকলকে গঙ্গার চড়ার ওপর ছেড়ে আসে তখন সেখানে অন্য কারুর উপস্থিতি ছিল না। সে জন্য হয় তারা সহমরণের উদ্দেশ্যে জেনে শুনে একজোট হয়ে বিষ খায় বা তাদের মধ্যে

থেকে কেহ অন্যান্য সকলকে তাদের অজান্তে বিষ খাওয়ায় ও পরে নিজে খায়।

কাজটা যে স্বয়ং ভালচন্দের ভিন্ন আর কারুর নয় তার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়।

ইতিপূর্বে বলা হয়ে গেছে বারাণসীতে ভালচন্দের বাক্স-প্যাটরা থেকে যে সব কাগজপত্তর বেরোয় তার থেকে তার বাড়ির ঠিকানা জানা যায়। সেই ঠিকানা জানার সঙ্গে সঙ্গে এক পুলিশ ইন্‌স্পেক্টর সেখানে যায়। সেখানে পৌঁছে ভালচন্দের সম্বন্ধে খোঁজ খবর নিয়ে সে আবিষ্কার করে যে ভালচন্দ বাল্যকাল থেকে তার মাতামহীর কাছে মানুষ হয়। মহিলার মৃত্যুর পর তাঁর বিষয়-সম্পত্তি সেই পায়। তার ছাত্রাবস্থায় সে কিছুকাল উজ্জয়িনী ও কিছুকাল বারাণসীতে কাটায়। লেখা পড়া তার বেশীদূর গড়ায়নি। তবে ছবি আঁকার দিকে তার ঝোঁক ছিল। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে তার ধর্মের দিকে টান বাড়তে থাকে। মৃত্যুর পর মানুষের কি হয় সে সম্বন্ধে চর্চা করতে তাকে প্রায়ই দেখা যেত। ১৯৪৫ সালে সে তার দুই সাবালিকা কন্যার বিবাহ দেয়।

মহাত্মা গান্ধীর প্রতি ভালচন্দের প্রগাঢ় শ্রদ্ধা ছিল ও তাঁর নিহত হবার পর কিছুদিনের জন্য ভালচন্দের মাথা খারাপ হয়। সেই সূত্রে তার এক সম্বন্ধী রামচন্দ তাকে নাগপুরের ডাক্তার পট্টবর্ধনের কাছে নিয়ে যায়। তিনি তাকে কিছু ওষুধ দেন ও বায়ু পরিবর্তনের কথা বলেন। এই চিকিৎসার ফলে সে কিছু পরিমাণে সেরে ওঠে। তবে লোকদের সঙ্গে মেলামেশা এক রকম ছেড়ে দেয়।

১৯৫০ সালের শেষের দিকে ভালচন্দের তীর্থ যাত্রার ঝোঁক হয়। যাত্রার টাকা যোগাড় করার উদ্দেশ্যে সে তার সম্পত্তির কিছু অংশ বাঁধা দিয়ে মোট ২০১৫ টাকা তোলে। যাত্রার পূর্বে সে তার দুই বিবাহিতা মেয়েদের তাদের শ্বশুরালয় থেকে আনায়। তারপর ৪ঠা মার্চ সে তার পরিবারসহ নাগপুর থেকে রওনা হয়ে পরদিন এলাহাবাদ এসে পৌঁছায়। সেখানে সে প্রায় শ দুয়েক টাকা পূজা ও দান-ধ্যানে খরচ করে। তারপর তারা সকলে বারাণসী যায়। সেখানে ১৫ই মার্চ ভালচন্দের কনিষ্ঠা কন্যা পুষ্পার কলেরায় মৃত্যু হয়।

নাগপুর থেকে যাত্রার পূর্বে ভালচন্দ তার সম্বন্ধী রামানন্দের জিম্মায় এক টিনের বাক্স রেখে যায়। সেই বাক্স থেকে তার আরো কিছু কাগজপত্তর বেরোয়। সেইসব কাগজপত্তরের মধ্যে তারই আঁকা এক রঙ্গীন ছবি পাওয়া যায়। ছবিতে ওপরের দিকে শ্রীকৃষ্ণের ও নীচের দিকে গঙ্গাবক্ষে নিমজ্জমান ভালচন্দ ও তার পরিবারবর্গের প্রতিকৃতি আঁকা ছিল। ছবিখানাতে আবার

দেখানো ছিল উভয় পক্ষ একই যোগসূত্রে বাঁধা। ছবির আশে পাশে তার কয়েকটা মানসিক উদ্গারের কথা লেখা ছিল। আর একখানা ছবিতে আঁকা ছিল তারা যেন সকলে মিলে বারাণসীর মণিকর্ণিকা ঘাটে দাড়িয়ে। তৃতীয় এক ছবির পাশে লেখা ছিল—মোস্ট আর্জেন্ট রিকোয়ার টু এ্যাক্ট ইন গঙ্গা ইফ গড এগ্রিজ উইদিন হোলি। ছবিখানাতে তারিখে দেওয়া ছিল ৩০.১.৫১।

আরো কয়েকখানা ছবির দ্বারা ভালচন্দ তার মনেব ভাব ফুটিয়ে তোলবাব চেষ্টা করেছিল। একটাতে সে এঁকে দেখিয়েছিল এক ব্যক্তি যেন উন্মাদেব মত বলতে বলতে ছুটে চলেছে, "হে প্রভু কেন আমায় মিছে ছোটাচ্ছ? তোমার দর্শন পেতে আর কত দেরী? এই কি তোমার ন্যায়?"

এই স. ছবি ছাড়া ভালচন্দ তার এক ডায়েরিতে তার স্ত্রী পুত্র কন্যা সহ গঙ্গাবক্ষে প্রাণ ত্যাগ করার সংকল্প লিখে রেখেছিল। উপবস্তু এক উইলেব দ্বাবা তার সমস্ত-বিষয় সম্পত্তি স্থানীয় রাম মন্দিরকে দান করে গেছিল।

আসলে এই উদ্ভট ঘটনার অঙ্কুর অনেকদিন ধরে ভালচন্দের মস্তিষ্কে বৃদ্ধি পাচ্ছিল। তার সামান্যও আভাস কিন্তু সে একটিমাত্র প্রাণীকেও দেয়নি।

মোট কথা লোকটা যে ক্ষেপা ছিল তাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহের কারণ নেই। এই ধরণের দৃষ্টান্ত সম্ভবতঃ কোন দেশেরই ইতিহাসে পাওয়া কঠিন।

ভালচন্দের উপর এই হত্যাকাণ্ডের জন্য সন্দেহ করাব আর এক কাবণ আছে। সে যখন তাব পরিবার সহ উমাশঙ্করের বাড়ি থেকে বেরোয় তখন তাদের বিন্ধ্যাচল যাওয়ার কথা সম্পূর্ণ মিথ্যা ছিল। তাছাড়া সে কেনই বা তাব কন্যা পুষ্পার মৃত্যুর পর দিন নিজেদের জন্য বাজার থেকে দামী দামী কাপড় কিনতে যায়, যদি না তার প্রাণের সাধ ছিল তাদের সকলের অন্তিম যাত্রা একটু ঘটা করে হয়?

ইতিপূর্বে বলা হয়ে গেছে যখন ভালচন্দ তার পরিবার সহ মাঝ গঙ্গায় এক চড়ার ওপর নামে তখন তারা সকলে মিলে বালি দিয়ে এক শিবের মূর্তি গড়ে। পূজার পর প্রসাদ বিতরণ করা স্বাভাবিক। তাই অনুমান সেই প্রসাদের সঙ্গে অবসর বুঝে সকলের অলক্ষ্যে সে বিষ মেশায় ও সেটা বিতরণ করবার পর নিজেও খায়। তার পর সকলে সংজ্ঞাহীন হয়ে যায়। তার পক্ষে বিষ যোগাড় করা মোটেই কষ্টসাধ্য ছিল না কারণ তার আয়ুর্বেদ সম্বন্ধে কিছু পড়াশুনা ছিল। ওই জাতীয় ওষুধও সে মাঝে মাঝে লোকেদের দিত।

ভালচন্দের মনে যে সাধ ছিল সেটা প্রকারান্তে বন্দ, মাঝি পূরণ করে যখন সে দেহগুলিকে প্রাণহীন মনে করে একসঙ্গে বেঁধে গঙ্গার জলে ফেলে দেয়।

ঘটনার কিছুদিন বাদে আমি বারাণসী যাই ও ঘটনা সম্বন্ধে স্থানীয় লোকদের ভুল ভাঙ্গাবার উদ্দেশে বিভিন্ন পত্রকারদের এক অধিবেশনে সব কিছু খুলে বলি। তবু সেখানকার সাধারণ লোকদের মধ্যে আজও দৃঢ় বিশ্বাস এই হত্যাকাণ্ডের জন্য উমাশঙ্কর পাণ্ডা ও স্থানীয় পুলিশ পুরোপুরি দোষী। বলাই বাহুল্য এরূপ ভিত্তিহীন অপবাদ নিবারণের কোন পথ নেই।

ভারত সরকারের নির্দেশানুসারে ১৯০৪ সালে ইয়ং হস্‌বেণ্ড সাহেবের অধীনে যে এক সেনাবাহিনী তিব্বতের রাজধানী লাসা পযন্ত যায় তার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল তিব্বতের সঙ্গে ভারতবর্ষের ব্যবসা বাণিজ্যের এক যোগসূত্র নতুন করে গড়ে তোলা। ইতিহাসের পাতায় এই সামরিক অভিযান ইয়ং হস্‌বেণ্ড মিশন নামে পরিচিত। এর ফলে তিব্বতের সঙ্গে যে এক চুক্তি হয় সে অনুসারে ভারত থেকে লাসা পর্যন্ত যাবার পথে স্থানে স্থানে ভারতীয় সেনা বসানো হয়। তাদের কাজ ছিল আমাদের দেশ থেকে যে সব মাল তিব্বতে যেত ও তিব্বত থেকে যে সব মাল এ দেশে আসত তার তদারক করা।

তারপর থেকে ১৯৪৭ পর্যন্ত যখন ভারত স্বাধীন হয় এই ব্যবস্থা ভালভাবেই চলে আসছিল। গোল বাধল যখন চীনেরা তিব্বতে এসে ঢুকলো। তখন আমাদের সৈন্য সামন্ত সেখান থেকে ফিরে আসতে বাধ্য হয়। সেই থেকে তিব্বতের সঙ্গে আমাদের ব্যবসা বাণিজ্যের কোন আদান-প্রদান আদপেই নেই ও আমাদের সেখানে যাওয়া আসাও বন্ধ হয়ে আছে।

১৯৫০ সালের মাঝামাঝি উত্তর প্রদেশের সরকারের কাছে এক চাঞ্চল্যকর খবর আসে যে চীন সরকার তিব্বতের স্থানে স্থানে আমাদের সীমানার পরপারে বিস্তর লোকজন লাগিয়ে পাকা রাস্তা বিমান ঘাঁটি ও সেনাবাস তৈরি করাতে ব্যস্ত। উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী পণ্ডিত গোবিন্দবল্লভ পন্থ তখন দিল্লি গিয়ে প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলালের সঙ্গে এ সম্বন্ধে আলাপ করেন। প্রধান মন্ত্রীর কিন্তু সে সময় ধারণা ছিল চীনেরা কোনকালে আমাদের সঙ্গে বিশ্বাস-

ঘাতকতা করবে না। তাই তিনি বললেন তিব্বত থেকে এ দেশে আসার মুখে যেসব ঘাঁটি আছে সেখানে একটা করে পুলিশ চৌকি বসানো হলেই সব গোল চুকে যাবে। আমি তখন উত্তর প্রদেশের আই জি পুলিশ। সেই সূত্রে আমার কাজ হল হিমালয়ের ক্রোড়ে ঘুরে ফিরে এমন কয়েকটা জায়গা খুঁজে বার করা যেখানেই সব চৌকির লোকদের থাকবার ব্যবস্থা করা যেতে পারে। আমি যে ক'টা জায়গা মনোনীত করি তার মধ্যে একটা ছিল ধারচুলা। অন্য দুটো ছিল উত্তর কাশী ও যোশীমঠ।

ধারচুলা আলমোড়া থেকে ৮০ মাইল। সেখান থেকে আবার তিব্বতে যাবার গরবিয়াও পাথ আরও ছয় মাইল। সেকালে ধারচুলা যেতে হলে পাহাড়ের ভেতর দিয়ে ওই ৮০ মাইল পথ হেঁটে যাওয়া ভিন্ন কোন উপায় ছিল না। আমি তাই ১৯৫১ সালের এপ্রিল মাসের একদিন চালকলা বেঁধে আলমোড়া থেকে পদব্রজে রওনা হই। দিনে ১২/১৪ মাইল অতিক্রম করার পর আমি ছয়দিনের দিন ধারচুলা গিয়ে পৌছাই। পথে যে ক'টা সরকারি বিশ্রাম ঘর ছিল সেখানে আমার রাত কাটাবার ব্যবস্থা ছিল। আমি প্রতিদিন নিয়মিতরূপে ভোর ৪½টা নাগাদ উঠে আমার প্রাতঃকৃত্য সেরে পাঁচটা নাগাদ বেরিয়ে পড়তাম। তারপর মাইল ৬/৭ অতিক্রম করার পর পথের ধারে কোথাও বসে আমার মধ্যাহ্ন ভোজন করে সেইখানেই ঘণ্টা দুয়েকের মত বিশ্রাম করতাম। সেখান থেকে বিকেলের দিকে আবার বেরিয়ে পথের ধারের কোন এক বিশ্রাম গৃহে গিয়ে উঠতাম ও সেখানে রাত কাটাতাম।

পার্বত্য পথের এক বিশেষত্ব কখনও সেটা হুড় হুড় করে হাজার খানেক ফুট নেমে গেছে তেমনি আবার কখনও হাজার খানেক ফুট খাড়া উঠে গেছে। ওই ওঠা-নামা পথের মধ্যবর্তী ছোট বড় নদী পার হতে হয়। নামতে ততটা পরিশ্রম হয় না যতটা উঠতে। তবে নামাটাও সাবধানে করতে হয় নয়ত হোঁচট খাবার সম্ভাবনা থাকে। ওঠার সময় ত সমানে ঘাম ঝরতে ও ঘনঘন নিঃশ্বাস পড়তে থাকে। কোথাও কোথাও রাস্তা এমন খাড়া দেখতে পাওয়া যায় যে মনে হয় এই বুঝি বুকে ঠেকল। শুধু যে পথটুকু সমতল ভূমি দিয়ে গেছে সেইটুকু আরামে যাওয়া যায়।

ওই যে আমি সমানে ওঠা নামার কথা বললাম তাতে নিঃসন্দেহে যথেষ্ট পরিশ্রম হয়। কিন্তু পার্বত্য জলহাওয়ার এই গুণ যে অল্পক্ষণের মধ্যেই সমস্ত ক্লান্তি দূর হয়ে যায়। রাত হতে না হতেই চোখের পাতা যেন আপনিই বুজে আসে। রাতের গভীর নিঃস্তব্ধতা ভেদ করে যদি বা কোন নির্ঝরণির বা

জলপ্রবাহের অস্ফুট ধ্বনি ভেসে আসে ত সেটাও যেন ঘুমপাড়ানি গানের মত শোনায়। ইংবাজিতে যাকে বলে স্পিকিং সাইলেন্স তার উপলব্ধি ওই সব অঞ্চলেই হয়।

পার্বত্য পথেব আর এক বিশেষত্ব। এক জায়গা থেকে অন্য এক জায়গার দূরত্ব সহজে অনুমান করা যায় না। এই যেমন কোন এক পাহাড়ের বাঁক ঘুবেই আমি দেখছি আমার পথ কাছেই সামনেকার আর এক পাহাড়ের গা বেয়ে চলে গেছে। অথচ কাজের বেলায় সেখানে পৌছাতে হলে আমায় মধ্যবর্তী আরও পাঁচটা পাহাড় ছাড়িয়ে যেতে হচ্ছে।

হিমালয়ের দুই মূর্তি। একটি সৌম্য অন্যটি রুদ্র মূর্তি। সাধারণতঃ সৌম্য মূর্তি চোখে পড়ে। এক একটা পাহাড় এমন আছে যে তার দিকে চেয়ে থাকলে চোখ ফেরানো যায় না। কেবলই মনে হয় না-জানি কত কাল ধরে সেই একই স্থানে সে অচল অটল ভাবে দাঁড়িয়ে। কালের প্রবাহ তার ওপর একটি মাত্রও আঁচড় কাটতে পারেনি। সে মহারাজাধিরাজ অশোকের সময় যেমনটি ছিল আজও ঠিক তেমটি আছে। তাব সামনে আমাদের দৈনন্দিনের কারবাব বা পরস্পরের ঝগড়াঝাঁটি অতিশয় তুচ্ছ বলে মনে হয়। প্রাণে বেশ শান্তি আসে।

হিমালয়ের রুদ্র রূপ সর্বপ্রথম আমার চোখে পড়ে আমি যখন একবার বদ্রীনাথের পথে দেখতে পাই অদূরে ধোঁয়ার মত ধূলার কুণ্ডলি আকাশের দিকে ভেসে চলেছে। খোঁজ নিয়ে জানলাম এক সময় সেখানে নাকি এক গ্রাম ছিল। এখন সেটা অদৃশ্য হয়ে গেছে তবু পাহাডের ভাঙ্গন এখনও থামেনি।

আর একবার হিমালয়েরই মধ্যবর্তী এক জায়গায় যেতে যেতে আমি দেখতে পাই আমার পাশের এক পাহাড়ের শীর্ষদেশ থেকে একের পর এক বড় বড় পাথরের খণ্ড গড গড় করে লাফাতে লাফাতে নেমে আসছে ও তীব্র বেগে নীচের এক গভীর খাদের মধ্যে গিয়ে পড়ছে। কোন যাত্রী যদি সেই প্রস্তরখণ্ডের সামনে পড়ে তাহলে সেই মুহূর্তেই তার ইহলীলা সাঙ্গ হতে বাধ্য। আমি শুনেছি বর্ষাকালে যে সব কুলি-মজুর ওইসব রাস্তাঘাট মেরামতের কাজে লেগে থাকে তাদের মধ্যে এক-আধজন মাঝে-মাঝে ওইভাবে তাদের প্রাণ হারায়।

বদ্রীনাথ যেতে পাতাল গঙ্গার পাশ দিয়ে যে পথ গেছে তাতে ত সমানে ভাঙ্গন লেগেই আছে। সেই জন্য যাত্রীদের সেটা খুব সাবধানে পার হতে হয়। অথবা সেটা বাদ দিয়ে আর এক ঘোরা পথ ধরতে হয়। হিমালয়ের অন্দরে কন্দরে এই খখন হয়েই চলেছে। কখনও কখনও মেঘের গর্জনের মত শব্দ ওঠে।

বৃষ্টি নেই ভূমিকম্প নেই তবু পাহাড়ের অংশ ভেঙ্গে পড়ে। কখনও কখনও আবার এক তুষার চূড়া খসে যাকে ইংরাজিতে আভালান্স বলে তারই সৃষ্টি করে। শোনা গেছে ওই রকম আভালান্সের ফলে সুইজারল্যাণ্ডে নাকি বহু-লোক প্রতিবছরে মারা যায়।

হিমালয়ের রুদ্র রূপেরই আর এক দিক আমার চোখে পড়ে আমি যখন যাটুং থেকে হেঁটে কালিম্পং ফিরছি। ঘটনা কুপুপ ও নেটং-এর মাঝামাঝি হয়। সেদিন বিকেল তিনটে নাগাদ আকাশে হঠাৎ একখণ্ড মেঘ দেখা দেয়। দেখতে দেখতে সেটা সমস্ত নভোমণ্ডল ছেয়ে ফেলে। তারপর এক বিকটধ্বনির সঙ্গে সঙ্গে বৃষ্টির বড় বড় ফোঁটা আমার গায়ে এসে পড়ে। আরও এক আধ মিনিট যেতে না যেতেই এক তুমুল জল ঝড় আমার গতিরোধ কবার উপক্রম করে। মনে হয় যেন অগুনতি দৈত্যদানব মিলে ধরাতল আক্রমণ করেছে। তারা পথের আশে-পাশের গাছগুলোর কখনও ঝুঁটি ধরে ভীষণ ঝাঁকানি দিচ্ছে আবার কখনও বা তাদের সমূলে উপড়ে ফেলবার চেষ্টা করছে। বজ্রের কড়্কড়্, গাছের মড়্মড়্ ও সেই সঙ্গে বৃষ্টির তীব্র ঝঙ্কার মিলে এক আতঙ্কের সৃষ্টি করে।

অল্পক্ষণের মধ্যেই রাস্তাঘাট ভেসে যাবার মত হয় ও সেই সঙ্গে পাথরের টুকরো গড়িয়ে পড়তে থাকে। ওই জনমানবহীন পরিবেশে কোন আশ্রয় ত দূরেব কথা মাথা গোঁজবারও স্থানের অভাবে আমার পক্ষে শুধু ত্রাহি মধুসূদন ডাক ছাড়তে ছাড়তে এগিয়ে যাওয়া ভিন্ন কোন উপায় ছিল না। আমার জামা কাপড় ও জুতো জোড়া ভিজে জব্জবে হয়ে যাওয়ায় আমার অবস্থা অনেকটা ঝোড়ো কাকের মত হয়ে দাঁড়ায়।

সৌভাগ্যক্রমে আরো কিছু দূর যাবার পর আকাশ হঠাৎ .রিষ্কার হয়ে যায় : ঝক্‌ঝকে রোদ ওঠে ও প্রকৃতি সদ্য ধৌত অবস্থায় ঝল্‌মল করতে থাকে।

আমি যখন নেটং গিয়ে পৌঁছাই তখন বিকেল ৫টা। সেখানে পৌঁছে আমার প্রথম কাজ হয় জামা কাপড় ছেড়ে এক কাপ গরম কফি খাওয়া। আঃ তাতে আমি কি আরামই না পেলাম!

এবার আমি আলমোড়া থেকে ধারচুলা অভিমুখে আমার যাত্রার কথায় ফিরে আসি।

আলমোড়া অতি রমণীয় স্থান। সেখান থেকে যেদিকেই দৃষ্টি যায় পাহাড়ের গায়ে মানুষের হাতে গড়া স্তরে স্তরে ক্ষেতের ধাপ চোখে পড়ে।

কোন কোন পাহাড়ের মাথায় আবার পাইন গাছের গুচ্ছ যেন প্রহরীর মত দাঁড়িয়ে। আলমোড়ার নীচ দিয়ে যে কালী নদী গেছে তার ওপারে কাতারে কাতারে শৈলশ্রেণী দেখা যায়। একের পেছনে মাথা তুলে আর এক—তার চেয়েও উঁচু পাহাড়। এমনি করে তারা যেন দিগন্তে গিয়ে মিশেছে।

আলমোড়া থেকে কিছুদূর যাবার পর দেখি রাস্তার একপাশে পাহাড়ের গায়ে সারি সারি চিড় গাছ দাঁড়িয়ে। প্রত্যেকটির গুঁড়িতে একটি করে ক্ষতচিহ্ন। তার থেকে ফোঁটা ফোঁটা রস গড়িয়ে এক মাটি বা টিনের পাত্রে টস্‌টস্ করে পড়ছে। গাছগুলো থামের মত সোজা ৮০।৯০ ফুট উঠে গেছে। তাদের তলদেশ পাইনের পাতায় মোড়া। এখানে সেখানে আবার পাইন গাছের ফল পড়ে। সেগুলো দেখতে বড় মজার। ঠিক যেন কাঠ খুঁদে আনারসের আদলে তৈরি।

সেখান থেকে আরও মাইল দশেক যাবার পর আমি দেখি আমার পথ কিছুদূর পর্যন্ত পাহাড়ের গা বেয়ে গভীর এক খাদের পাশ দিয়ে চলে গেছে। পথটা এতই সরু যে সেখান দিয়ে যেতে ভয় লাগে। এককালে নাকি কোন এক দুষ্ট ব্যক্তি স্থানীয় লেখপালের ওপর শোধ তোলার মতলবে তাকে ভুলিয়ে-ভালিয়ে সেই পথ দিয়ে নিয়ে যায়। তার পর সুবিধে বুঝে তাকে এমন এক ধাক্কা দেয় যে সে খাদের মধ্যে পড়ে চিরকালের মত অদৃশ্য হয়ে যায়।

আর একদিনের কথা। সেদিন আমি এক উপত্যকার মধ্যে দিয়ে যেতে যেতে পথের ধারে টিন দিয়ে ছাওয়া সুন্দর একটি কুটির দেখতে পাই। সেটি ছিল সেনা-বাহিনীর অবসরপ্রাপ্ত এক সুবেদার মেজরের বাসস্থান। তিনি তার আশে পাশে ফুল ফলের গাছ লাগিয়ে রেখেছিলেন। ফুলের মধ্যে সূর্যমুখী জবা বেল চামেলি ও কুন্দ। ফলের মধ্যে পেঁপে লেবু ডালিম ও কলা।

সুবেদার সাহেব আমায় তাঁর বাড়িতে জোর করে চা খেতে নিয়ে যান। বহুকাল ধরে সেনাবাহিনীতে কাজ করার দরুন তাঁকে যথেষ্ট কেতাদুরস্ত বলে মনে হল। চায়ের সঙ্গে তিনি আমায় তাঁর বাড়ির পেঁপে ও মৌমাছির এক চাক থেকে সদ্য নিংড়ানো মধু খেতে দেন। সে রকম সুস্বাদু পেঁপে বা মধু আমি আগে কখনও খাইনি। এই সামান্য অথচ গভীর আন্তরিকতায় ভরা আতিথ্যের পর প্রায় ত্রিশ বৎসর হতে চলল কিন্তু তার স্মৃতি আজও আমার মনের মধ্যে আগেকারই মত উজ্জ্বল হয়ে রয়েছে।

আমার যাত্রাকালে পথের ধারের একাধিক চায়ের দোকান আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করে। সবগুলি প্রায় একই ধরণের। ছোট্ট অথচ ছিমছাম্।

দোকানের আসবাব পত্রের মধ্যে গোণাগুন্তি চায়ের কেট্‌লি এলুমিনিয়মের বাসন ও পিতলের গেলাস ভিন্ন আর কিছু উল্লেখ্য নয়। আগন্তুকদের বসবার জন্য অবশ্য এক আধখানা কাঠের ভাঙ্গা চেয়ার দোকানের সামনে পড়ে থাকতে দেখা যায়। দোকানে যে কাট্‌তির অভাব সেটা তার আকৃতি দেখেই বোঝা যায়। তবু একটা করে ওই ধরণের দোকান পথের ধারে যেখানে সেখানে থাকা চাই তা না হলে তার অঙ্গহানি হবার কথা।

দোকানের আশে পাশে যে ক'খানা বাড়ি দেখতে পাই সেগুলোও খুব সাধারণ ধরণের ও স্লেট বা টিন দিয়ে ছাওয়া। প্রত্যেকটির ছাদের ওপর পাহাড়ী লাল টকটকে লঙ্কা ও সেই রং-এরই রামদানার গুচ্ছ শুকোচ্ছে যা দূর থেকে পটের ছবির মত দেখতে। তেমনি বাড়ির উঠানে দেখি চাটাই বিছিয়ে শস্য শুকোতে দেওয়া হয়েছে। বস্তীতে অযথা ভীড় নেই। পল্লীর পুরুষ মানুষ দিনের বেলা বেশীর ভাগ নিজেদের ক্ষেতখামার দেখতে ব্যস্ত। কোন রকম হৈ চৈ বা কর্মব্যস্ততা নেই বলে সারা পরিবেশটাকে মনে হয় যেন ঝিমুচ্ছে। এক-আধজন পথিক যদি সেখানে এসে পড়ে তাহলে প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের মধ্যে সে নিজেকে হারিয়ে ফেলতে বাধ্য।

হিমালয়ের ক্রোড়ে যেসব পথ ঘাট গেছে তাদের ওপর দিয়ে প্রায়ই একজাতীয় আদিবাসি যাতায়াত করতে থাকে যাদের ভোটিয়া বলা হয়। তাদের ঘর দোর বলে কোন বালাই নেই। তাদের সারা জীবনটাই তারা পথে পথে কাটায়। গ্রীষ্মের গোড়ার দিকে তারা নিজেদের ভেড়া ছাগল নিয়ে হিমালয়ের আনাচে কানাচে চারণভূমির খোঁজে যায় ও শীতের দিকে নেমে আসে। ওই ক'টা মাস তারা পরিবার সহ নীল আকাশের তলায় কাটায় ও তাদের সঙ্গে যা কিছু খাদ্যদ্রব্য থাকে তাই দিয়ে চালায়। রোদের তেজে বা শীতের হাওয়ায় তাদের সর্বাঙ্গ তামাটে মেরে যায়। ওই সব চারণভূমিকে পাহাড়ী ভাষায় বুগিয়াল বলে ও সাধারণতঃ সেগুলি ১২।১৩ হাজার ফুট উঁচু পাহাড়ের মাথায় দেখা যায়। মে জুন মাসে বরফ গলার সঙ্গে সঙ্গে তার তলার ঘাস চাড়া দিয়ে ওঠে ও হাজার হাজার ভেড়া ছাগলের খোরাক জোগায়। অমন রসাল ও পুরু ঘাস কেবল ওইসব অঞ্চলেই জন্মায়।

ফুলের বাহারও ওই সব অঞ্চলেই দেখবার মত। ডালিয়া থেকে আরম্ভ করে ফ্লাক্স পিটুনিয়া কোরিয়োপ্‌সিস্‌ আইবিস্‌ লার্কস্পর স্যালভিরা ডেজি ইত্যাদি যাবতীয় ফুল যেগুলিকে আমরা মৌসুমী ফুল বলি সেখানে জুলাই আগষ্ট মাসে অজস্র ফুটে থাকে ও স্থানে স্থানে নন্দন কাননের সৃষ্টি করে।

আমার ধারচুলা যাবার পথে আমি একাধিক ভোটিয়া পরিবারকে তাদের ভেড়া ছাগলের পাল নিয়ে ওপরের দিকে যেতে দেখি। তাদের দেখে হিংসা হয়, কারণ তারা চিরকাল প্রকৃতির কোলে মানুষ ও তাদের চাহিদা খুবই সামান্য।

ধারচুলা যেতে আমি এক রাত্তির কৌসানিতে কাটাই। কৌসানি প্রায় ৭০০ ফুট উঁচু। সেখান থেকে দূরে নীল আকাশের গায়ে এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত একটানা তুষারমণ্ডিত গিরিশ্রেণী দেখা যায় যার তুলনা হয় না। ভোরের দিকে যখন আকাশ পরিষ্কার থাকে তখন সেগুলি আরও ফুটে ওঠে। মনে হয় যেন হাত বাড়ালেই তাদের ছোঁওয়া যায়। বাঁ দিক থেকে তাদের পরিচয় এরূপ। কেদারনাথ চৌখম্বা, নীলকণ্ঠ, নন্দাঘুন্টি, ত্রিশূল, নন্দাদেবী ও পঞ্চচুলি। কৌসানি থেকে হাজার তিনেক ফুট নীচে উত্তরদিকে এক বিশাল উপত্যকা দেখতে পাওয়া যায়। সেখানে বহু সংখ্যক অবসরপ্রাপ্ত সৈনিক বাস করে। ওপর থেকে তাদের ঘরবাড়িগুলি খেলাঘরের মত দেখায়। আবার সন্ধ্যার পর যখন তারা তাদের ঘরে ঘরে প্রদীপ জ্বালায় তখন সেগুলো অসংখ্য জোনাকির মত ঝিক্‌মিক্ করে। সেও এক দেখবার মত।

আলমোড়া থেকে রওনা হবার ছয় দিনের দিন আমি বিকেল ৪টে নাগাদ ধারচুলা পৌছাই। ইতিমধ্যে আমার ক্যাম্পের লোকজন সেখানে পৌছে আমার তাঁবু খাটাবার কাজে লেগে গিয়েছিল। তাদের কার্যকলাপ দেখতে স্থানীয় ছেলে বুড়ো পুরুষ ও স্ত্রী তাদের ঘিরে দাঁড়িয়েছিল। আমি আসায় তাদের ভীড় যেন আরও বেড়ে যায়। আগন্তুকদের মধ্যে একটি মেয়ে আমায় একখানি চিঠি ও কিছু খাদ্রদ্রব্য দেয়। চিঠিখানিতে লেখা ছিল—প্রিয় ইন্সপেক্টর জেনারেল—আপনাকে ধারচুলায় আমাদের অভ্যর্থনা জানাচ্ছি। আমি আপনার জন্য আমার বাড়ির তৈরি একটা কেক্ ও এক বোতল চেরির মোরব্বা ভেট পাঠাচ্ছি। আশা করি আপনি তাহা গ্রহণ করে আমায় কৃতার্থ করবেন।

চিঠিখানা পড়ে আমার আশ্চর্য লাগল। খোঁজ নিয়ে জানলাম ভেটগুলি এক স্থানীয় কানাডিয়ান মিশনের মহিলা পাঠিয়েছেন। মহিলাটিকে আমার ধন্যবাদ জানাবার জন্য পরদিন সকালে দেখা করবো বলে আমি স্থির করি।

সন্ধ্যা হতে তখনও বেশ খানিকটা দেরী ছিল। তাই ধারচুলা জায়গাটা কেমন আবিষ্কার করতে আমি হেঁটে বেরিয়ে পড়ি। আমি দেখি তার দুধারেই পাহাড়। মাঝে যে এক সমতলভূমি আছে তাকে দুভাগ করে এক নদী বয়ে গেছে। নদীর একধারে কিছু ঘরবাড়ি। বাকী জমিটায় ক্ষেত খামার।

বাড়িগুলোর আশে পাশে আবর্জনার স্তূপ হয়ে আছে। পচা জল, মানুষ ও পশুদের মলমূত্র মিলে সেটাকে যতদূর সম্ভব নোংরা করে রেখেছে। বাড়ির ভিতরেও তেমনি নোংরা ও জন্তু জানোয়ারদের বিষ্ঠায় ভর্তি। স্থানীয় লোকেদের মধ্যে যে শিক্ষাব অভাব সেটা তাদের থাকার পদ্ধতি দেখেই স্পষ্ট বোঝা গেল।

মাঠ ময়দান সব তখন খাঁ খাঁ করছে বলে জন্তু-জানোয়ারগুলো তাদের ক্ষুধা নিবারণের উদ্দেশে এধার ওধার বৃথাই ঘুরে বেড়াচ্ছে। জলেরও খুব অভাব বলে মনে হল সেটা পূরণ করার জন্য দেখলাম এক দল মেয়ে কলসী কাঁধে নদীতে নেমে যাচ্ছে। একটি মাত্র কাঁচা রাস্তা গ্রামের মধ্যে দিয়ে চলে গেছে। লোকে সেই পথ ধরে এককালে কৈলাস মানসসরোবব তীর্থ দর্শন করতে যেত। উপস্থিত কিন্তু গারবিয়াঙ পর্যন্তই যাওয়া চলে। সেখানে এ দেশেব এক চেক-পোষ্ট বা পুলিশ চৌকি আছে। সেটা ছাড়িয়ে যাওয়া মানা।

ধারচুলা থেকে আধমাইলটাক দূবে গারবিয়াঙ-এর পথে আমি এক উষ্ণ প্রস্রবণ দেখতে পাই। ওই রকম উষ্ণ প্রস্রবণ পার্বত্য প্রদেশেব অনেক জায়গায় দেখা যায়।

সন্ধ্যা হবার পূর্বে আমি স্থানীয় এক আমেবিকান মিশন দেখতে যাই। মিশনটি চালাবার ভার এক আমেবিকান দম্পতির ওপর ছিল। দেখলাম, তারা তাদের এক শিশু-সন্তানসহ বেশ সুখে-স্বচ্ছন্দে সেখানে আছে। ওই বিদেশ-বিভূঁয়ে তাদেব কিছুবই অভাব নেই। দুধ দই মাখন ডিম মাংস শাক-সবজি থেকে চাল পর্যন্ত তারা নিজেদেবই উদ্যমে উৎপাদন করছে

সন্ধ্যা হতেই আমি আমার ক্যাম্পে ফিরে এলাম। তখন চারিধার নিঝুম হয়ে গেছে। মানুষ বা পশু-পক্ষীদের কোন সাড়া-শব্দ নেই। "তারা পাখীর ডাকে ঘুমিয়ে পড়ে পাখীব ডাকে জেগে" লাইনটা যেন তাদেরই লক্ষ্য করে লেখা হয়েছিল। আমিও সারাদিন হাঁটবার পব ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম। তাই আমার আহাব তাড়াতাড়ি সেরে তাড়াতাড়ি ঘুমিয়ে পড়লাম।

পরদিন সকালে আমি সেই কানাডিয়ান মহিলার বাসস্থানে যাই। সেটা দেখি আগাগোড়া কাঠের তৈরি। আবার মাটি থেকে ফুট চারেক ওপরে। তাতে একটা মাত্র ঘর ও তাতে ঢুকতে হলে এক কাঠের সিঁড়ি বেয়ে উঠতে হয়। আমি সেই ঘরখানাতে ঢুকেই দেখি মহিলা আমার জন্য অপেক্ষা করছেন। তাঁকে দেখে আমার আশ্চর্য লাগল। তাঁর বয়স মনে হল বড় জোর ২০/২২ হবে। তাই দেখে তাঁর ইতিবৃত্তান্ত সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা না করে থাকতে পারলাম না। যা তাঁর মুখে শুনলাম তাতে বুঝলাম তাঁর বাড়ি

মনট্রিয়লে। সেখানে তাঁর বাপ মা ও এক ভাই থাকেন। তাঁরা অবস্থাপন্ন লোক। মহিলার ছোটবেলা থেকে মিশনে কাজ করাব ঝোঁক ছিল। বড় হতেই তিনি তাতে যোগ দেন। তার কিছুদিন পরে তাঁদের মিশনের মানচিত্র দেখে তিনি স্থির করেন ভারতবর্ষের ধারচুলা অঞ্চলে কাজ করার দরকার আছে। সেই সংকল্প নিয়ে তাঁর এখানে আসা।

কোথায় মনট্রিয়ল আর কোথায় ধারচুলা। তাঁর কাজ স্থানীয় লোকেদের ওষুধপত্তর বিলি কবা ও যে সব তীর্থযাত্রী কৈলাস মানসরোবর আসতে-যেতে অসুস্থ হয়ে পড়ে তাদের সেবা-শুশ্রূষা করা। বিশেষ করে যাদের পায়ে ঘা থাকে সেটা ধুয়ে তাতে মলম পট্টি করা। মহিলাটির সঙ্গী-সাথীদের মধ্যে শুধু দুটি পাহাড়ী মেয়ে ছাড়া আর কাউকে দেখলাম না। তাঁর ইতিবৃত্তান্ত শুনে আমি মনে মনে তাঁর প্রশংসা না করে থাকতে পারলাম না। আশ্চযের বিষয় যেখানে আলমোড়া থেকে আসতে আমারই ছয়দিন লেগে গেছিল সেখানে তিনি নিশ্চিন্ত মনে কালযাপন করছেন। ধন্য সেই মহিলা ও ধন্য তাঁর মাতাপিতা যাঁরা তাঁকে একা ছেড়ে দিতে সম্মত হন।

বিদেশী মহিলাদের মধ্যে এর পূর্বে আরো দুজনকে দেখার সুযোগ আমাব ঘটেছিল। দুজনেই মহাত্মা গান্ধীর শিষ্যা। একজনের নাম মীরা বেন অন্যজনের সবলা বেন।

মীরা বেনের আগেকার নাম মিস্ স্লেভ। তিনি ইংলণ্ডের এক এডমিরলের কন্যা। মহাত্মা গান্ধীর সঙ্গে তাঁর ইংলণ্ডে পরিচয় হয়। আমি যখন তাঁকে দেখি তখন তিনি হৃষিকেশের কাছে জঙ্গলের মধ্যে এক পর্ণ কুটিরে বাস করছেন ও তিনি "পশুলোকের" তত্ত্বাবধান করতে ব্যস্ত। তাঁর কাজ ছিল পরিত্যক্ত গরু বাছুবের দেখাশোনা করা। মহিলাটি দেখলাম দৈর্ঘে ছয় ফুটের ওপর হবেন। পরনে গেরুয়া রং-এর শালোয়ার কুর্তা, গলায় রুদ্রাক্ষের মালা ও মাথায় পাগড়ি। চুল ছোট করে ছাঁটা। বয়স ৫০/৫৫।

সবলা বেনও দেখলাম মীরা বেনেরই মত বিদুষী ইংরাজ মহিলা। আমি যখন কৌসানি যাই তখন তাঁকে দেখি। তিনি কৌসানিরই কাছে এক গ্রামে শ দুয়েক পাহাড়ী মেয়েকে নিয়ে এক আশ্রম খুলে ছিলেন। তাঁর প্রধান উদ্দেশ্য ছিল তাদের এমনভাবে গড়ে তোলা যাতে তারা সম্পূর্ণ স্বাবলম্বী হতে পারে।

আমাদের দেশের জন্য হিমালয়ের নিভৃত অঞ্চলে এই তিনটি বিদেশীনী মহিলার অমন নিঃস্বার্থ সেবা খুবই প্রশংসনীয়। আমার চোখে কিন্তু এই তিনটি মহিলার মধ্যে মনট্রিয়লবাসিনী মহিলাটি সর্বোচ্চ স্থানের অধিকারিণী।

পথের শেষ

আমি কবে ও কিভাবে পুলিশ চাকরিতে ঢুকি সেকথা এই কাহিনীর গোড়াতেই আমার বলা হয়ে গেছে। পরে ১৯৪৭ সালের অক্টোবর মাসে আমি যেভাবে উত্তরপ্রদেশের আই জি পুলিশের পদে নিযুক্ত হই তারও এক ইতিহাস আছে।

ভারত স্বাধীন হবার পূর্বে আমাদের বিদেশী প্রভুরা উচ্চতম পুলিশ সারভিস্ সংক্রান্ত নিয়মকানুন এমন করে বেঁধে রেখেছিলেন যে কোন ভারতীয়ের পক্ষে আই জি কেন ডি আই জিও হওয়া কঠিন ছিল। কথায় বলে বেড়ালের ভাগ্যে শিকে ছেঁড়ে। আমার ক্ষেত্রেও তাই হয়। ভারত যদি স্বাধীন না হত তাহলে আমিও আই জি হতে পারতাম না।

আমি যার কাছ থেকে আমার কার্যভার নিই, তার পরের বছর এপ্রিল মাসে চাকরি থেকে অবসর নেবার কথা ছিল। তিনি দেখেন ভারত স্বাধীন হবার পর অনেক বিষয়ে তাঁর মতের সঙ্গে গভর্ণমেণ্টের মতের সঙ্গে মিল নেই। তাই তিনি হঠাৎ একদিন চাকরি থেকে অবসর গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত নেন। পরদিন সকালে যখন তিনি উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী পণ্ডিত গোবিন্দ বল্লভ পন্থকে নিজের সংকল্প জানান পন্থজী তাতে কোন আপত্তি না করে তাঁর জায়গায় আমার নিযুক্তির আদেশ জারি করেন। খবরটা পাওয়া মাত্র আমি লখনউ যাই ও স্যার জর্জ পিয়ার্সের কাছ থেকে আমার কার্যভার গ্রহণ করি।

আমাদের দেশ এখন এক অসাধারণ সঙ্কটকালের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে। সম্প্রতি ভারত বিভাগের ফলে হাজার হাজার শরণার্থী পাকিস্তান থেকে চলে

এসে এ দেশে তাদের আশ্রয় খুঁজছে। তাদের মন মেজাজ তখন খাপ্পা। তারা পাকিস্তানে থাকতে তাদের আত্মীয় স্বজনের ওপর যা অমানুষিক অত্যাচার প্রত্যক্ষ দেখে এসেছে তার প্রতিশোধ নেবার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। দেশের নানা স্থানে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা চলছে। উত্তরপ্রদেশের পশ্চিমাঞ্চলে বিশেষ করে সাহারাণপুর মিরাট মুজঃফরনগর, বুলন্দশহর ও আলিগড়ে রক্তগঙ্গা বয়ে চলেছে। অথচ পুলিশ তার যথোচিত প্রতিকার করতে পারছে না।

সেনাবাহিনীর কাছ থেকে যেটুকু সাহায্য পাবার কথা তারও কোন আশা ভরসা ছিল না। এ বিষয়ে উত্তরপ্রদেশের তৎকালীন এরিয়া কমাণ্ডার জেনারেল কার্টিস আগে থেকে স্থানীয় শাসনকে সাফ্ জবাব দিয়ে রেখেছিলেন। তিনি বলেন ভারতীয় সেনাবাহিনীকে নতুন করে গড়ে তুলতে অন্ততঃ আরো মাস ছয়েক লাগবে। আসল কথা সে পর্যন্ত ভারতীয় সেনাবাহিনীতে হিন্দু ও মুসলমান সৈনিকদের সংমিশ্রণ চলে আসছিল। সেই জন্য তাদের অধিকার দেওয়া হয়েছিল যাতে তারা ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে একটিকে তাদের ভবিষ্যত কর্মক্ষেত্র হিসেবে বেছে নেয়। ফলে অনেকে যারা পাকিস্তানের নাগরিক তারা পাকিস্তানে যেতে ও যারা ভারতের নাগরিক তারা ভারতে ফিরতে তখন ব্যস্ত। তাদের সশস্ত্র অবস্থায় আসা যাওয়াটা খুন খারাপির আর এক কারণ।

কথায় বলে চোর পালালে বুদ্ধি বাড়ে। অনেকেরই তাই আজ বিশ্বাস মাউণ্টব্যাটেন সাহেব যদি ভারত বিভাগের কাজটা একটু রয়ে সয়ে করতেন অর্থাৎ ছয় মাস এগিয়ে না দিয়ে, পেছিয়ে দিতেন তাহলে খুব সম্ভব তার ফলে দুই দেশে যা রক্তপাত হয় তার মাত্রা অনেক পরিমাণে কম হত।

সেনাবাহিনীর অবস্থার মত পুলিশের অবস্থাও তখন অধিকাংশ প্রদেশে অসন্তোষজনক ছিল। তার উদাহরণ দিতে হলে বলতে হয় পার্টিশনের পূর্বে উত্তরপ্রদেশের উচ্চতম পুলিশ সারভিসের লোকেদের সংখ্যা শ দেড়েক ছিল। তাদের মধ্যে শতকরা ৭৫ জন ব্রিটিশ ও ২৫ জন ভারতীয় ছিল। পার্টিশনের সঙ্গে সঙ্গে ব্রিটিশ অফিসারদের মধ্যে মাত্র দু একজন ছাড়া সকলে দেশে ফিরে যায়। বহুকাল প্রভুত্ব করার পর তারা ভারতীয়দের অধীনে চাকরি করতে মোটেই রাজী ছিল না। অবশ্য যাবার আগে তাদের পেনশন ছাড়া ক্ষতিপূরণ স্বরূপ মোটা টাকা দেওয়া হয়। ভারতীয়দের মধ্যে যারা মুসলমান তাদের মধ্যেও অনেকে পাকিস্তান চলে যায়। ফলে বাদ বাকি যে কয়জন অফিসার হিন্দু বা মুসলমান উত্তরপ্রদেশের উচ্চতম পুলিশ সারভিসে রয়ে যায় তাদের সংখ্যা বড় জোর ২০/২২ হবে।

উত্তরপ্রদেশ শুধু আই পি কেন, পুলিশের অন্য সব স্তরের কর্মচারীরই সে সময় অভাব ঘটে। তার এক কারণ এখানকার সাবেক প্রথা অনুসারে সিভিল পুলিশের কর্মচারীদের মধ্যে মুসলমানদের সংখ্যা শতকরা ৬০/৬৫ জন ছিল। রাইটার হেড কনস্টেবলদের মধ্যে আবার মুসলমানদের সংখ্যা শতকরা ৯৯-এর কাছাকাছি ছিল। সুতরাং এক দিকে নূতন কর্মচারীদের ভর্তি অন্যদিকে তাদের ট্রেনিং-এর হিড়িক লেগে যায়। শুধু ডেপুটি সুপার শিক্ষানবিশদেরই সংখ্যা পঞ্চাশের কোঠায় পৌছায় যখন সাধারণ অবস্থায় ওই স্তরের মাত্র ৩/৪ জন অফিসারদের প্রত্যেক বছরে নেওয়া হত।

তেমনি সাব ইন্সপেক্টর শিক্ষানবিশদের সংখ্যা শ ছয়েক ও কনস্টেবল মুহুরি শিক্ষানবিশের সংখ্যা এক হাজারের কোঠায় পৌছায়।

এদের ছাড়া যে সব সাধারণ নবাগত কনস্টেবলদের ট্রেনিং দেবার ব্যবস্থা ভিন্ন ভিন্ন স্থানে করা হয় তাদের সংখ্যা ন্যূনতম দশ হাজার হবে।

এই গেল সিভিল পুলিশের কথা।

পার্টিশানের পূর্বে উত্তরপ্রদেশের সশস্ত্র পুলিশের সংখ্যা বড় জোর দশ হাজার ছিল। তাদের কাজ ছিল ট্রেজারি বা হাজতে পাহারা দেওয়া। পার্টিশনের পর দেখা গেল প্রদেশের সর্বত্র যেরকম অরাজকতা ছেয়ে গেছে তার উচিত বিধান করতে হলে আরও সশস্ত্র পুলিশের অবিলম্বে দরকার। তাই আরো পাঁচ হাজার সশস্ত্র পুলিশকে ভর্তি করার মঞ্জুরি আমি পাই। সেই সঙ্গে আমায় বলা হয় তাদের যেন মাস খানেকের মধ্যে গড়ে পিটে কাজে লাগাবার মত তৈরী করা হয়।

পাঁচ হাজার সশস্ত্র সেপাই মাস খানেকের মধ্যে ভর্তি করা ছাড়া তাদের পাকা পোক্ত করে তোলা সোজা কথা নয়। আমি তখন ভেবে দেখলাম, যদি ওই সংখ্যায় অবসরপ্রাপ্ত সৈনিকদের যোগাড় করতে পারা যায় ত আমাদের কাজ অনেক পরিমাণে সহজ হয়ে যাবার কথা। সেই অভিপ্রায়ে আমি জেনারেল কার্টিসের সঙ্গে দেখা করি। আমি যখন তাঁকে বলি সশস্ত্র পুলিশের পঞ্চাশটি কোম্পানি আমায় মাস খানেকের মধ্যে খাড়া করতে হবে তখন তিনি আমার কথা হেসে উড়িয়ে দেন। ভাবখানা এই যে কাজটা আমাদের দ্বারা করা অসম্ভব। জেনারেল কার্টিস কেন সব সাহেবদেরই এককালে দৃঢ় বিশ্বাস ছিল তাঁদের দেশে ফিরে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের দেশ রসাতলে যাবে। এইসূত্রে ফ্রান্সের এক সম্রাটের কথা মনে পড়ে যিনি তাঁর মৃত্যুর অনতিকাল পূর্বে নাকি বলেন—আমার গত হবার পর মহাপ্লাবন নিশ্চিত।

আর এক ঘটনা যা এ-সূত্রে বলা চলে। লর্ড মাউণ্টব্যাটেন তাঁর দেশে ফিরে যাবার কিছুকাল পূর্বে একদিন গাড়ি করে লখনউ থেকে কানপুর যান। তিনি লক্ষ্য করেন যেসব পুলিশের সেপাই সাস্ত্রী তাঁকে পাশ দেবার জন্য রাস্তার দুধারে দাঁড়িয়ে তাদের মধ্যে দু-একজন সিগরেট বা বিড়ি ফুঁকছে। সেটা দেখে তিনি নিম্নস্বরে তাঁর এক পার্শ্বচরকে বলেন—দেখেছ, এরই মধ্যে পুলিশের কিরূপ অবনতি হয়েছে?—আমি তখন সবে আই জির পদে নিযুক্ত হয়েছি। বলা বাহুল্য কথাটা যখন আমার কানে যায় তখন সেটা খুবই খারাপ লাগে।

আমি যে বিষয়ের আলোচনা করছিলাম তাতে এবার ফিরে আসি। জেনারেল কার্টিস যখন দেখেন আমাদের প্রযোজনার ফলে বহু অবকাশপ্রাপ্ত সৈনিক পুনর্বার চাকরী পেয়ে যাবে তখন তিনি অনেকটা নরম হয়ে আসেন ও আমাদের সব রকম সাহায্য দিতে সম্মত হন।

সেই এক সময় গেছে যখন পুলিশের সব স্তরে লোকদের ভর্তির এক ধূম পড়ে যায়। যুদ্ধের প্রাক্কালে যেমন পরিবেশ হয় অনেকটা সেই রকম। চতুর্দিকে যেন সাজ সাজ রব। সকলের একই চিন্তা। কি উপায়ে দেশের পুনরুত্থান করা যায়। অনেকে তাদের খাওয়া দাওয়া বিসর্জন দিয়ে তাদের কাজে লেগে যায়। ভগবানের অসীম কৃপায় অসম্ভবও সম্ভব হয়। ইউ পি পুলিশের নাম অল্পদিনের মধ্যে সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। শুধু তাই নয়। এখানকার প্রাদেশিক সশস্ত্র পুলিশের চাহিদা অন্যান্য প্রদেশ থেকে যথা দিল্লী, মধ্যভারত, কাশ্মীর, পশ্চিমবঙ্গ বা আসাম ও হায়দরাবাদ থেকে সমানে আসতে থাকে।

ক্রমশ অপরাধের সংখ্যা কমতে থাকে ও উদ্বাস্তুরা মার দাঙ্গা ছেড়ে শান্তি-পূর্ণ ভাবে কাজে লেগে যায়। এ সূত্রে তাদের অধ্যবসায় ও দৃঢ় সঙ্কল্প প্রশংসনীয়।

আমার বিশ্বাস ভারত স্বাধীন হবার পর পাঁচ বৎসরের মধ্যে যা উন্নতি এদেশে হয় তার তুলনায় পরের পঁচিশ বছরেও ততটা হয় নি।

উত্তরপ্রদেশে যখন একদিকে পুলিশের পুনর্গঠন চলছে তখন অন্যদিকে সুবিধা বুঝে একাধিক কুখ্যাত ডাকাত মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে। যথা আগ্রার মান সিং, এটা জেলার গিরন্দ সিং, এটাওয়ার অমৃতলাল, বদাউর রামভরোসে, ঋষিপাল, ফরাক্কাবাদের বীরে অহির ও শাহজাহানপুরের বশীর পাঠান। তাদের বন্দী করার উদ্দেশ্যে একটা করে বৃহৎ অভিযানের ব্যবস্থা করা হয়।

এই সব অভিযানে মোবাইল রেডিও সেট্ সর্বপ্রথম ব্যবহৃত হয়। মানসিংকে

ধরার উপলক্ষে ওই রকম গোটা চল্লিশ সেট্ কাজে লাগানো হয়। মাচান বা হাতীর পিঠে বসে বাঘ শিকার করতে হলে তাকে যেমন এক গণ্ডি বা ঘেরার মধ্যে ফেলে ক্রমশঃ শিকারীর দিকে ঠেলে আনতে হয় সেই রূপ ডাকাত ধরতে হলে তাকে কখনও কখনও ওই রকম এক বেষ্টনির মধ্যে ফেলতে হয়। তফাৎ এইটুকু বাঘ শিকারের বেলায় ঘেরার পরিধি অপেক্ষাকৃত ছোট হয়। কিন্তু ডাকাত ধরার বেলায় তার পরিধি দশ বিশ মাইলেরও বেশি হতে পারে। রেডিও বা ওয়াকিটকির সাহায্যে ভিন্ন ভিন্ন দলের মধ্যে সম্পর্ক রাখা ও তাদের পরিধি ক্রমশঃ ছোট করে আনা সহজ হয়।

যে অভিযানে রামভরো সে ও ঋষিপালকে ধরার জন্য মনস্থ করা হয় তাতে হাজারখানেক পুলিশ অংশ নেয় ও গোটা কুড়ি ওয়াকিটকি সেট্ ব্যবহৃত হয়।

এই দুই ডাকাত এটা ও বদাউ জেলার মধ্যবর্তী গঙ্গার চরের ওপর লুকিয়ে বাস করত। তারা যখন দেখে গতিক ভাল নয় তখন সেখান থেকে পালিয়ে গঙ্গার নিকটবর্তী এটা জেলার এক গ্রামে আশ্রয় নেয়। পুলিশ সেই গ্রাম ঘিরে ফেলে। তারপর দুই পক্ষের মধ্যে কয়েক ঘণ্টা ধরে ঘোর যুদ্ধ চলে। শেষে পুলিশকে বাধ্য হয়ে হ্যাণ্ড গ্রেনেডের সাহায্য নিতে হয়। ফলে দুই ডাকাতই মারা যায়। তারা মিলে কম করেও শ' খানেক ডাকাতি ও খুন করে থাকবে। এই অভিযান আমার নির্দেশানুসারে ও শ্রীশরদ চন্দ্র মিশ্র ডি আই পুলিশের ব্যক্তিগত তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হয়।

গিরন্দ সিং-এর নৃশংসতা রামভরোসে ও ঋষিপালকেও ছাড়িয়ে যায়। সে যে শুধু লোকেদের প্রাণে মারত তা নয়। যদি সে কাউকে পুলিশের গুপ্তচর বলে সামান্যও সন্দেহ করত তাহলে সেই ব্যক্তির নাক কান কেটে সে শোধ তুলত।

গিরন্দ সিং দুরাত্তির এক জায়গায় কাটাত না। সন্ধ্যার পর সে দলবলসহ কোন এক গ্রামে গিয়ে উঠত তারপর সেখানকার কোন এক অবস্থাপন্ন লোকের বাড়িতে দুর্বাসা মুনির মত আতিথ্য গ্রহণ করত। সে বেচারাকে গরম লুচি ভাজিয়ে সকলকে খাওয়াতে হত। গ্রামের কোন লোক যাতে তার উপস্থিতির খবর থানায় গিয়ে না দেয় সেইজন্য সে গ্রামের চারধারে পাহারা বসাত। পর দিন ভোর হতে না হতে তারা সেখান থেকে রওনা হয়ে সমস্ত দিন বন বাদাড়ে কাটাত ও সন্ধ্যা নাগাদ আর এক গ্রামে গিয়ে উঠত।

লোকে গিরন্দ সিং-এর নামে ভয়ে কাঁপত। অনেকবার তার কপাল জোরে সে পুলিশের হাতে ধরা পড়তে পড়তে বেঁচে যায়। পরে সে যখন শাহজাহান-

পুরের এক গ্রামে তার এক বন্ধুর বাড়ি আশ্রয় নেয় তখন পুলিশ সেই খবর পেয়ে বাড়িখানা ঘিরে ফেলে। তারপর দুই তরফের মধ্যে যা যুদ্ধ বাধে তাতে সে ও তার এক ভাই মুকন্দ সিং নিহত হয়।

বীরে ডাকাতকে ধরতেও পুলিশকে অনেক বেগ পেতে হয়। একদিন গভীর রাতে যখন সে ময়নপুল জেলার এক গ্রামে ডাকাতি করার পর দলবলসহ শহরের রাস্তা ধরে তার আস্তানায় ফিরছিল তখন হঠাৎ একদল সশস্ত্র পুলিশের সঙ্গে তার মুখোমুখি দেখা হয়। সে তার টর্চের আলো তাদের মুখের ওপর ফেলে। সেই আলো লক্ষ্য করে পুলিশের এক সেপাই তার ওপর গুলি চালায়। গুলি তার কনুই-এ লেগে বেরিয়ে যায়। সে ও তার দলের অন্যান্য সকলে তখন অন্ধকারে মিলিয়ে যায়।

ঘটনার দিন পনেরো বাদে যখন তার কনুই-এর ঘা বিষিয়ে যায় তখন সে লুকিয়ে এক ডাক্তারের বাড়ি যায়। পুলিশ সেই খবর পেয়ে তাকে বন্দী করে। আদালত থেকে তার ফাঁসির হুকুম হয়। বীরেও তার জীবনে অসংখ্য ডাকাতি ও খুন করে।

এইসব বাছা বাছা ডাকাতরা পুলিশের হাতে খতম হওয়ার দরুণ উত্তর-প্রদেশের শান্তি ও শৃঙ্খলা যথেষ্ট পরিমাণে উন্নত হয়। কিন্তু তারা যে রক্তবীজের ঝাড়। তাই শুনতে পাই আজকাল নাকি উত্তরপ্রদেশে ডাকাতির সংখ্যা আগের চেয়েও অনেক বেড়ে গেছে।

এবার আমি আমার সময়কার কয়েকটি বিশেষ বিশেষ ঘটনার কথা বলি। তাদের মধ্যে একটি অযোধ্যায় ঘটে। সেখানে এক বিরাট মসজিদ আছে যাকে লোকে বাবরি মস্ক বলে জানে। এককালে সেখানে হিন্দুদের এক মন্দির ছিল। তার নাম ছিল জন্মস্থান। প্রবাদ সেইখানটিতে নাকি শ্রীরামচন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন। কবে ও কার সময় ওই মন্দিরের সৃষ্টি হয় জানা নেই। সেই মন্দির ভেঙে তারই মাল-মশলা দিয়ে বাবর বাদশাহের আদেশে এক মসজিদ ঠিক সেইখানটিতে নির্মাণ করা হয়। এখনও সেই মসজিদের পাথরে হিন্দুদের অনেক দেব-দেবীর মূর্তি খোদাই করা দেখতে পাওয়া যায়। মসজিদের স্থাপত্য মোগল স্থাপত্যের অনুরূপ। এর বিরাট গোলাকৃতি গম্বুজ অনেক দূর থেকে দেখা যায়। মসজিদের প্রাঙ্গণ লোহার রেলিং দিয়ে দু'ভাগে ভাগ করা। তারই একভাগ হিন্দুদের অধিকারে আছে। সেখানে এক চত্বরের ওপর ছোট্ট এক অস্থায়ী ধরণের মন্দিরে শ্রীরামচন্দ্রের বিগ্রহ রাখা আছে। উপস্থিত এটাই জন্মস্থান

নামে প্রসিদ্ধ। এটি হোগলা দিয়ে ছাওয়া ও অযোধ্যার নবাবদের আমলে নির্মিত হয়। মন্দির ও মসজিদ দুই-ই একই জায়গায় থাকাতে সেটা চিরকাল হিন্দু মুসলমানদের মধ্যে কলহের কারণ হয়ে আসছে।

আমি ফয়জাবাদে থাকতে অর্থাৎ ১৯৩৯ সালে এক ঘটনা হয়। সেই ঘটনায় "জন্মস্থানের" দুই পাণ্ডার মৃত্যু হয়। তারা মসজিদের গম্বুজ ফাটিয়ে দেবার অভিপ্রায়ে তাদের বাড়িতে বসে লুকিয়ে বোমা তৈরী করছিল। তাদের অসাবধানতার কারণে সেই বোমা ফেটে যায়।

ভারত স্বাধীন হবার পর স্থানীয় হিন্দুরা উঠে পড়ে লাগে যাতে মসজিদ ষোল আনা হিন্দুদের অধিকারে এসে যায়। একদিন কয়েকজন হিন্দু মিলে রাতের অন্ধকারে চুপি চুপি রাম সীতা ও লক্ষ্মণের মাটির মূর্তি মসজিদের ভেতর বসিয়ে দেয়। পরদিন তারা রাষ্ট্র করে ভগবান রামচন্দ্র স্বয়ম্ভূ হয়েছেন। হিন্দুরা তখন মহোল্লাসে দলে দলে ঠাকুরের পূজা দিতে আসে।

ঘটনা এক অন্তর্দেশীয় বিতর্কের বিষয় হয়ে দাঁড়ায়। মুসলমানেরা ভারত সরকারের কাছে তাদের অভিযোগ জানায়। পণ্ডিত জওহরলাল, মৌলানা আজাদ, হাফিজ ইব্রাহিম ও অন্যান্য নেতারা উত্তরপ্রদেশের তদানীন্তন মুখ্যমন্ত্রী পণ্ডিত গোবিন্দবল্লভ পন্থকে অবিলম্বে এর বিহিত করতে বলেন। পণ্ডিত পন্থ তখন মহা সমস্যায় পড়েন।

এই ব্যাপার নিয়ে পণ্ডিত পন্থের বাড়িতে একদিন গভীর রাত্রে এক বৈঠক হয়। বৈঠকে আমি ছাড়া উত্তরপ্রদেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী লালবাহাদুর শাস্ত্রী ছিলাম। চিফ সেক্রেটারি শ্রীভগবান সহায় ও ফয়জাবাদের কমিশনার শ্রীশ্যামসুন্দর দর উপস্থিত ছিলেন।

আমাদের আলোচনার ফলে স্থির হয় রাত্রের অন্ধকারে সেই বিগ্রহগুলি চুপি চুপি মসজিদ থেকে সরিয়ে জন্মস্থানের মন্দিরে রেখে দেওয়া হয়। এই সূত্রে শ্রীশ্যামসুন্দর ও আমি ফয়জাবাদ যাই। তাছাড়া আমি রাতারাতি শ' পাঁচেক সশস্ত্র পুলিশ ফয়জাবাদে পাঠাবার ব্যবস্থা করি।

বিগ্রহগুলি স্থানান্তরিত করবার ভার স্থানীয় ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেটকে দেওয়া হয়। তিনি কিন্তু এ সম্বন্ধে তাঁর ঘোর আপত্তি জানান। তাঁর মতে হিন্দুরা তাতে ক্ষেপে উঠবে ও তাদের প্রাণ পর্যন্ত দিতে দ্বিধা করবে না। অবশেষে স্থির হয় এই জটিল মামলার নিষ্পত্তি আদালতের ওপর ছেড়ে দেওয়াই বুদ্ধির কাজ হবে। শুনতে পাই মামলা আজও বিচারাধীন।

আর একটি ঘটনা।

একদিন সকাল ১০টা নাগাদ যখন বেরেলি শহরের স্কুল কলেজের ছাত্রেরা বই খাতা হাতে তাদের স্কুল বা কলেজের দিকে যাচ্ছে তখন তাদের মধ্যে দুজনকে এক নবাগত পুলিশের দারোগা আটক করে। তাদের দোষ তারা একই বাইসাইকেলে বসে যাচ্ছিল যা আইন বিরুদ্ধ। তাদের নামধাম জিজ্ঞাসা করায় তারা ক্ষেপে ওঠে। দেখতে দেখতে তাদের সঙ্গী সাথীরা সেখানে এসে জোটে ও তাদের পক্ষ নিয়ে দারোগার সঙ্গে বচসা করে। বচসা হাতাহাতিতে পরিণত হয় ও ধ্বস্তাধ্বস্তিতে দারোগার জামা ছিঁড়ে যায়। ঘটনাস্থলের কাছেই কোতোয়ালি। ঘটনার খবর পেয়ে সেখান থেকে কয়েকজন সেপাই ছুটে আসে ও অপরাধিদের ধরে কোতোয়ালি নিয়ে যায়। তখন বেরেলির ছাত্রসমাজে এক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। তারা দল বেঁধে কোতোয়ালি আক্রমণ করে। সুবিধে বুঝে শহরের অনেক গুণ্ডা তাদের সঙ্গে যোগ দেয়।

অবস্থা সঙ্গীন দেখে বেরেলির কোতোয়াল ঠাকুর সৌদাগর সিং কয়েকজন পুলিশ কর্মচারীর সাহায্যে আক্রমণকারীদের আটক করবার চেষ্টা করেন। তারাও তখন দুম্‌দাম করে কোতোয়ালির ওপর ইট-পাটকেল ছুঁড়তে থাকে। তাতে পুলিশের কয়েকজন আহত হয়। তাই দেখে এক নবাগত পুলিশের দারোগা তার রিভলবার চালায়। রিভলবারের গুলিতে একটি ছাত্র মারা যায়। আক্রমণকারীরা তখন পালাবার পথ পায় না।

স্থানীয় পুলিশের বিরুদ্ধে তখন ধর্মঘটের এক হিড়িক চলে। স্কুল-কলেজ বাজার-হাট তিন দিন ধরে বন্ধ থাকে। যা সাধারণত হয়ে থাকে ভিন্ন ভিন্ন সভা সমিতির সদস্যেরা একের পর এক তাদের প্রতিবাদসূচক সিদ্ধান্ত শাসকদের কাছে পাঠান।

ইতিমধ্যে শহরের গুণ্ডারা ছুটকো-ছাটকা পুলিশের লোক দেখলেই তাদের আক্রমণ করে। তারা আবার এক-আধটা পুলিশ চৌকিতে ঢুকে আগুন লাগিয়ে দেয়। শহরে এক রকম অরাজকতা দেখা দেয়।

অবস্থার অবনতি দেখে বেরেলির বাইরে থেকে আরো পুলিশ আনাবার ব্যবস্থা হয়। তাতে অবস্থা ক্রমান্বয়ে শোধরাতে থাকে। তাই দেখে আমি আশা করছিলাম আরো দু একদিনের মধ্যে সব গোল চুকে যাবে। স্থানীয় কমিশনার ও ডি আঁই পুলিশ বেরেলিতে বসে সবকিছুর দেখাশোনা করছিলেন।

ইতিমধ্যে একদিন যখন আমি লখনউ-এ বসে আমাদের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী লালবাহাদুর শাস্ত্রীর সঙ্গে বেরেলির অবস্থা সম্বন্ধে আলোচনা করছি তখন

খবর পাই যে আমাদের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীগোবিন্দবল্লভ পন্থ বেরেলি যাবার উদ্যোগ করছেন। খবরটা পাওয়া মাত্র আমি তাঁর সঙ্গে দেখা করি। আমার ভয় ছিল তিনি সেখানে গেলেই তার ফল মন্দ হতে পারে। আমি পন্থজীর সঙ্গে বিমানঘাঁটি পর্যন্ত যাই ও তাঁকে সতর্ক করি তিনি যেন স্থানীয় ছাত্রমণ্ডলীর সঙ্গে দেখা না করেন। তখন বেলা ১০টা।

সেই দিনই রাত ৮টা নাগাদ বেরেলি ক্ষেত্রের ডি আই জি পুলিশ শ্রীশরদচন্দ্র আমায় টেলিফোনে জানান পন্থজী পুলিশ কর্মচারীদের সঙ্গে দেখা না করেই লখনউ ফিরে গেছেন। উপরন্তু তিনি ঠাকুর সৌদাগর সিং-এর নিলম্বন সম্বন্ধে বেরেলির ছাত্র সমাজকে তাঁর কথা দিয়ে গেছেন। তাতে কোতোয়ালির পুলিশ কর্মচারীদের মধ্যে ঘোর অশান্তির সৃষ্টি হয়েছে ও তারা একজোট হয়ে চাকরি ছেড়ে দিতে চায়। অনেক করে তাদের বলা কওয়াতে আমার বেরেলি যাওয়া পর্যন্ত তারা অপেক্ষা করতে রাজী।

ব্যপার যে এতদূর গড়াবে আমি স্বপ্নেও ভাবিনি। আমি বেরেলি যাবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছি এমন সময় শ্রীভগবান সহায় (চীফ সেক্রেটারি) আমায় ফোনে জানান আমি যেন অবিলম্বে পন্থজীর বাড়ি যাই। তখন রাত ৯টা।

পন্থজীর বাড়ি গিয়ে দেখি তিনি অল্পক্ষণ হল ফিরেছেন। সমস্তদিন খাটুনির পর তাঁকে বড় ক্লান্ত দেখাচ্ছিল। পন্থজী বলেন যখন তিনি বেরেলি থেকে রওনা হন তখন একদল স্কুল কলেজের ছাত্র তাঁর গাড়ি আটক করে। তাই তিনি বাধ্য হয়ে ঠাকুর সৌদাগর সিং-এর নিলম্বন সম্বন্ধে তাদের কথা দেন। কাজটা যে তিনি ভাল করেন নি সেটা তাঁর কথাতেই স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছিল। তবে তিনি যখন একবার তাঁর কথা দিয়ে ফেলেছেন তখন সেটা রক্ষা করাই আমাদের কর্তব্য। দেখলাম সকলেরই ইচ্ছা, আমি যেন অবিলম্বে বেরেলি যাই ও উপস্থিত ক্ষেত্রে যে সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে তার সমাধান করি। আমাদের সভা ভাঙ্গলো রাত ১০টায়।

তারপর রাত ১১টা নাগাদ আমি প্রাদেশিক সশস্ত্র পুলিশের ডি আই জি শ্রীশান্তি প্রসাদ ও এক বন্দুকধারী পুলিশ কনস্টেবলকে সঙ্গে নিয়ে লখনউ থেকে গাড়ি করে বেরিয়ে পড়ি। লখনউ থেকে বেরিলি যেতে হলে গোমতী নদী পেরিয়ে সীতাপুরের রাস্তা ধরতে হয়। লখনউ থেকে সীতাপুর ৫০ মাইল। সীতাপুর থেকে শাহজাহানপুর ৫০ মাইল। আবার শাহজাহানপুর থেকে বেরেলি আরো ৫০ মাইল। অর্থাৎ মোট দেড়শ মাইল। সমস্তটাই জাতীয় সড়ক।

সেই রাস্তা দিয়ে আমি ইতিপূর্বে অনেকবার যাওয়া আসা করেছিলাম। সুতরাং সেটা আমার খুব পরিচিত ছিল। সৌভাগ্যক্রমে আমি যেদিন বেরেলি যাই সেদিন পূর্ণিমা। আমার গাড়ি অবিরাম গতিতে চলেছে—আমিও রাস্তার দুপাশের ক্ষেত খামার বা স্বতন্ত্র বাড়ি ঘর দোর নির্ণিমেষ নয়নে দেখে চলেছি। দিনের আলোয় সেগুলি যেমন দেখতে লাগছিল, রাত্রে চাঁদের আলোয় সেগুলি আবার অন্য রকম দেখতে লাগছিল, মনে হচ্ছিল যেন তাদের ওপর এক পাতলা স্বচ্ছ আবরণ ঢাকা যেজন্য তাদের সৌন্দর্য আরো বেড়ে গেছে। উপমা দিতে হলে বলা চলে যেন কোন নববধূ সলজ্জ দৃষ্টিতে তাঁর স্বচ্ছ অবগুণ্ঠনের ভেতর থেকে তাকাচ্ছে।

আমার গাড়ির গতির সঙ্গে আমার চিন্তাধারাও খাপ খাইয়ে চলছিল। ঘুমের নামটি নেই অথচ আমার পার্শ্ববর্তী ভদ্রলোকের নাসিকা ধ্বনি আমি তখন বেশ শুনতে পাচ্ছি ও তাঁর প্রতি আমার হিংসা হচ্ছে।

আমরা এইভাবে যখন বেরেলি গিয়ে পৌঁছাই তখন রাত ৩টে। বেরেলি ক্ষেত্রের ডি আই জি শ্রীশরদচন্দ্র মিশ্র, বেরেলির পুলিশ সাহেব শ্রী টি পি শ্রীবাস্তব ও কোতোয়াল, ঠাকুর সৌদাগর সিং আমার জন্য ডি আই জি সাহেবের বাড়িতে অপেক্ষা করছিলেন। আমি ও শ্রীশান্তিপ্রসাদ গাড়ি থেকে নামামাত্র আমাদের এক বৈঠক হয়। সেই বৈঠকে আমি ঠাকুর সৌদাগর সিং-এর চাকরী থেকে নিলম্বন সম্বন্ধে কথা তুলি ও বলি মুখ্যমন্ত্রী যখন এ বিষয়ে তাঁর কথা দিয়েছেন তখন আমাদের কর্তব্য সেই কথার মর্যাদা রক্ষা করা। উত্তরে ঠাকুর সৌদাগর সিং দৃঢ়স্বরে বলেন এতো অতি সামান্য কথা। মুখ্যমন্ত্রী যদি আমার গর্দান নেবার আদেশ দেন তাও আমি নতি স্বীকার করতে প্রস্তুত। তখন আমি সকলকে জানাই বেলা ৯টার সময় আমি কোতোয়ালির পুলিশ কর্মচারীদের কিছু বলতে চাই। সেই মত যেন কোতোয়ালিতে এক প্যারেডের ব্যবস্থা করা হয়। এই বলে আমি সামান্য একটু বিশ্রাম করতে আমার ঘরে ঢুকি।

তারপর সকাল ৯টার কিছু আগে আমি যখন কোতোয়ালি যাবার জন্য প্রস্তুত তখন বেরেলির কমিশনার শ্রীশিবদাসানি আমায় বলে পাঠান আমার সঙ্গে তাঁর দুটো কথা আছে। আমি যেন কোতোয়ালি যাবার পথে তাঁর সঙ্গে একবারটি দেখা করে যাই। আমাদের কথাবার্তায় বড় জোর মিনিট দশেক অতিবাহিত হয়ে থাকবে এমন সময় কোতোয়ালি থেকে খবর আসে সেখানকার সেপাইরা ছত্রভঙ্গ হয়ে লাঠি সোটা হাতে মার মার করতে করতে পাকা রাস্তায় বেরিয়ে পড়েছে।

খবর পেয়ে আমি তৎক্ষণাৎ কোতোয়ালি যাই ও দেখি কয়েকজন সেপাই লাঠি হাতে কোতোয়ালির সম্মুখবর্তী এক মাঠের মধ্যে দিয়ে বাজারের দিকে ছুটে চলেছে। কেন যে তারা অমন ক্ষেপে গেছে তা আমি তখন কিছুই বুঝে উঠতে পারি না। এই অবস্থায় আমি তাদের অনুসন্ধান করে দু-একজনকে ধরেও ফেলি ও তাদের গলা ধাক্কা দিয়ে কোতোয়ালি ফেরৎ পাঠাই। আরো কিছু দূরে যেতে না যেতে আমি দেখি এক বিরাট জনসমুদ্র লাঠি হাতে মার মার করতে করতে কোতোয়ালির দিকে ছুটে চলেছে। আমি তখন একা ও নিরস্ত্র। তাই আমি তাদের দিকে আর না এগিয়ে কোতোয়ালিতে ফিরি ও ফটক বন্ধ করতে বলি। তার এক আধ মিনিটের মধ্যে শ্রীশরদচন্দ্র মিশ্র আহত অবস্থায় আমার সঙ্গে যোগ দেন। তাঁর মাথা থেকে তখন রক্ত গড়িয়ে পড়ছে।

এমনিতেই কোতোয়ালির সেপাইরা আগে থেকেই ভয়ানক উত্তেজিত হয়ে ছিল। তার এক কারণ তারা ক'দিন ধরে ছুটকো ছাটকা অবস্থায় শহরের গুণ্ডাদের হাতে মার খেয়ে আসছিল। অন্য এক কারণ সেই দিনই সকালে যখন তারা আমার প্রতীক্ষায় কোতোয়ালিতে জড়ো হয়েছিল তখন তাদের দলের আরো দুজনকে ... মার খেয়ে রক্তাক্ত কলেবরে কোতোয়ালিতে ছুটে আসতে দেখে। সেই দেখেই তারা ছত্রভঙ্গ হয়ে লাঠি হাতে রাস্তায় বেরিয়ে পড়ে। তাই যখন তারা শ্রীশরদচন্দ্রকে আহত অবস্থায় আসতে দেখে তখন তাদের ক্রোধের সীমা থাকে না। তারা আমাকে উচ্চৈঃস্বরে ও কম্পিত কণ্ঠে বলে, হুজুর একবারটি আমাদের ছেড়ে দিন। আমরা আমাদের প্রাণের জ্বালা জুড়াই।

আমি তখন বেশ বুঝছি, তারা যদি একবারটি ছাড়া পায় ত অনেকের মাথা ফাটিয়ে দেবে। সেক্ষেত্রে তার কৈফিয়ত দিতে দিতে আমার প্রাণান্ত হবে।

অন্যদিকে সে সময় বিপক্ষ দলের লোকেরা কোতোয়ালি আক্রমণ করে তার ওপর দমাদম ইট পাটকেল ছুঁড়ছে ও প্রাণপণে চিৎকার করছে। ফলে এমন এক পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে যা আমি কখনও দেখিনি। আমার তখন একমাত্র চিন্তা কি করা যায় যাতে দুই দলের মধ্যে হাতাহাতি না হয়। সেই অভিপ্রায়ে আমি বার বার ধমক দিয়ে কোতোয়ালির লোকেদের শান্ত হতে বলি।

ওই হট্টগোলের মধ্যে আমার কানে বন্দুকের গুলির আওয়াজ আসে। আওয়াজটা হতেই আক্রমণকারীদের দল অদৃশ্য হয়ে যায়। পরে জানা যায় বন্দুক চালিয়েছিল সশস্ত্র পুলিশ গার্ডের এক ছোকরা সেপাই। তার কাছে আক্রমণকারীদের আস্ফালন ও কার্যকলাপ অসহ্য বোধ হয়। তাই সে আর থাকতে না পেরে বিনা আদেশে তার বন্দুক চালায় যার ফলে এক ব্যক্তির মৃত্যু

হয়। গার্ড তখন আমার চোখের আড়ালে কোতোয়ালির এক কোণের ঘরে উপস্থিত। ঘটনার পর তিনদিন পর্যন্ত কারফিউ থাকে। তাতে অবস্থার অনেক উন্নতি হয় ও ক্রমান্বয়ে সেটা স্বাভাবিক হয়ে দাঁড়ায়।

পুলিশ কর্মচারীদের স্বাভাবিক জীবনেও মাঝে মাঝে কিরূপ বিপর্যয়ের সম্মুখীন হতে হয় তারই এক দৃষ্টান্ত উপরোক্ত ঘটনা থেকে পাওয়া যায়।

পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু কর্তৃক উত্তরপ্রদেশ পুলিশকে পতাকা দান আমার কাছে আর এক বিশেষ স্মরণীয় ঘটনা। সেই উপলক্ষে লখনউ পুলিশ লাইনে এক প্যারেড হয়। প্যারেডে প্রাদেশিক পুলিশের ভিন্ন ভিন্ন শাখার লোকেরা যোগ দেয়। সকলে একবাক্যে স্বীকার করেন যে, সে রকম উচ্চ ধরনের প্যারেড নাকি লখনউ শহরে কখনও দেখা যায়নি। প্রধানমন্ত্রী এক শ্বেত অশ্বের পৃষ্ঠে বসে প্যারেড নিরীক্ষণ করেন। অশ্বপৃষ্ঠে তাঁকে অপরূপ দেখায়।

পতাকা মন্ত্রপূতঃ করার জন্য এক ব্রাহ্মণ পণ্ডিত, এক মৌলভি, এক শিখ পুরোহিত ও এক খ্রীষ্টান পাদরিকে আমন্ত্রিত করা হয়। তাঁরা যখন নিজ নিজ পাঠ গুরু গম্ভীর স্বরে লাউডস্পিকারের মাধ্যমে উচ্চারিত করেন তখন সেই পাঠ শুনে শ্রোতারা মুগ্ধ হন।

প্যারেড সম্বন্ধে কলিকাতার যুগান্তর কাগজে ২৪শে নভেম্বর ১৯৫২ সালে যে বিবরণ প্রকাশিত হয় তাহা এখানে উদ্ধৃত করিলাম:

"উত্তর প্রদেশের পুলিশ ও প্রাদেশিক সশস্ত্র পুলিশের কুচকাওয়াজ অনুষ্ঠানে প্রধান মন্ত্রী পতাকা উপহার দেন এবং এই প্রসঙ্গে উত্তর প্রদেশ পুলিশ বাহিনীর প্রশংসা করিয়া বলেন যে, দেশ সেবার জন্য পুলিশ ও সশস্ত্র পুলিশকে সম্মান প্রদর্শনের জন্য যে অনুষ্ঠান হইতেছে তাহাতে অংশগ্রহণ করিয়া তিনি নিজে আনন্দ বোধ করিতেছেন।

"সঙ্কটপূর্ণ গত পাঁচ বৎসরে উত্তর প্রদেশের পুলিশবাহিনী যে কার্যকুশলতা ও কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন তাহার জন্য এই পতাকা উপহার দেওয়া হয়।

"তিনি আরো বলেন যে, পুলিশ ও প্রাদেশিক সশস্ত্র পুলিশের হাতে যে পতাকা অর্পণ করা হইল তাহার মর্যাদা রাখাই তাহাদের কর্তব্য। উত্তর প্রদেশের পুলিশের কার্যের প্রশংসা তিনি অনেকবারই শুনিয়াছেন। বিশেষতঃ পুলিশ ব্যাটালিয়নকে সঙ্কটের সময় শান্তি রক্ষার জন্য যখন ভারতের অন্যত্র প্রেরণ করা হইয়াছিল তখন তাহারা সুষ্ঠভাবেই তাদের কর্তব্য সম্পন্ন করিয়াছে।

সমগ্র দেশের পুলিশ বাহিনীর ইতিহাসে উত্তর প্রদেশের পুলিশ বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছে।

"উত্তর প্রদেশ পুলিশের ইন্সপেক্টর জেনারেল শ্রী বি এন লাহিড়ীর নেতৃত্বে পুলিশ বাহিনী সুষ্ঠুভাবে কার্য করিয়াছে। দীর্ঘকাল যোগ্যতার সহিত কার্য করিবার পর তিনি অবসর গ্রহণ করিতেছেন। এরূপ ব্যক্তি অবসর গ্রহণের পর দেশের সেবা করিবেন বলিয়া তিনি আশা করেন।

"জাতীয় সমৃদ্ধির জন্য ভারতের প্রত্যেক নাগরিককে যোদ্ধার মত কার্য করিতে হইবে। সমস্যা বিরাট হইলেও উহা সমাধানের দায়িত্ব কোন বিশেষ শ্রেণীর উপর নিবদ্ধ নহে। পুলিশ ও সেনাবাহিনী নিয়মানুবর্তিতা ও অন্যান্য যে শিক্ষা গ্রহণ করিয়াছেন তজ্জন্য এ সম্পর্কে তাহাদের বিশেষ দায়িত্ব আছে।

"এ কথা সত্য যে সংগ্রামে অনেকে পিছাইয়া পড়িতে পারেন। কিন্তু অন্যান্য সকলকে অগ্রসর হইয়া চলিতে হইবে।

"পুলিশের সম্মুখে যে বিরাট কার্যভার পড়িয়া রহিয়াছে তজ্জন্য তাহাদিগকে জনসাধারণের সহযোগিতা পাইতে হইবে।"

প্যারেডের আগের দিন প্রধানমন্ত্রীর সম্মানার্থে লখনউ-এর পুলিশ মেসে এক ভোজের আয়োজন করা হয়। প্রধানমন্ত্রী ভোজের সময় খুব ভাল মেজাজে ছিলেন ও সকলের সঙ্গে বেশ হাসি তামাসা করছিলেন।

ডিনার শেষ হবার পর নিমন্ত্রণকর্তা হিসেবে আমি এক ক্ষুদ্র ভাষণ দিই। তাতে আমি প্রধানমন্ত্রীর প্রশংসা করে বলি তাঁর নেতৃত্বে কাজ করা আমাদের পরম সৌভাগ্য। দেশ বিভাগের ফলে যে পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে তাতে পুলিশের দায়িত্ব আগেকার তুলনায় অনেক বেড়ে গেছে। দেশ রক্ষার্থ অনেক কিছু গুরুদায়িত্ব তাদের পালন করতে হবে যা আগেকার দিনে সেনাবাহিনীর দায়িত্বের মধ্যে গণ্য ছিল। সুতরাং পুলিশের শিক্ষা দীক্ষা ও সাজসজ্জা সময়োচিত করতে হলে তাতে অনেক পরিবর্তন আবশ্যক। ইত্যাদি।

আমার কথার উত্তরে প্রধানমন্ত্রী যা কিছু বলেন সে সব তাঁরই বৈশিষ্ট্যসূচক ছিল। তাঁর মতে এই যে সামরিক শক্তি বৃদ্ধির আপ্রাণ চেষ্টা জগতের সর্বত্রই দেখা যাচ্ছে তার শেষ কোথায়? পৃথিবীতে বস্তুগত শ্রীবৃদ্ধিই সবকিছু নয়। তিনি যুক্তরাষ্ট্র, গ্রেট ব্রিটেন, ফ্রান্স ও জাপানের উদাহরণ দিয়ে বলেন, তারা অনেক বিষয়ে আমাদের চেয়ে এগিয়ে আছে। কিন্তু তাহলে কি হয়? তারা কি সুখী? সুখ বস্তুগত সমৃদ্ধির ওপর মোটেই নির্ভরশীল নয়। সুখী হতে হলে আধ্যাত্মিক উন্নতি চাই ইত্যাদি।

প্রধানমন্ত্রী প্রায় ৪৫ মিনিট ধরে অনর্গল তাঁর মন্তব্য প্রকাশ করেন যা আমরা মন্ত্রমুগ্ধের মত শুনি।

আজ আমরা বুঝি ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে পণ্ডিত জওহরলালের ধারণা অনেক বিষয়ে ভুল ছিল। তবু তাঁর ব্যক্তিগত প্রাধান্যকে অস্বীকার করা যায় না।

উপরোক্ত অনুষ্ঠান হয় ২৩শে নভেম্বর ১৯৫২ সালে। তার অল্পদিন পরেই অর্থাৎ ১৩ই জানুয়ারি ১৯৫৩ সালে আমি দীর্ঘকাল পুলিশে চাকরী করার পর অবসর গ্রহণ করি। সুতরাং আমার কাহিনীর এইখানেই সমাপ্তি।

পুনশ্চ –

আমি যে ক'বছর উত্তরপ্রদেশের আই জি পুলিশ ছিলাম সে ক'বছর আমার খুব ভাল ভাবেই কাটে।

উত্তরপ্রদেশের তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী পণ্ডিত গোবিন্দবল্লভ পন্থ ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী লালবাহাদুর শাস্ত্রী দুজনেই খুব উঁচু দরের ও বিচক্ষণ লোক ছিলেন। তাঁরা আমার ওপর সম্পূর্ণ আস্থা রাখতেন ও আমার কাজে কখনও হস্তক্ষেপ করতেন না। ফলে পুলিশের যথেষ্ট সুনাম হয়। অপরাধের সংখ্যাও অনেক কমে যায়। পুলিশ অফিসারদের পোষ্টিং ও ট্রান্সফার সম্বন্ধে আমি সর্বেসর্বা ছিলাম।

আজ কিন্তু আগেকার তুলনায় অপরাধের সংখ্যা অনেক বেড়ে গেছে ও সর্বত্র অরাজকতা ছেয়ে গেছে। পুলিশের কাজ অপরাধ ও অপরাধীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করা। কিন্তু তা করতে হলে তাদের কাজে উৎসাহ ও স্বাধীনতা চাই। সেই উৎসাহের বা স্বাধীনতার আজ অভাব। অফিসাররা নিজে থেকে কাজ করার ক্ষমতা হারিয়েছে। তারা যেন হাত গুটিয়ে দিন গুনছে! অনেক সময় পুলিশের চোখের সামনে খুন-খারাপি হচ্ছে।

এ সম্বন্ধে দোষ তাঁদের, যাঁরা শাসনের উচ্চ শিখরে বসে। শাসন প্রণালী সম্বন্ধে তাঁদের মধ্যে অনেকে অনভিজ্ঞ অথচ তাঁদের সব ব্যাপারেই হস্তক্ষেপ করা চাই। দেখা যাক্ কতদিনে অবস্থার পরিবর্তন ঘটে।